আশুরা সংকলন

ইমাম হোসাইন (আ.) - এর আন্দোলনের দর্শন ও শিক্ষা

এই বইটি “মুস্তাবসেরিন বিশ্ব কেন্দ্র” ওয়েব সাইট কর্তৃক আপলোড করা হয়েছে।

https://al-mostabserin.com/bangla/

আশুরা সংকলন

ইমাম হোসাইন (আ.) - এর আন্দোলনের দর্শন ও শিক্ষা

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি

মোহাম্মদ আওরায়ী কারিমী

সম্পাদনা পরিষদের সদস্য

ড.জহির উদ্দিন মাহমুদ

মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস বাদশা

মো.আশিফুর রহমান

প্রকাশনা :

কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা, বাংলাদেশ

বাড়ি নং- ৫৪, সড়ক নং- ৮/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা- ১২০৯।

ফোনঃ ৯১১৪০০০, ৯১৩৫১৫৫

E-mail : dhaka.icro@gmail.com,website : dhaka.icro.ir

প্রকাশকাল : ২৪ডিসেরে ২০০৯

৬ মুহররম ১৪৩১হি.

১০পৌষ ১৪১৬ বা. :

Ashura Compilation [Philosophy and Lessons of the Movement of Imam Hosain (A.S.)];Chairman of the Editorial Board: Mohammad Oraei Karimi;Members of the Editorial Board: Dr. Zahir Uddin Mahmud,Mohammad Abdul Quddus Badsha,Md. Ashifur Rahman;Publisher: Office of the Cultural Counsellor,Embassy of the I.R. Iran,Dhaka;Publishing Date: Muharram 6,1431 H.,24 December 2009. Price: Tk. 220. 4

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সালাম ও দরুদ বর্ষিত হোক ইসলামের মূর্ত প্রতীক ও একত্ববাদের স্বতঃপ্রকাশিত সারসত্যের ওপর, যিনি স্রষ্টার সম্মুখে ইবাদাত বন্দেগী করার স্বরূপ ও পদ্ধতিকে স্পষ্ট করে বাৎলে দিয়েছেন। আর ইসলাম ও কুরআনের পতাকাতলেই এই ইসলামকে ধ্বংস করার যে কুফরী ও শিরকী চক্রান্ত তার বিরুদ্ধে যিনি সংগ্রাম করেছেন এবং সত্যিকার একত্ববাদকে তুলে ধরেছেন।

সালাম ও দরুদ বর্ষিত হোক প্রেমবৃত্তির মহান নেতার ওপর যিনি মাশুকের মুহাববাতে কিভাবে ইশকের লালন করতে হয় এবং কিভাবে প্রেমের পথে প্রাণ পণ করতে হয় আর মাশুকের সান্নিধ্য লাভ করতে কিভাবে আত্মত্যাগ করতে হয়, তা প্রেমভক্তি ও ভালোবাসার গলির সকল বাসিন্দাকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন।

শহীদদের নেতা হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) বলেন : 'যেদি মুহাম্মাদ (সা.)- এর ধর্ম আমার নিহত হওয়া ছাড়া টিকে না থাকে তাহলে এসো হে তারবারী! নাও আমাকে।' নিঃসন্দেহে কারবালার মর্ম বিদারী ঘটনা হলো মানব ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমক্কায় ঘটে যাওয়া অজস্র ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয়। এটা এমন এক বিস্ময়কর ঘটনা, যার সামনে বিশ্বের মহান চিন্তাবিদরা থমকে দাড়াতে বাধ্য হয়েছেন, পরম বিস্ময়ে আভিভূত হয়ে স্তুতি- বন্দনায় মুখরিত হয়েছেন এ নজিরবিহীন আত্মত্যাগে। কারণ, কারবালার কালজয়ী বিপ্লবের মহানায়করা 'অপমান আমাদের সয়না'- এ স্লোগান ধ্বনিত করে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য হাতে গোনা কয়েকজন হওয়া সত্বেও খোদায়ী প্রেম ও শৌর্যে পূর্ণ টগবগে অন্তর নিয়ে জিহাদ ও শাহাদাতের ময়দানে আবির্ভূত হন এবং প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার অধঃজগতাকে পেছনে ফেলেউর্ধ্ব জগতে মহান আল্লাহর সনে পাড়ি জমান। তার স্বীয় কথা ও কাজের দ্বারা জগতবাসীকে জানিয়ে দিয়ে যান যে, ''যে মৃত্যু সত্যের পথে হয়, তা মধুর চয়েও সুধাময়।''

বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানের জীবনপটে যেমন, তেমনি তাদের পবিত্র বিশ্বাসের পাদমূলে আশুরার সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহমান। কারবালার আন্দোলন সুদীর্ঘ চৌদ্দশ' বছর ধরে স্বচ্ছ- সুগভীর বারিধারা দ্বারা প্রাণসমূহের তৃষ্ণা নিবারণ করে এসেছে। আজ অবধি মূল্যবোধ, আবেগ, অনুভূতি, বিচক্ষপূর্ণতা ও অভিপ্রায়ের অজস্র সূক্ষ্ম ও স্থুল বলয় বিদ্যমান যা এই আশুরার অক্ষকে ঘিরে আবর্তনশীল। প্রেমের বৃত্ত অঙ্কনের কাটা- কম্পাস হলো এ আশুরা।

নিঃসন্দেহে এ কালজয়ী বিপ্লবের অন্তঃস্থ মর্মকথা এবং এই চেতনা, লক্ষ ও শিক্ষা একটি সমৃদ্ধশালী, নিখাদ ও প্রেরণাদায়ক সংস্কৃতি গঠন করে। প্রকৃত ইসলামের সুবিস্তৃত অঙ্গনে এবং আহলে বাইতের সুহৃদ ভক্তকুল, ছোট- বড়, জ্ঞানী- মুর্খ নির্বিশেষে সর্বদা এ আশুরা সংস্কৃতির সাথেই জীবনযাপন করেছে, বিকশিত হয়েছে এবং এ জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে। এ সংস্কৃতির চর্চা তাদের জীবনে এতদূর প্রসারিত হয়েছে যে, জন্মক্ষণে নবজাতককে তারা সাইয়্যেদুশ শুহাদার তুরবাত (কারাবালার মাটি) ও ফোরাতের পানির স্বাদ আস্বাদেন করায় এবং দাফনের সময় কারবালার মাটি মৃতের সঙ্গে রাখে। আর জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি হোসাইন ইবনে আলী (আ.)- এর প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি পোষণ করে, ইমাধ্যমের শাহাদাতের জন্য অশ্রুপাত করে। আর এই ভালোবাসা শৈশবে দুধপানের সাথে প্রবেশ করে আর শেষ নিশ্বাস ত্যাগের সাথে নিঃসরিত হয়ে যায়।

কারবালার আন্দোলন সম্পর্কে অদ্যবধি অসংখ্য রচনা, গবেষণা এবং কাব্য রচিত হয়েছে। সূক্ষ চিন্তা ও ক্ষুরধার কলমের অধিকারী যারা, তারা বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও নানান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ কালজয়ী বিপ্লবের বিশ্লেষণ করেছেন। এ সকল রচনাকর্ম যদি একত্র করা হয় তাহলে তা পরিণত হবে এক মহাগ্রন্থাগারে। কিন্তু তবুও এ সম্পর্কে নব নব গবেষণা ও ভাবনার। অঙ্গন এখনো রয়ে গেছে।

সুধী পাঠক! এ মুহূর্তে যে বইখানি আপনার হাতে, এটা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলনের বিশ্লেষণ এবং আশুরার ঘটনাবলী ও শিক্ষা সম্পর্কে একটি সংকলন যা ঢাকাস্থ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলরের দফতরের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সকল আহলে

বাইত প্রেমীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হলো যাতে তা তাদের মহান আল্লাহ্ অভিমুখে পূর্ণতার যাত্রা পথে আলোকবর্তিকা হয় ইনশাল্লাহ।

এখানে অত্যন্ত জরুরী মনে করছি আমার সহকর্মী ও প্রিয়ভাজন যারা এ সংকলন প্রস্তুত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে এবং সে সাথে তাদের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

মোহাম্মদ আওরায়ী কারিমী

কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা, বাংলাদেশ

১ মুহররম, ১৪৩১ হিঃ

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর ব্যক্তিত্ব

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব

জাভাদ মুহাদ্দেসী

নাম : হোসাইন (আল্লাহর আদেশক্রমে নির্ধারিত তৃতীয় ইমাম)। ডাকনাম : আবু আবদিল্লাহ। উপাধি : খামেসে আলে 'আবা, সিবত, শহীদ, ওয়াফী, যাকী। পিতা :হযরত1আলী ইবনে আবু তালিব (আ.), মাতা : হযরত ফাতেমা (আ.)। জন্ম তারিখ : শনিবার, ৩ শাবান ৪র্থ হিজরী। জন্মস্থান : মদীনা। বয়সকাল : ৫৭ বছর। শাহাদাতের কারণ : ইয়াযীদ ক্ষমতাসীন হবার পর ইমাম হোসাইন তাকে অযোগ্য বলে মনে করতেন বিধায় তার হাতে বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। আর ইয়াযীদের স্বরূপ উদঘাটনের জন্য আল্লাহ তা'আলার হুকুমে মদীনা থেকে মক্কায়, এরপর কুফা ও কারবালার দিকে রওয়ানা হন। তিনি তার সহচরবৃন্দসহ তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ইসলামের দুশমনদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। তার হত্যাকাণ্ডরী : সালেহ ইবনে ওয়াহা মুযনী, সিনান ইবনে আনাস ও শিমর ইবনে যিলজওশন (তাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক)। শাহাদাত বরণের দিন : ১০ মুহররম শুক্রবার, ৬১ হিজরী। শাহাদাত ও দাফনের স্থান : কারবালা (বর্তমান ইরাকে অবস্থিত)।

ইমাম হোসাইন নবী করীম (সা.)- এর বরকতপূর্ণ জীবনকালে শৈশবের ৬ বছর অতিবাহিত করেন।

তিনি ছিলেন উম্মতে মুহাম্মাদীর সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তিত্ব। হযরত নবী করীম (সা.) ও আলী (আ.)- এর বীরত্ব তার মধ্যে সমাবিষ্ট ছিল। আল্লাহ তা'আলা তার মাযারের মাটিতে রোগমুক্তি এবং মাযারের অভ্যন্তরকে দোয়া কবুলের স্থানে পরিণত করেছেন।

পয়গাম্বর (সা.) তার সম্পর্কে বলেছেন : 'যে ব্যক্তি হোসাইনকে ভালোবাসে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসেন।' পয়গাম্বর (সা.) তার এবং তার বড়ভাই ইমাম হাসন্তান (আ.) সম্পর্কে বলেছেন : 'আমার দুই সান্তান হাসন্তান ও হোসাইন উম্মতের সর্দার। তারা দায়িত্ব গ্রহণ করুক বা

নাকরুক।’ ৫০ হিজরীতে ইমাম হাসন্তান (আ.)- এর শাহাদাত বরণের পর তিনি উম্মতের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আমীর মু’আবিয়া ২০ বছর যাবদ জুলুমপূর্ণ শাসন ও হত্যাকাণ্ড বিশেষ করে আহলে বাইতের অনুসারীদের ওপর নির্যাতন পরিচালনার পর ৬০ হিজরীতে মারা যান। তিনি ইমাম হাসানের সঙ্গে কৃত চুক্তির বরখেলাফ করে স্বীয় সন্তান ইয়াযীদকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন। ইয়াযীদ ছিল দুশ্চরিত্র, মদ্যপায়ী ও ইসলামবিরোধী। সে প্রকাশ্যে ইসলামের পবিত্র বিধি- বিধানের অবমাননা করতো এবং মদপান করতো।

ইমাম হোসাইন (আ.) প্রথম থেকেই ইয়াযীদের বিরোধিতায় আত্মনিয়োগ করেন। ইয়াযীদ ক্ষমতায় বসেই মদীনার গভর্নরের কাছে লেখা একটি পত্রে আদেশ করে, ‘হোসাইনের কাছ থেকে আনুগত্যের বাইয়াত গ্রহণ কর। যদি সে রাজি না হয় তাহলে হত্যা কর।’ ইমাম কিছুতেই ইয়াযীদের বাইয়াত করতে রাজি ছিলেননা। তাই তিনি মদীনা ছেড়ে মক্কায় চলে যান। সংবাদ পেয়ে কুফার লোকেরা ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কাছে অসংখ্য পত্র লিখে। পত্রে তাকে কুফা আসার অনুরোধ জানায়। ইমাম হোসাইনও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য মুসলিম ইবনে আকীলকে কুফায় প্রেরণ করেন। প্রথমে কুফার হাজার হাজার লোক মুসলিম ইবনে আকীলের সঙ্গে যোগ দেয়। কিন্তু ইয়াযীদের পক্ষ হতে কুফার গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ কুফায় প্রবেশ করলে কুফার লোকেরা প্রতারণাপূর্ণ নানা চালে ধোকায় পড়ে যায় এবং শপথ ভঙ্গ করে মুসলিম ইবনে আকীলকে নিঃসঙ্গ করে ফেলে।

ইবনে যিয়াদ ছিল ধোকাবাজ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। শেষ পর্যন্ত ইবনে যিয়াদ মুসলিম ইবনে আকীলকে বন্দি করে শহীদ করে। কুফার লোকেরা যে সময় মুসলিম ইবনে আকীলের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিল সে সময় মুসলিম ইমাম হোসাইন (আ.)- এর নিকট একটি পত্র লিখেন এবং তাকে সংবাদ দেন যাতে তিনি কুফায় আগমন করেন। ইমাম হোসাইন ও তার পরিবার- পরিজন ও সঙ্গী- সাথীদের নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কুফার কাছাকাছি পৌছেই তিনি কুফার জনগণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও মুসলিম ইবনে আকীলের শহীদ হওয়ার সংবাদ পান।

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ মুসলিমকে শহীদ করার পর কুফার ওপর পূর্ণ কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং হুর ইবনে ইয়াযীদ রিয়াহীকে ইমাম হোসাইন (আ.) ও তার সঙ্গীদের ওপর নজরদারি করার জন্য প্রেরণ করে। এরপর ওমর ইবনে সা'দকে ৩০ হাজার সৈন্যসহ কারবালায় প্রেরণ করে। সে ওমর ইবনে সা'দকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, যদি সে ইমাম হোসাইনকে হত্যা করে তাহলে তাকে রেই শহরের গভর্নর করা হবে। রেই শহরের গভর্নরের পদ পাওয়ার লোভে কারবালায় আসার পর ওমর ইবনে সা'দ ইমাম হোসাইন ও তার সঙ্গীদের অবরোধ করার জন্য নির্দেশ দেয় এবং তাদের পানি সংগ্রহের পথ করে দেয়া হয়।

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সঙ্গী- সাথীরা ছিলেন তখনকার দিনের সবচেয়ে সাহসী পুরুষ। তাদের সংখ্যা ছিল অনুর্ধ্ব ৭২ জন। তারা ১০ মুহররম তারিখে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা হোসাইন (আ.)- এর প্রতিরক্ষা করতে গিয়ে মর্যাদার সাথে শাহাদাত বরণ করেন।

কারবালার যুদ্ধ যদিও সময়ের বিচারে খুব সংক্ষিপ্ত ছিল এবং কেবল একদিন অর্থাৎ ১০ মুহররম সকাল থেকে আসরের সময় পর্যন্ত স্থায়ী ছিল, কিন্তু এর প্রতিটি মুহূর্ত ছিল বীরত্ব, আত্মত্যাগ, ঈমান ও ইখলাস (নিষ্ঠা)- এর পরাকাষ্ঠা।

কারবালার ঘটনা একটি বিশ্ববিদ্যালয় তুল্য। যেখানে দুগ্ধপোষ্য শিশু হতে শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ লোকও মানবজাতির সামনে মানব মর্যাদা ও স্বাধীন চেতনার শিক্ষা দেন। যেখানে ইমাম হোসাইন (আ.) ও তার সহচরদের পবিত্র ইসলামকে নতুন জীবন দান করে, আর উমাইয়্যা বংশের নষ্ট চরিত্রের শাসকদের পতনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

ইমাধ্যমের বিনয় ও নম্রতা

ইমাম হোসাইন (আ.) একবার কিছু সংখ্যক গরীব লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা একটি কুড়েঘরে বসে কিছু একটা খাচ্ছিলো। তারা ইমাম হোসাইনকে অনুরোধ জানালো তাদের সাথে খাবারে অংশ গ্রহণের জন্য। তিনি তাদের দাওয়াত গ্রহণ করলেন এবং বললেন যে, আল্লাহ তা'আলা অহংকারীদের ভালোবাসেন না। খাবার গ্রহণের পর ইমাম তাদের দিকে ফিরে বললেন :

‘আমি আপনাদের দাওয়াত গ্রহণ করেছি, এখন আপনাদের পালা।’তারাও ইমাধ্যমের দাওয়াত গ্রহণ করলো এবং ইমাধ্যমের বাড়িতে গেলো। তিনি তার খাদেম রুবাবকে নির্দেশ দিলেন যাতে বাড়িতে যা কিছু সঞ্চিত আছে সব তাদের দিয়ে দেন।

ইমাম হোসাইন এর আদর্শ জীবন- (.আ)

আল্লাহ তা’আলা যখন মানব জাতির জন্য পথপ্রদর্শক প্রেরণ করেন এবং পথ ও পথচলা নির্ণয়ের জন্য তাকে হুজ্জাত হিসাবে নির্ধারণ করেন তখন তিনি তারই আলোকে উম্মতের আত্মগঠন, আল্লাহর বন্দেগী ও জীবনের পূর্ণতা অর্জনের জন্য যে আদশের প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে দেন। হোসাইন ইবনে আলী (আ.) ছিলেন এ ধরনের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। কাজেই তার কাছ থেকে শুধু বীরত্ব, আত্মত্যাগ, জিহাদ ও জুলুম নাশের আদর্শ নয়; বরং আল্লাহর ইবাদাত, দানশীলতা, পৌরুষ, উদারতা, কুরআনের প্রতি হৃদ্যতা ও মানুষের প্রতি মর্যাদা দানের শিক্ষাও আমাদের নিতে হবে।

নামায বন্দেগীর চূড়ান্ত শিখর

ইমাম হোসাইন (আ.) আশুরার রাতে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ, একাগ্রতায় ইবাদাত, কুরআন তেলাওয়াত ও নামাযের জন্য দুশমনের কাছ থেকে সময় চেয়ে নিয়েছিলেন। আশুরার দিন যখন প্রচণ্ড লড়াই চলছিল, তার মধ্যেও তিনি যোহরের নামাযের জন্য দড়িয়ে যান। এর মাধ্যমে তিনি আমাদের এ শিক্ষা দেন যে, তিনি দীনের জন্য এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রাণ দিয়েছেন।

আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট

আল্লাহর বন্দেগীর পূর্ণতা হচ্ছে সন্তুষ্টির মধ্যে। ইমাম হোসাইন ইবনে আলী (আ.) কারবালার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার সময় আশা প্রকাশ করেন যে, আল্লাহ তা’আলা তার জন্য যা ইচ্ছা

করেছেন তা শুভ ও কল্যাণকর হবে। তা বিজয় লাভ হোক কিংবা শাহাদাত বরণ। যখন তিনি শাহাদাত বরণ করেন তখনও তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল এবাক্য: 'তোমার সন্তুষ্টির প্রতি সন্তুষ্ট, আর তোমার আদেশের সামনে সমর্পিত'। এটি বন্দেগীতে ইখলাস, আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এবং তার জিহাদ ও শাহাদাত আল্লাহর রঙে রঙিন হওয়ার প্রমাণ বহন করে। তিনি বহুবার বলেছেন : 'আমাদের আহলে বাইতের সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত।'

ধৈর্য ও অবিচলতা

সাইয়্যেদুশ শুহাদা ইমাম হোসাইন ছিলেন দুঃখ- মুসিবত, জীবনের ঘাত- প্রতিঘাত, তারবারির আঘাত, আপনজন হারানোর বেদনা ও সন্তানদের শাহাদাত বরণের মতো কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও অবিচলতার পরাকাষ্ঠা। তিনি আশুরার দিন 'সাবরান বানিল কেরাম' (হে সম্মানিত বংশ! ধৈর্যধারণ কর) উক্তির দ্বারা আপন সঙ্গীদেরকে জিহাদের কষ্ট ও তারবারির আঘাতের ওপর অবিচল থাকার আহবান জানান।

আশুরার দিন আপন সন্তান আলী আসগারকেও 'ইয়া বুনাইয়া ইসবির কালীলান' (হে বৎস ! একটুখানি ধৈর্য ধারণ কর) বলে ধৈর্য ধারণের আহবান জানান। আপন বোনকেও সেই রক্তলাল দিনে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেন।

মহত্ব

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মহত্ব ও বদান্যতা লোক মুখে প্রসিদ্ধ ছিল। ইমাম সাজ্জাদ (আ.)- এর বর্ণনা মোতাবেক ইমাম হোসাইন (আ.) খাদ্য ও পানীয়ের বোঝা নিজেই বহন করতেন। তিনি অনাথ, গরীব ও বিধবা নারীদের ঘরে নিজেই বোঝা বহন করে নিয়ে যেতেন। এর ফলে তার কাধের ওপর দাগ পড়ে গিয়েছিল।

বস্তুত মানবপ্রেম, দুঃখী মানুষের প্রতি মমতা, বিনয়, নম্রতা ও মানবীয় সংবেদেনশীলতা শিখতে হবে হোসাইন ইবনে আলী (আ.)- এর কাছ থেকে।

আধ্যাত্মিক চেতনা

আল্লাহর ভয়, অশ্রুসজল নয়ন, দোয়া ও প্রার্থনার অবস্থায় থাকা, আল্লাহর প্রশংসায় রত থাকা এবং আল্লাহর অগণিত নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরা জীবন, রাতে ও দিনে একাগ্র চিত্তে বেশি বেশি নফল ইবাদাত, পায়ে হেটে বারে বারে হজ্বে গমন করা, শ্রদ্ধেয়া নানী খাদিজা (আ.)- এর কবর যিয়ারত করা, তার জন্য দোয়া ও কান্নাকাটি করা, জাবালে রহমতের পাদদেশে দড়িয়ে প্রেমাসক্ত হৃদয়ে তন্ময়ভাবে মোনাজাত, আর আরাফাতের ময়দানে তার খাস মোনাজাত যা সবচেয়ে সুন্দর ও সমৃদ্ধ মোনাজাত হিসাবে প্রসিদ্ধ- এসব কিছুই তার অতি উচ্চতর আধ্যাত্মিক চেতনা, ভাবধারা ও বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

আল্লাহ প্রেম

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জীবনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি অন্তরের ভালোবাসা ও আসক্তি।

বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম হোসাইন (আ.) শাহাদাতের মুহূর্তের দিকে যতই এগিয়ে গেছেন তার চেহারা ততবেশি উজ্জল হয়েছে এবং তা আল্লাহর প্রতি সাইয়্যেদুশ শুহাদার ভালোবাসার আরেকটি প্রমাণ। কেননা, তিনি মিলনের মাধ্যমে বিচ্ছেদের অবসান দখতে পাচ্ছিলেন, তাই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

এ মনোভাব ও প্রেমাসক্তি নিঃসন্দেহে হোসাইন (আ.)- এর বন্ধুদের মাঝেও দৃশ্যমান ছিল।

আল্লাহর যিকির

আল্লাহর স্মরণের যে মনিমুক্তা তা একটি খোদায়ী সাওগাত।

হোসাইন ইবনে আলী (আ.) ছিলেন আল্লাহর যাকের (নিত্য স্মরণকারী) বান্দা। সব সময় আল্লাহর যিকির তার মুখে এবং আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা তার অন্তরে জাগরুক ছিল। শান্তিতে, দুঃখে, সমস্যায়, আরামে আল্লাহর স্মরণেই তার মনের প্রশান্তি ছিল।

তিনি কেবল আশুরার দিন সকালেই 'হে আল্লাহ! সকল কঠিন মুহূর্তে তুমিই আমার একমাত্র নির্ভরতা' বলে আর্তি জানাননি; কেবল আশুরার দিন প্রতিটি আক্রমণ রচনায় 'লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা' বলেই আল্লাহর সাথে তার হৃদয়ের সম্পর্কের পুনরাবৃত্তি করেছেন তা নয়; বরং সবসময় 'আল্লাহ আকবার', 'আল হামদুলিল্লাহ 'আলা কুল্লি হাল' প্রভৃতি বাক্যদ্বারা আল্লাহর প্রশংসায় রত থাকতেন। দুঃখ- মুসিবতের সময় পাঠ করার যে যিকির 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' তা তিনি বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে মক্কা থেকে কারবালা পানে যাবার সময় বার বার উচ্চারণ করেছেন। ইমাম হোসাইন (আ.)- এর দৃষ্টিতে কুফা বাহিনী যাদেরকে সেই জঘন্য অপরাধ সংঘটনের জন্য জমায়েত করা হয়েছিল তাদের সবচেয়ে বড় দূর্ভাগ্য ছিল তারা আল্লাহর স্মরণকে ভুলে গিয়েছিল। তিনি যখন দেখলেন যে, তারা কিছুতেই হিংসা- বিদ্বেষ ত্যাগ করছে না এবং তাকে হত্যা করার জন্য বদ্ধপরিকর, তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: 'শয়তান তোমাদের ওপর জেকে বসেছে, মহান আল্লাহর স্মরণকে ভুলিয়ে দিয়েছে।'

মোটকথা, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আধ্যাত্মিকতা, আল্লাহর প্রতি নিবিষ্টতা ও রাত জেগে ইবাদাত- বন্দেগী হতে আমাদের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। অনুরূপভাবে শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা, ছেলে- মেয়েদের শিক্ষা দান, মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ, গরীবের জন্য দরদ, দানশীলতা, ত্যাগ, মানবপ্রেম, দুঃখী মানুষের দুর্দশা লাঘব প্রভৃতি ক্ষেত্রেও তাকে আমাদের অনুসরণ করতে হবে।

হোসাইন ইবনে আলী (আ.) সর্বকালের সব জায়গার সব মানুষের জন্য আদর্শ। যুদ্ধের ময়দানে যেমন, তেমনি শান্তির সময়ও। বিশ্বাস ও আচরণের আঙিনায় যেমন, তেমনি দুশমনের সাথে শত্রুতার বেলায়ও। সততা, পবিত্রতা, বীরত্ব, সাহসিকতা, শাহাদাত পিয়াসা, ইবাদাত- বন্দেগী ও কান্নাকাটি সর্বাবস্থায় তিনি মানুষের জন্য আদর্শ।

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর পথ চলার আদর্শ আমাদের সব সময়ের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে থাকুক।

অনুবাদ : মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

‘নিশ্চয়ই হোসাইন হেদায়াতের আলোকবর্তিকা ও নাজাতের তরী।’

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) - এর ব্যক্তিত্ব

ড.মাওলানা এ.কে. এম মাহবুবুর রহমান*

ইমাম হোসাইন (আ.) শুধু একটি নাম নয়, একটি ইতিহাস, একটি চেতনা, হক ও বাতিলের নির্ণয়কারী। দুনিয়ার ইতিহাসে ন্যায়- ইসাফকে প্রতিষ্ঠিত করা, অন্যায়, জুলুম, নির্যাতন, স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রুখে দড়ানোর জন্য যারাই নিজের জান ও মাল দিয়ে সত্যের সাক্ষ্য হিসাবে কালোত্তীর্ণ অমর ব্যক্তিত্ব হিসাবে সত্যাণ্বেষীদের মন- মগজে স্থান জুড়ে আছেন, যদের আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে যুগে যুগে কুফর, শিরক তথা তাগুতের মসনদ জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হচ্ছে এবং হবে ইমাম হোসাইন (আ.) - এর স্থান তাদের শীর্ষে রয়েছে এবং থাকবে। ইমাম হোসাইন (আ.) কিয়ামত পর্যন্ত বাতিলের বিরুদ্ধে সত্যের সকল যুদ্ধের সেরা ইমাম বা অপ্রতিদ্বন্দী নেতা।

হোসাইন (حسين) নামটির মাঝেই রয়েছে গভীর তাৎপর্য। حسين শব্দের ح হরফ দিয়ে حسن (হুসন) বা সুন্দেই, আকর্ষণীয়, দৃষ্টিনন্দন, শ্রুতিমধুর, বাহ্যিক ও আত্মিক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব বুঝায়। س (সীন) দ্বারা সাআদাত سعادت বা দৃঢ় প্রত্যয়, ي (ইয়া) দ্বারা يقين (ইয়াকীন) বা প্রত্যয়, ن (নূন) হরফ ; দ্বারা نور বা আলো ও জ্যোতি বুঝায়। অর্থাৎ حسين (হোসাইন) এমন সত্তা, এমন ব্যক্তিত্ব যিনি জাগতিক, মানসিক, আত্মিক সকল প্রকারের সৌন্দর্যের প্রতীক, সৌভাগ্য- সমৃদ্ধিরি পথ নির্দেশক, দৃঢ় প্রত্যয়ীর সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা, আপসহীনতার মূর্ত প্রতীক, আর সকল যুগের সকল মানুষের জন্য নূর বা আলোকবর্তিকা। হাদীসের ভাষায়-

ان الحسين مصباح الهدى و سفينة النجاة

‘হোসাইন হেদায়েতের আলোকবর্তিকা ও নাজাতের তরী’’

‘হোসাইন ’ নামটিও অতি পবিত্র। এ নাম মানুষের দেয়া নয়। এ নামও মহান আল্লাহ তা’আলা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা নাসাফী (রহ.) বলেন :

ولما ولد الحسين قال يا محمد ان الله يهنيك بهذا المولود و يقول لك اسمه باسم ابن هارون شبير و معناه حسين –(نزهة المجالس،ص٢٢٩)

'হোসাইন জন্ম গ্রহণ করার পর হযরত জিবরাইল (আ.) এসে বললেন : "হে মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ তা'আলা এ নবজাত শিশুর জন্মে আপনাকে অভিবাদন ও মুবারকবাদ জানিয়েছেন এবং বলেছেন, হযরত হারুন (আ.) –এর ছলের নামে তার নাম রাখতে। তার ছলের নাম শাব্বির, যার আর বি অর্থ হয় হোসাইন "।' (নুযহাতুল মাজালেস :. ২২৯)

ইমাম হোসাইন (আ.) ছিলেন রাসূলে আকরাম নূরে মোজাসসাম (সা.) –এর আহলে বাইতের অন্যতম স্তম্ভ। আহলে বাইত সম্পর্কে আল কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে রাসূলে পাক (সা.) তাদের পূত- পবিত্রতার কথা ঘোষণা করে ছেন। বিশ্ব বিখ্যাত হাদীস মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

عن عائشة خرج النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم غداة و عليه مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن على فادخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جائت فاطمة فادخلها ثم جاء على فادخله ثم قال :(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

'উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা বলেন : মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরবেলায় ঘর থেকে বের হন। তার গায়ে ছিল পশমের মোটা ইয়েমেনী চাদেই। তখন হাসান ইবনে আলী আসলেন। মহানবী তাকে এই বড় চাদরের ভেতর ঢুকিয়ে নিলেন, এরপর হোসাইন আসলেন তিনি তাকেও চাদরের ভেতর ঢুকিয়ে নিলেন, এরপর ফাতেমা আসলেন, পয়গম্বর (সা.) তাকেও চাদরের ভেতর ঢুকালেন। সবশেষে আলী আসলে মহানবী আলীকেও চাদরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন :

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

'আল্লাহর ইচ্ছায় হলো তিনি আহলে বাইত থেকে সকল প্রকার অপবিত্রতা দূর করবেন এবং তোমাদের সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করবেন'।" (সূরা আহযাব : ৩৩)

(মুসলিম শরীফ, ৫ম খণ্ড, . পৃ. ১৮৮৩; ফতহুল কাদীর শওকানী, ৪র্থ খণ্ড, . পৃ. ২৭৯)

এ হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী উক্ত পাঁচজনকে চাদরের ভেতর ঢুকিয়ে কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে আল্লাহর নবী আহলে বাইতের মর্যাদা যেভাবে তুলে ধরেছেন একজন ঈমানদারের জন্য এটাই যথেষ্ট। মহান আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র এরশাদ করে ন :

(قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ)

'হে রাসূল আপনি বলুন : আমি আমার দাওয়াতের জন্য তোমাদের কাছে আমার আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা ছাড়া অন্য কিছু চাইনা। যে কেউ উত্তম কাজ করে আমি তার জন্য তাতে পূণ্য বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাকারী, গুণগ্রাহী।' (সূরা আশ শুরা : ২৩)

আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের পদাংক অনুসরণই সত্য পথে টিকে থাকা এবং গোমরাহী থেকে নিজেকে রক্ষা করার অন্যতম উপায় হিসাবে আল্লাহর নবী বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা দিয়েছেন।

عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى حجته يوم عرفة و هو على ناقته القصواى يخطب فسمعته يقول يا ايها الناس انى تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا كتاب الله و عترتى اهل بيتي

'হযরত জাবের (রা.) বলেন, 'আমি আরাফার দিনে হজ্ব অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ (সা.) - কে তার কাসওয়া নামক উটনীর পিঠে বসা অবস্থায় সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলতে শুনেছি- হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের কাছে এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি তোমরা তা ধারণ করলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার আহলে বাইত।' (জামে তিরমিজি)

হযরত ইমাম হাসান (আ.) ও ইমাম হোসাইন (আ.) কত বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, রাসূলে আকরাম (সা.) –এর ঘোষণা থেকে তা সহজেই অনুমেয়।

عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة (رواه الترمذى ، ج ٢، ص ٢١٨)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করে ছেন : 'হাসান ও হোসাইন দু'জন বেহেশতবাসী যুবকদের নেতা।' (জামে তিরমিযি, ২য় খণ্ড, . ২১৭)

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর ঘোষণার প্রেক্ষিতিই মুফতী শফী (রহ.) লিখেছেন :

‘পবিত্র আহলে বাইতের মুহাববাত ঈমানের অংশ বিশেষ। আর তাদের প্রতি কৃত পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী ভুলে যাওয়ার মতো নয়। হযরত হোসাইন (রা.) এবং তার সাথী দের ওপর নিপীড়নমূলক ঘটনা এবং হৃদয়বিদারক শাহাদাত যার অন্তরে শোক এবং বেদনা সৃষ্টি করে না, সে মুসলমান তো নয়ই, মানুষ নামের অযোগ্য।’

ইমাম হোসাইন (আ.) ছিলেন মহানবী (সা.), শেরে খোদা হযরত আলী (আ.) এবং খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা যাহরা (আ.) –এর হাতে গড়া এক মহান ব্যক্তিত্ব। আল্লাহর দীনের জন্য নিবেদিত প্রাণ। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় না করে আপসহীনভাবে সত্যের সাক্ষি হিসাবে নিজেকে অটল, অবিচল রেখে প্রয়োজনে জীবন দিয়ে দীনকে ঠিক রাখার বাস্তব উদাহরণ ছিলেন হযরত ইমাম হোসাইন (আ.)। সত্যের প্রতি অবিচল থাকার অনন্য দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছিল হোর ইবনে ইয়াযীদ তামিমীর সেনাবাহিনীর সামনে ইমাম হোসাইনের প্রদত্ত ভাষণে। তিনি বলেন :

ايها الناس ان رسول الله عليه صلى الله و سلم قال من راى سلطانا جائزا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل فى عباد الله بالاثم و العدوان فلم يغير عليه بفعل و لا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخلة، الا و ان هولاء قد لزموا طاعة الشيطان و تركو طاعة الرحمن اظهر الفساد و عطلوا الحدود و استأثروا بالفئ و احلو حرام الله و حرموا حلاله و انا احق من غير

‘হে লোকসকল! রাসূলুল্লাহা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন অত্যাচারী শাসককে দখবে যে আল্লাহর হারামকে হালাল করছে, আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে, রাসূলের সুন্নাতের খেলাফ করছে, আল্লাহর বান্দাদের সাথে গুনাহ ও শত্রুতাপূর্ণ কাজ করছে, কাজ ও কথার দ্বারা কেউ যদি তা প্রতিহত করার না থাকে তখনই আল্লাহ তা’আলা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ন।’ তিনি বলেন : ‘সাবধান! ওরা (ইয়াযীদ গোষ্ঠি) রহমানের (আল্লাহর) আনুগত্য ছেড়ে দিয়েছে, বিপর্যয় সৃষ্টি করে ছে, আল্লাহর হদ বা সীমা বন্ধ করে দিয়েছে, বিনা পরিশ্রমে সম্পদ ভোগে মতে উঠেছে, আল্লাহ যা হারাম করে ছেন তা হালাল করছে, আর যা হালাল করে ছেন তা হারাম করছে, এ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে দিতে আমিই সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখি।’ (তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, . ৩০৭)

কারবালায় যাওয়ার পথে অনেকেই ইমাম হোসাইন (আ.) - কে বলেছেন এ পথ বিপজ্জনক। আপনি বরং ফিরে যান। ইমাম হোসাইন (আ.) তাদের জবাবে বলেছিলেন :

سامضی وما بالموت عار علی الفتی

اذا ما نوی حقا و جاهد مسلما

'আমাকে যেতে নিষেধ করছো ? কিন্তু আমি অবশ্যই যাবো, আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাও ? একজন বীরের কাছে কি মৃত্যু অপমানজনক?'

পবিত্র হজ্ব অনুষ্ঠানের মাত্র দু'দিন বাকি, এ সময় হজ্ব আদায় না করে কিয়ামের (আন্দোলনের) পথ বছে নিয়ে মক্কা থেকে কুফার পথে পাড়ি জমানো কত বলিষ্ঠ ঈমান ও খেলাফতে ইলাহিয়া রক্ষার বাস্তব প্রমাণ তা ইতিহাস, দর্শন ও শিক্ষা গ্রহণ কারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।

ইমাম হোসাইন (আ.) ছিলেন রাসূলে খোদা (সা.) - কে ভালোবাসার মাধ্যম।

عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من احب الحسن و الحسين فقد احبنی و من ابغضهما فقد ابغضنی

হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করে ন : 'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি হাসান ও হোসাইন কে ভালোবাসবে সে অবশ্যই আমাকে ভালোবাসবে, আর যে তাদের প্রতি দুশমনী রাখবে, সে অবশ্যই আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে।' (ইবনে মাজা)

আল কুরআনের আয়াত ও রাসূলে খোদা (সা.) –এর ঘোষণা মোতাবেক উম্মতের নাজাতের তরী হযরত হোসাইন (আ.)। তার শাহাদাতের ঘটনা শুনে শুধু ক্রন্দন বা আফসোস করাই তার প্রতি ভালোবাসার প্রকৃত প্রমাণ নয় বরং ইয়াযীদ ও তার উত্তরসূরি নব্য ইয়াযীদ যারা আল্লাহর এ যমিনে হারামকে হালাল করছে, আবার হালাল কে হারাম করছে, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধানকে বাদ দিয়ে তাগুতী শাসন চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে জান, মাল তথা সব কিছু দিয়ে 'বাঁচলে গাজী আর মরলে শহীদ' এ প্রত্যয় নিয়ে প্রত্যক্ষ জিহাদে অবতীর্ণ হওয়াই হযরত হোসাইন (আ.) – এর প্রতি ভালোবাসার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। ইয়াযিদী শাসন চলবে, সব বাতিলকে মেনে নেবো আর ইমাম হোসাইন (আ.) - এর জন্য কাদবো এটা হবে মুনাফিকের ঘৃণ্যপথ। তাই আজকে আসুন ইমাম হোসাইন (আ.) –এর মতো দীপ্ত শপথ গ্রহণ করি। হয় আমরা হকপন্থীরা

হকের ঝাণ্ডা উচু করে ই ছাড়বো, না হয় শাহাদাতের পেয়ালা পান করে শহীদানে কারবালার সাথী হবো। আর কবি নজরুলের কন্ঠে বলে উঠবো :

উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ আরবির,

দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির,

তবে শোন ঐ বাজে কোথা ফের দামামা

শমশের হাতে নাও, বাধো শিরে আমামা

বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য

হুশিয়ার ইসলাম, ডুবে তব সূর্য।

জাগো, ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দারি হাঁক

শহীদের খুনে সব লালে- লাল হয়ে যাক। (অগ্নিবীণা)

পরিশেষে সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নওয়াজ মঈনুদ্দীন চিশতী আজমেরী (রহ.) –এর কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই :

جان من نثارم بنام حسين

من غلام غلامان حسين

‘হোসাইনের নামে আমার জীবন উৎসর্গকৃত

আমি কেবল তারই গোলাম যিনি হোসাইনের গোলাম ’

গ্রন্থপঞ্জি :

১. কুরআন মজীদ; ২. সহীহ মুসলিম শরীফ; ৩. তিরমিযি শরীফ; ৪. ইবনে মাজা; ৫. নুযহাতুল মাজালেস; ৬. ফতহুল কাদীর শওকানী; ৭. মিরকাত ফি শারহিল মিশকাত; ৮. শহীদে কারবালা- মুফতী শফী (রহ.) ; ৯.তারিখে তাবারী; ১০. অগ্নিবীণা- কাজী নজরুল ইসলাম; ১২. দিওয়ানে খাজায়ে হিন্দ; ১৩. মাকতালুল হোসাইন ; ১৪. নেহায়াতুল আরব; ১৫. আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া।

* অধ্যক্ষ, ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদ্রাসা ও

চেয়াম্যান, ফার্সী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত ইমাম হোসাইন (আ.)

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন :

(فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)

'অতঃপর আদমের নিকট রবের পক্ষ থেকে কয়েকটি শব্দ ওহী করা হলো, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করলেন (তাকে ক্ষমা করলেন)। নিঃসন্দেহে তিনি পুনঃপুনঃপ্রত্যাবর্তনকারী (তওবা কবুলকারী) পরম দয়ালু।' (সূরা বাকারা: ৩৭)

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) আল্লাহ তা'আলা র মহান আরশের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং সেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মা'সুম ইমামগণের নাম দেখতে পলেন। হযরত জিবরাইল (আ.) তাকে নামগুলো কাদের তা বুঝিয়ে দিলেন। অতঃপর আদম (আ.) বললেন : 'হে পরম সাত্তা! আলীর উসিলায়, হে স্রষ্টা! ফাতেমার উসিলায় আমাদের ক্ষমা কর।'

এর পর হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) - এর নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে তার চোখে অশ্রু এসে গেল। তখন তিনি বললেন : 'হে আমার ভাই জিবরাইল! এর কী কারণ যে, হোসাইনের নাম উচ্চারণে আমার চোখে অশ্রু এসে যাচ্ছে ?

'জিবরাইল বললেন : 'আপনার বংশধরদের মধ্য থেকে আপনার এ সন্তান এমন মুসিবতের মুখোমুখি হবে যে, দুনিয়ার বুকে আসন্ন অন্য সমস্ত মুসিবত এর সামনো ম্লান হয়ে যাবে।' আদম (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন : 'তার ওপরে কী ধরনের মুসিবত আপতিত হবে ?'

জিবরাইল বললেন : 'তিনি পিপাসার্ত অবস্থায় তার পূর্বে নিহত সঙ্গীদের লাশ সামনে নিয়ে নিহত হবেন। শত্রুরা তার মৃত্যু দেখার জন্য অপেক্ষা করবে।' তখন আদম (আ.) ও জিবরাইল খুব ক্রন্দন করলেন।' (আল আওয়ালিম :.পৃ.১০৪- ১১৭)

'হায়! আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম'!

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাথে জিহাদে শরীক হতে পারেনি এক পর্যায়ে তারা বলবে :

(يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا)

'হায়! আমিও যদি তাদের সাথে থাকতাম তাহলে বিরাট সাফল্যের অধিকারী হতাম!' (সূরা নিসা : ৭৩)

হযরত ইমাম রেযা (আ.) উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করার পর বলেন : 'হে শহীদের! পুত্র তুমি যদি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তার আহলে বাইতের সাথে বেহেশতে স্থান লাভ করতে চাও, তাহলে তোমাকে হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) - এর হত্যাকারীদের প্রতি অভিসম্পাত করতে হবে। যারা তার সাথে শহীদ হয়েছিলেন তুমি যদি তাদের মতো পুরস্কৃত হতে চাও, তাহলে যখনই তুমি তার কথা স্মরণ করবে তখনই বলবে : হায়! আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে এক মহাবিজয় লাভ করতে পারতাম!' (বিহারুল আনওয়ার : ৪৪তম খণ্ডও, ২৯৯)

'অঙ্গীকার পূরণ কর'

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে এরশাদ করেন :

(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

'ঈমানদারদের মধ্যে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রণাঙ্গনে শহীদ হয়েছে ও কেউ কেউ (শাহাদাতের জন্য) প্রতীক্ষা করছে এবং তারা তাদের অঙ্গীকারে পরিবর্তন সাধন করে নি।' (সূরা আহযাব : ২৩)

আশুরার দিনে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সঙ্গী- সাথিগণ একজন একজন করে তার নিকট আসেন এবং তাকে অভিনন্দন জানান। তারা তাকে সম্বোধন করে বলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.)- এর বংশধর!' তখন তিনি তাদের অভিনন্দনের জবাবে বলেন : 'তোমাদের পরে শাহাদাতের জন্য আমরা অপেক্ষা করব।' এর পর তিনি উপরিউক্ত আয়াত পাঠ করলেন। এর পর ইমাম হোসাইন (আ.) - এর সঙ্গী- সাথিগণ (আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন) সকলেই

শহীদ হলেন এবং তার সাথে কেবল তার পরিবারের সদস্যরা রইলেন। (আল- আওয়ালিম : ১৭তম খণ্ডণ্ড, পৃ. ২৭৫) এর পর তারা (শত্রুরা) তার ওপর ভয়ঙ্কর ভাবে ঝাপিয়ে পড়ল।

ওপরে উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম রেযা (আ.) বলেন : 'আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) - এর নিকট হযরত ইসমাইল (আ.) - এর পরিবর্তে একটি দুম্বা পাঠালেন ও তা- ই কুরবানি করার নির্দেশ দিলেন, তখন ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন যাতে তার মধ্যে সেই পিতার বিয়োগ- ব্যথা অনুভূত হয় যিনি তার সন্তানকে কুরবানি করছেন এবং এভাবে যাতে তিনি সর্বোত্তম পুরস্কারের উপযুক্ত হতে পারেন। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নিকট ওহী হয় : 'হে ইবরাহীম! আমার সৃষ্ট সকল মানুষের মধ্যে তোমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় কে?' ইবরাহীম (আ.) জবাব দিলেন : 'আমি মুহাম্মাদকে সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসি।' আল্লাহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন : 'তুমি কাকে বেশি ভালোবাস, মুহাম্মাদকে, নাকি তোমার আত্মাকে?' তিনি বললেন : 'মুহাম্মাদকে।' আল্লাহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন : 'তার সন্তান কি তোমার নিকট তোমার নিজের সন্তানের চেয়ে প্রিয়তর ?'তিনি জবাব দিলেন : 'অবশ্যই।' আল্লাহ বললেন : 'কঠিন মুসিবতে নিপতি হয়ে মুহাম্মাদের সন্তানের মৃত্যুকেই কি তুমি বেশি কষ্ট পাবে, নাকি আমার প্রতি তোমার আনুগত্য প্রকাশের জন্য নিজের হাতে তোমার পুত্রের কুরবানিতে বেশি কষ্ট পাবে?' তিনি বললেন : ' মুহাম্মাদের সন্তানের মৃত্যুতে।' তখন আল্লাহ বললেন : 'ইবরাহীম! একদল লোক যারা নিজেদেরকে মুহাম্মাদের অনুসারী বলে মনে করবে- তার সন্তানের রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করবে এবং এভাবে তারা আমার ক্রোধের শিকার হবে।' একথা শুনে ইবরাহীম (আ.) ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তার নিকট ওহী প্রেরণ করলেন : 'হে ইবরাহীম! হোসাইনের মৃত্যু তোমার জন্য এক বিরাট মুসিবত স্বরূপ হতো। এ কারণে মহামুসিবতে নিপতিত হওয়ায় আমি যাদেরকে পুরস্কৃত করব তোমাকেও তদ্রূপ পুরস্কৃত করব।' (বিহারুল আনওয়ার : ৪৪তম খণ্ডণ্ড, . পৃ. ২২৫- ২৬৬) আল্লাহ তা'আলা সূরা আল- ফাজরে এরশাদ করেন :

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً)

‘হে নিশ্চিন্ত নাফস! তুমি তোমার রবের দিকে প্রত্যাবর্তন কর এমন অবস্থায় যে, তুমি (তার প্রতি) সন্তুষ্ট ও (তার পক্ষ থেকে) সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত।’ (সূরা আল- ফাজরে- ২৭- ২৮)

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.) বলেন : ‘তোমরা তোমাদের নামাযে সূরা আল- ফাজর পড়বে। হোসাইন বিন আলী (আ.) প্রসঙ্গে এটি নাযিল হয়েছে।’ তখন সেখানে উপস্থিত আবু আসসামা তাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে ইমাম বললেন : ‘এখানে ‘হে নিশ্চিন্ত নাফস’ বলতে ইমাম হোসাইন (আ.) - এর নামকে বোঝানো হয়েছে। তিনি আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট, এ কারনে আল্লাহও তার ওপর সন্তুষ্ট। আর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) - এর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত তার সঙ্গী- সাথিগণ শেষ বিচাই দিনের ব্যাপারে আল্লাহর ওপর সনন্তুষ্ট। যারা সব সময় এ আয়াত পড়বে তারা বেহেশতে ইমাম হোসাইন (আ.) - এর সাথে থাকবে।’ (বিহারুল আনওয়ার : ৪৪তম খণ্ড, পৃ.২১৮- ২১৯)

মাহবুবা, জুন- ১৯৯৬

অনুবাদ :মুহাম্মাদ আবু যীনাত

‘আমি কোনো ধন- সম্পদ বা ক্ষমতার লোভে কিংবা গালযোগ সৃষ্টির জন্য বিদ্রোহ করছিনা, আমি আমার নানাজানের উম্মতের মধ্যে সংস্কার করতে চাই, আমি ‘সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ’ করতে চাই এবং আমার নানাজান যে পথে চলেছেন আমি ও সে পথে চলতে চাই।’

ইমাম হোসাইন (আ.) [মাকতালু খারাযমী : ১/১৮৮]

ইমাম হোসাইন (আ.) - এর অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ*

সত্য ও ন্যায়ের ঝাণ্ডাবাহী ইমাম হোসাইন (আ.) ছিলেন নবী বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ। কারবালার রক্তাক্ত প্রান্তরে শাহাদাতের অভূতপূর্ব ঘটনার আকস্মিকতায় তার সুবিশাল জীবনের অনেক দিকই পাঠকের নিকট অজানা। শোকবিহ্বল উম্মতে মুহাম্মাদী (সা.) প্রায় ক্ষেত্রে আশুরার আলোচনায় কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার বর্ণনা শুনেই ক্ষান্ত হন, কিন্তু তার পূত- পবিত্র বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্ম এবং অনুপম চারিত্রিক মাধুর্য তাদের কাছে অজানাই থেকে যায়।

নবী দৌহিত্র, মা ফাতেমা ও হযরত আলীর কলিজার টুকরা ইমাম হোসাইনের জীবনের প্রতিটি পর্যাযে রয়েছে উন্নত চরিত্রের নিদর্শন যা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ।

বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) - এর স্নেহছায়ায় লালিত ইমাম হাসান ও হোসাইন ছিলেন চেহারা- সুরতে, চলনে- বলনে নবীজীরই প্রতিরূপ। শিশুকাল হতেই নবীজীর সাহাবিগণ তাদের অত্যন্ত স্নেহ, সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাদের ভালোবাসার কথা নবীজী বহুস্থানে বহুবার উচ্চারণ করেছেন এ কথা সর্বজনবিদিত।

ছোটবেলা হতেই তারা নবী গৃহে স্বয়ং রাসূলে পাক (সা.) হতে দ্বীনি শিক্ষা লাভ করেন। বাবা জ্ঞান নগরীর দরজা হযরত আলী (আ.) ও মা খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (সা.আ.) –এর সান্নিধ্য ছিল তাদের শিক্ষার সবচেয়ে বড় সহায়ক।

হযরত হোসাইন (আ.) ছিলেন চরিত্র মাধুর্যে কুরআনের জীবন্ত নমুনা। তার সুললিত কন্ঠের কুরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য সাহাবীরা ছিলেন দিওয়ানা। ইবাদাত- বন্দেগিতে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ, অতুলনীয়। যুবায়ের বিন বকর (রা.) বলেন, মুসআব আমাকে জানিয়েছেন, হযরত হোসাইন ২৫ বার মদীনা হতে মক্কায় পায়ে হেটে পবিত্র হজ্ব পালন করেন।

নামাযের প্রতি ছিল ইমামের বিশেষ আকর্ষণ। আশুরার রাতে তিনি পরিবার- পরিজন নিয়ে অবর্ণণীয় ক্ষুধা- পিপাসায় কাতর অবস্থায়ও সারারাত আল্লাহর আরাধনায় মশগুল ছিলেন।

আশুরার দিন শাহাদাতের পূর্বমুহূর্তে কারবালা প্রান্তরে শত্রু সৈন্যবেষ্টিত সংকটময় মুহূর্তেও তিনি যোহরের নামায আদায় করেন।

ইমাম হোসাইন (আ.) কেমন জ্ঞানসাধক ছিলেন তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হলো একবার আমীর মু'আবিয়া কুরাইশ বংশীয় একজন লোককে বলেছিলেন, মসজিদে নববীতে যখন তুমি একদল লোককে (একজন ঘিরে) চাক্রাকারে নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে দখবে, যেন মনে হবে তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে, ধরে নেবে যে তা হচ্ছে আবু আব্দুল্লাহর (ইমাম হোসাইনের) পাঠচক্র, যার জামা হাতের কব্জির অর্ধেকাংশ পর্যন্ত প্রলম্বিত। লোকেরা তার পাঠ গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে।' (তারিখে ইবনে আসাকির)

ঘোড়া ও অসি চালনায় তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। কিশোর বয়সেই ইমাম হোসাইন (আ.) যুদ্ধ বিদ্যার শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি দু'একটি যুদ্ধেও সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন। জিহাদের ডাকে প্রয়োজনের মুহূর্তে সারা দিতে তিনি কখনো পিছপা হতেন না। জিহাদের ময়দানে তার উপস্থিতি মুসলিম মুজাহিদদের অপরিসীম অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করত।

তিনি ছিলেন দানশীল। গরীব- অসহায়ের দরদী। তার দুয়ার হতে কেউ খালি হাতে ফিরে যায়নি। মানুষের অসহায়ত্ব দেখলে তার মন হাহাকার করে উঠত। একবার এক গ্রাম্য গরীব বেদুইন মদীনার অলিগলি ঘুরে কোথাও কিছু না পেয়ে ইমাম হোসাইন (আ.) - এর দুয়ারে এসে হাজির। তিনি তখন গভীর ধ্যানে নামাযেরত। ভিক্ষুকের হাকডাকে তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে দুয়ারে এসে দেখেন গরীব লোকর অবস্থা সত্যিই শোচনীয়। তিনি গৃহ ভৃত্য কাম্বারের কাছে জানতে পারলেন তার পরিবারের খরচের জন্য মাত্র ২০০ দিরহাম অবশিষ্ট আছে। তিনি বললেন, 'তা নিয়ে এসো। কারণ; এমন একজন প্রার্থী এখানে উপস্থিত হয়েছে যার প্রয়োজন আমার পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনের চাইতে বেশি।' ইমাম হোসাইন সে অর্থের পুরোটাই বেদুইনের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এটা রাখো, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই, আমার অন্তর তোমার জন্য

বিগলিত, আমার যদি আরো থাকত, তাও তোমাকে দিয়ে দিতাম। উন্মুক্ত আকাশ হতে সম্পদের বারিপাত হোক তোমার মাথার ওপর, কিন্তু ভাগ্যের ওপর সন্দেহ আমাদের অসুখি করে রাখে।' ভিক্ষুকটি ইমাম বংশের মর্যাদার কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে উচ্চারণ করতে করতে বিদায় নিল। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৪র্থ খণ্ড)

তিনি ঋণগ্রস্থ অনেক সাহাবীকে ঋণমুক্ত করেছেন। কবিদের তিনি ভালোবাসতেন। মুক্ত হস্তে তাদের দান করতেন। কেউ কেউ তাতে আপত্তি করলে তিনি বলতেন : 'সেই অর্থই সর্বোত্তম যা একজন মানুষের মর্যাদা রক্ষা করে।' (তাহজিবুল কামাল)

তিনি বিভিন্ন মজলিসে লোকদের উদ্দেশ্যে বলতেন : 'যে দানশীল সে- ই সম্মানিত হবে, যে কৃপণ সে লাঞ্চিত হবে। আপন প্রয়োজনের অর্থ বিলিয়ে দেয়ার মাঝেই রয়েছে মহত্ব। প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ক্ষমা করে দেয় সে- ই সবচেয়ে উত্তম। আত্মীয়তার বন্ধনকে যে আটুট রাখে সে- ই শ্রেষ্ঠ। যে অন্যকে ইহসান করে আল্লাহ তাকে ইহসান করেন। কারণ, আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের ভালোবাসেন।'

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন যে, তার সময় শেষ হয়ে এসেছে। তিনি বলতে লাগেলেন : 'আমি তো ৬০ হাজার দিরহাম ঋণী। এটা আদায় হলে আমার মৃত্যুকালীন কষ্ট লাঘব হতো। কে আমার ঋণভার লাঘব করবে?'

ইমাম হোসাইন (আ.) এ কথা শুনলেন। তিনি কালবিলম্ব না করে উসামার কাছে গেলেন এবং তার সব ঋণ আদায় করে দিলেন।

ইমাম হোসাইন (আ.) ছিলেন স্নেহশীল পিতা, অনুগত ভ্রাতা এবং আত্মীয়তার আটুট বন্ধনে আবদ্ধ একজন আদর্শ মানব। তার সন্তানরা যেমন তাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন তেমনি আত্মীয়-স্বজনরা মক্কা হতে কুফার পথে ও কারবালা প্রান্তরে গভীর সংকটময় মুহূর্তেও তার সাথে ছিলেন। একে একে সকল পুরুষ সদস্য হাসিমুখে শাহাদাতের পিয়ালা পান করেছেন তবুও ইমাম কে একা ছেড়ে যাননি। পৃথিবীর ইতিহাসে এ দৃশ্য বিরল। অতীতে কেউ এরূপ ঘটনা দেখেনি, শুনেনি, ভবিষ্যতেও কেউ তা দেখবে না, শুনবে না।

নবী নন্দিনী ফাতেমা যাহরার পুত্র ইমাম হোসাইন (আ.) ছিলেন পরম বাগ্মী ও শৈল্পিক মনের মানুষ। তিনি যখন কথা বলতেন তা যেন কথা নয়, তখন মনে হতো যে, তার মুখ দিয়ে ঝরে পড়ছে মুক্তোর দানা। কবিত্ব শক্তিতেও তিনি ছিলেন বলীয়ান। তার কাব্য প্রতিভার অনেক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে আরবি সাহিত্যে। তার অধিকাংশ কবিতায় ফুটে উঠেছে নীতি কথা, কাল্যাণমূলক উপদেশ। যেমন :

'যদি দুনিয়ার জীবনকে বেশি মূল্যবান মনে করা হয়, স্মরণ রেখ, আল্লাহর পুরস্কার তার চেয়েও মর্যাদার ও অতীব চমৎকার।'

'যদি দেহকে তৈরী করা হয়ে থাকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য, তাহলে তলোয়ারের আঘাতে মৃত্যুই অধিক শ্রেয়।'

'পৃথিবীর সমস্ত সম্পদকেই যদি মৃত্যুর মাধ্যমে ছেড়ে যেতে হয়, তাহলে সম্পদ বিলিয়ে দিলে ক্ষতিই বা কী? দু'দিনের এ সম্পদ নিয়ে কেনইবা এত কৃপণতা।'

তিনি অন্য একটি কবিতায় বলেছেন :

'সৃষ্টির মুখাপেক্ষী হয়ো না
নির্ভার হয়ে নির্ভর করো সৃষ্টার ওপর
সত্যবাদী হোক কিংবা মিথ্যা্বাদী,
কারো হাতে মিটবেনা তোমার প্রয়োজন
মহান আল্লাহর অফুরন্ত ভাণ্ডার হতে তালাশ করো তোমার রিযিক।
তিনি ছাড়া রিযিকের মালিক আর কেউ নই।
যে বিশ্বাস করে মানুষই তার প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা রাখে,
বুঝতে হবে পরম দয়ালু দাতার প্রতি তার বিশ্বাস অনিমেষ শূন্য।'

ইমামের কবিতার মধ্য দিয়েই তার মনোভাব প্রস্ফুটিত হয়েছে। কষ্টার্জিত অর্থ মুক্ত হস্তে দান করে তিনি যখন অসহায়ের দুঃখ লাঘব করছেন তখন ইয়াযীদ ও তার দোসররা রাষ্ট্রিয় কোষাগার বায়তুল মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করে লুটে- পুটে খাচ্ছে আর চারদিকে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে

অবৈধ ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। নবী দৌহিত্র এ অন্যায়-অবিচার কীভাবে মুখ বুজে সহ্য করে থাকতে পারেন?

প্রজ্ঞাবান অনুপম চরিত্রের অধিকারী ইমাম হোসাইন (আ.) - এর ব্যক্তিত্ব কারো সাথে তুলনা করা যায়না। ইয়াযীদ যখন তার পিতার অবৈধ অসিয়তনামার বদৌলতে মুসলিম উম্মাহর ঘাড়ে চেপে বসে তখন তার এমন কোনো গুণ ছিল না যে, মানুষ তাকে সানন্দে 'আমীরুল মু'মিনীন' হিসাবে মেনে নবে। যেখানে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ কেউই তার হাতে বাইয়াত হননি এবং হযরত হাসান (আ.) ও আমীর মুয়াবিয়ার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ইমাম হোসাইন খেলাফতের একমাত্র হকদার সেখানে তিনি কি করে অবৈধ শাসন মেনে নেবেন?

ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী তার A Short History of the Saracens (p. 83) -এ বলেন, ইয়াযীদ ছিল যেমন নিষ্ঠুর তেমনি বিশ্বাসঘাতক; তার কলুষিত মনে দয়া-মায়া বা সুবিচারের কোনো স্থান ছিল না। তার আমোদ-প্রমোদ যেমন নিচুস্তরের; সঙ্গী-সাথীরাও ছিল তেমনই নিচাশয় ও দুশ্চরিত্র। একটি বানরকে মাওলানার মতো পাশোক পরিয়ে সে ধর্মীয় নেতাদের বিদ্রূপ করত এবং যেখানে যেত সেখানে জন্তুটিকে নিয়ে যেত কারুকার্যময় বস্ত্রে সজ্জিত একটি সিরীয় গাধার পিঠে বসিয়ে। তার দরবারে মদপানজনিত হাঙ্গামা হতো এবং তা প্রতিফলিত হলো রাজধানী দামেস্কের রাস্তায়।

ইয়াযীদ যখন অনৈতিকভাবে রাজসিংহাসনে আরোহণ করে তখন তার বয়স মাত্র সাইত্রিশ বছর। আর ইমাম হোসাইন (আ.) জ্ঞানে-গুণে পরিপক্ক ছাপ্পান্ন বছরের এক পরিপূর্ণ মানুষ।

বংশানুক্রমিকভাবে নানা, বাবা ও মায়ের পূত-পবিত্র স্বভাব ও গুণাবলী তার মাঝে বিরাজমান ছিল।

ইংরেজ ঐতিহাসিক সিডিলট ইমাম হোসাইনের সহজ-সরল জীবনের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন : 'তার মধ্যে একটি গুণেরই অভাব ছিল তা হলো ষড়যন্ত্রের মানসিকতা যা ছিল উমাইয়্যা বংশীয়দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।' (প্রাগুক্ত, . ৮৪)

শাহাদাত লাভের জন্য এমন উদগ্রীব মানুষ এ পৃথিবীতে খুব কমই পরিদৃষ্ট হয়েছে। তিনি বলতেন : 'শরীরের জন্য যদি মৃত্যুই অনিবার্য, তবে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়াই মানুষের জন্য উত্তম।' জিহাদের জন্য নিজের ধন-সম্পদ, পুত্র-পরিজন ও নিজের জীবনকে দৃঢ়চিত্তে, স্থির মস্তিষ্কে উৎসর্গ করার মাধ্যমে তিনি তা প্রমাণ করেছেন। জীবন উৎসর্গের এমন, দৃষ্টান্ত এ পৃথিবীতে আর একটিও নেই। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের খোদায়ী আহবানে সাড়া দানের এ বিরল নজির আর কোথাও খুজে পাওয়া যাবেনা।

ইমাম হোসাইনের চারিত্রিক মাধুর্যের আকর্ষণ ক্ষমতা এত প্রবল ছিল যে, পরম শত্রুও তার মিত্রে পরিণত হয়ে ছিল। ইয়াযীদ বাহিনীর একাংশের অধিনায়ক হোর ইবনে ইয়াযীদ নিজের জীবন বিপন্ন করে হোসাইন (আ.) - এর নিকট নিজেকে সমর্পণ করে ছিলেন। শুধু কি একা! না, আরো কয়েক জন সৈন্যসহ। আহলে বাইতের সম্মান রক্ষার্থে সম্মুখ সমরে অংশ নিয়ে এ জিন্দাদিল মুজাহিদগণ একে একে নিজেদেরকে কারবালা প্রান্তরে কুরবান করে দিলেন।

বন্ধু, আত্মীয়-পরিজন, ভাইয়ের সন্তান, নিজের সন্তানদের একের পর এক মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেও ইমাম হোসাইন (আ.) ক্ষণিকের জন্য বিব্রত, বিচলিত হননি। নিশ্চিত মরণ জেনেও তার পদযুগল একটুও টলেনি। একবারের জন্যও শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। পর্বতসম দৃঢ়তা নিয়ে প্রগাঢ় আস্থার সাথে একাকী শতসহস্র ইয়াযিদী সৈন্যের বিরুদ্ধে সিংহের মতো লড়াই করে হাসিমুখে শহীদ হলেন। কিন্তু খোদা ও রাসূলবিরোধী অবৈধ, স্বৈরশাসকের সাথে হাত মেলাননি। এ অসম, একতরফা চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে নিজের পরিণতি কী হতে পারে তা পূর্বাহ্নে নিশ্চিত জেনেই এ আপসহীন সিপাহসালার শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন : 'নির্যাতনকারীর আনুগত্য জঘন্যতম অপরাধ। আমি মৃত্যুকে সৌভাগ্য মনে করি। কিন্তু জালিমের সাথে জীবনযাপনকে অপমান ছাড়া কিছুই মনে করিনা।'

কারবালায় কি ইমাম হোসাইনের মৃত্যু হয়েছে? না, প্রকৃত মৃত্যু হয়েছে ইয়াযীদের। পাপিষ্ঠ ইয়াযীদ ইতিহাসের আস্তাকূঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, পক্ষান্তরে হোসাইন কিয়ামত পর্যন্ত মুমিনের হৃদয়ে জাগরুক থাকবেন। হোসাইনের পবিত্র খুন কিয়ামত পর্যন্ত সকল মজলুম মুসলমানের হৃদয়ে

বিপ্লবের অগ্নিশিখারূপে প্রজ্জ্বলিত হবে। কুরআন- সুন্নাহ বিরোধী রাজতন্ত্রী স্বৈরশাসকদের পতন ঘটাবে।

বেহেশতের সর্দার ইমাম হাসান ও হোসাইন (আ.) - এর সাথে মিলিত হবার ও তাদের নেতৃত্ব অনন্তকাল বেহেশতে বসবাসের এই তো উত্তম সোপান। ইমাম হোসাইন (আ.) - এর পূত- পবিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের মধ্যেই আমাদের জীবনের কাল্যাণ নিহিত। পরিশেষে রাসূলেপাক (সা.) - এর সহীহ ও সুপ্রসিদ্ধ সেই হাদীস উল্লেখ করছি :

'হোসাইন আমা হতে আর আমি হোসাইন থেকে। যে হোসাইন কে ভালোবাসে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। সে আমার দৌহিত্রের একজন। যে আমাকে ভালোবাসে সে যেন হোসাইনকে ভালোবাসে।'

*** সম্পাদক, মাসিক দ্বীন- দুনিয়া,**

বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, চাট্রগ্রাম ৪১০০

আশুরার হৃদয়বিদারক ঘটনা

আশুরার (দশ মহররম) রাতে ইমাম হোসাইন (আ.)

কিতাবুল ইরশাদ- এ বর্ণিত হয়েছে, ইমাম হোসেইন (আ.) তার সাথীদের রাতের বেলা জড়ো করলেন, ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (আ.) বলেন যে, আমি তাদের কছে গেলাম শোনার জন্য তারা কী বলেন এবং সে সময় আমি অসুস্থ ছিলাম। আমি শুনলাম ইমাম তার সাথীদের বলছেন,

"আমি আল্লাহর প্রশংসা করি সর্বোত্তম প্রশংসার মাধ্যমে এবং তাঁর প্রশংসা করি সমৃদ্ধির সময়ে এবং দুঃখ দুর্দশার মাঝেও। হে আল্লাহ, আমি আপনার প্রশংসা করি এ জন্য যে, আপনি আমাদের পরিবারে নবুয়াত দান করতে পছন্দ করেছেন। আপনি আমাদের কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং ধর্মে আমাদেরকে বিজ্ঞজন করেছেন এবং আমাদেরকে দান করেছেন শ্রবণ শক্তি ও দূরদৃষ্টি এবং আলোকিত অন্তর। তাই আমাদেরকে আপনার কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আম্মা বা'আদ, আমি তোমাদের চেয়ে বিশস্ত এবং ধার্মিক কোন সাথীকে পাই নি, না আমি আমার পরিবারের চাইতে বেশী বিবেচক, স্নেহশীল, সহযোগিতাকারী ও সদয় কোন পরিবারকে দেখেছি। তাই আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে উত্তমভাবে পুরস্কৃত করুন এবং আমি মনে করি শত্রুরা একদিনও অপেক্ষা করবে না এবং আমি তোমাদের সবাইকে অনুমতি দিচ্ছি স্বাধীনভাবে চলে যাওয়ার জন্য এবং আমি তা তোমাদের জন্য বৈধ করছি। আমি তোমাদের উপর থেকে আনুগত্য ও শপথের দায়ভার তুলে নিচ্ছি (যা তোমরা আমার হাতে হাত দিয়ে শপথ করেছিলে)। রাতের অন্ধকার তোমাদের ঢেকে দিয়েছে, তাই নিজেদের মুক্ত করো ঘূর্ণিপাক থেকে অন্ধকারের ঢেউয়ের ভেতরে। আর তোমাদের প্রত্যেকে আমার পরিবারের একজনের হাত ধরে ছড়িয়ে পড়ো গ্রাম ও শহরগুলোতে, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের মুক্তি দান করেন। কারণ এ লোকগুলো শুধু আমাকে চায় এবং আমার গায়ে হাত দেয়ার পরে তারা আর কারো পেছনে ধাওয়া করবে না।"

এ কথা শুনে তার ভাইয়েরা, সন্তানরা, ও ভাতিজারা এবং আব্দুল্লাহ বিন জাফরের সন্তানরা বললেন, "আমরা তা কখনোই করবো না আপনার পরে বেঁচে থাকার জন্য। আল্লাহ যেন কখনো

তা না করেন।” হযরত আব্বাস বিন আলী (আ.) সর্বপ্রথম এ ঘোষণা দিলেন এবং অন্যরা তাকে অনুসরণ করলেন।

ইমাম তখন আক্বীল বিন আবি তালিবের সন্তানদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, “মুসলিমের আত্মত্যাগ তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছে, তাই আমি তোমাদের অনমতি দিচ্ছি চলে যাওয়ার জন্য।” তারা বললেন, “সুবহানাল্লাহ, লোকেরা কী বলবে? তারা বলবে আমরা আমাদের প্রধানকে, অভিভাবককে এবং চাচাতো ভাইকে, যে শ্রেষ্ঠ চাচাতো ভাই, পরিত্যাগ করেছি এবং আমরা তার সাথে থেকে তীর ছুড়িনি, বর্শা দিয়ে আঘাত করি নি এবং তার সাথে থেকে তরবারি চালাই নি এবং তখন আমরা (এ অভিযোগের মুখে) বুঝতে পারবো না কী করবো; আল্লাহর শপথ, আমরা তা কখনোই করবো না। প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের জীবন, সম্পদ ও পরিবার আপনার জন্য কোরবানী করবো। আমরা আপনার পাশে থেকে যুদ্ধ করবো এবং আপনার পাশে থেকে পরিণতিতে পৌঁছে যাবো। আপনার পরে জীবন কুৎসিত হয়ে যাক (যদি বেঁচে থাকি)।”

এরপর মুসলিম বিন আওসাজা উঠলেন এবং বললেন, “আমরা আপনাকে কি পরিত্যাগ করবো? তারপর যখন আল্লাহর সামনে যাবো তখন তার সামনে আপনার অধিকার পূরণের বিষয়ে আমরা কী উত্তর দিবো? না, আল্লাহর শপথ, আমি আমার এ বাঁকা তরবারি শত্রুদের হৃৎপিণ্ডে ঢুকিয়ে দিবো এবং আমি তাদেরকে আমার তরবারি দিয়ে আঘাত করতেই থাকবো যতক্ষণ না এর শুধু হাতলটা আমার হাতে থাকে। আর যদি তাদের সাথে যুদ্ধ করার মতো আমার হাতে কোন অস্ত্র আর না থাকে তাহলে আমি তাদেরকে পাথর দিয়ে আক্রমণ করবো। আল্লাহর শপথ, আমরা আপনার হাত থেকে আমাদের হাত তুলে নিবো না যতক্ষণ না আল্লাহর কাছে প্রমাণিত হয় যে আমরা আপনার বিষয়ে নবীর সম্পর্ককে সম্মান দিয়েছি। আল্লাহ শপথ, যদি এমনও হয় যে, আমি জানতে পারি যে আমাকে হত্যা করা হবে এবং এরপর আমাকে আবার জাগ্রত করা হবে এবং এরপর হত্যা করা হবে এবং পুড়িয়ে ফেলা হবে এবং আমার ছাই চারদিকে ছড়িয়ে দেয় হবে এবং তা যদি সত্তর বারও ঘটে, তারপরও আমি আপনাকে পরিত্যাগ করবো না যতক্ষণ না আপনার

আনুগত্যে আমি নিহত হই। তাহলে কিভাবে আমি তা পরিত্যাগ করবো যখন জানি যে মৃত্যু শুধু একবার আসবে যার পরে এক বিরাট রহমত আমার জন্য অপেক্ষা করছে?"

এরপর যুহাইর বিন ক্বাইন উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমি খুবই ভালোবাসবো যদি আমাকে হত্যা করা হয় এবং এরপর জীবিত করা হয় এবং এরপর আবারও হত্যা করা হয় এবং তা এক হাজারবার ঘটে এবং এভাবে সর্বশক্তিমান ও মহান আল্লাহ যেন আপনাকে ও আপনার পরিবারকে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করেন।"

এরপর অন্যান্য সব সাথীরা তা পুনরাবৃত্তি করেন, [তাবারির বর্ণনামতে] তারা বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করবো না, বরং আমাদের জীবন আপনার জীবনের জন্য কোরবানী হবে। আমরা আপনাকে রক্ষা করবো আমাদের ঘাড়, চেহারা ও হাত দিয়ে। এরপর দায়িত্ব পালন শেষে আমরা সবাই মৃত্যুবরণ করবো।"

নিচের রণশেস্লাকটি তাদের আলোচনাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে, "হে আমার অভিভাবক, যদি আমার শ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসন আরশ পর্যন্ত পৌঁছায় তবুও আমি আপনার চাকর হয়ে এবং আপনার দরজায় ভিক্ষুক হয়ে থাকবো এবং যদি আমি আমার হৃদয় ও এর ভালোবাসাকে আপনার কাছ থেকে তুলে নিই তাহলে কাকে আমি ভালোবাসবো এবং আমার হৃদয়কে কোথায় নিয়ে যাবো?"

আল্লাহ তাদেরকে ইমাম হোসেইন (আ.) এর বিষয়ে উদারভাবে দান করুন।

এরপর ইমাম হোসেইন (আ.) তার তাঁবুতে ফিরে গেলেন।

"আল্লাহ সেই যুবকদের পুরস্কৃত করুন যারা ধৈর্যের সাথে সহ্য করেছেন, তারা ছিলেন পৃথিবীর যে কোন জায়গায় অতুলনীয়। তারা ছিলেন উত্তম চরিত্রের প্রতিচ্ছবি এবং বাটির পানি মিশ্রিত দুধ নয় যা পরে প্রস্রাবে পরিণত হয়।"

সাইয়্যেদ ইবনে তাউস বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ বিন বাশার হাযরামীকে বলা হলো যে, "তোমার ছেলেকে 'রেই' শহরের সীমান্তে গ্রেফতার করা হয়েছে।" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি তাকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করলাম। আমার জীবনের শপথ, তার গ্রেফতার হওয়ার পর আমি বেঁচে থাকতে চাই না।" ইমাম হোসেইন (আ.) তার কথাগুলো শুনতে পেলেন এবং

বললেন, "তোমার আল্লাহ তোমার উপর রহমত করুন, আমি তোমার কাছ থেকে বাইয়াত তুলে নিলাম, তুমি যেতে পারো এবং তোমার ছেলেকে মুক্ত করার চেষ্টা করো।"

তিনি বললেন, "আমি যদি আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হই আমি হিংস্র পশুদের শিকার হয়ে যাবো।" এতে ইমাম বললেন, "তাহলে এ ইয়েমেনী পোষাকগুলো দিয়ে তোমার অন্য ছেলেকে পাঠাও, যেন সে তাকে এগুলোর বিনিময়ে মুক্ত করতে পারে।"

তিনি মুহাম্মাদ বিন বাশারকে পাঁচটি পোষাক দিলেন যার মূল্য এক হাজার স্বর্ণের দিনার।

হোসেইন বিন হামদান হাযীনি তার বর্ণনা ধারা বজায় রেখে আবু হামযা সূমালি থেকে বর্ণনা করেন এবং সাইয়্যেদ বাহরানি বর্ণনার ক্রমধারা উল্লেখ না করেই তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন যে: আমি ইমাম আলী আল যায়নুল আবেদীনকে বলতে শুনেছি, শাহাদাতের আগের রাতে আমার বাবা তার পরিবার এবং সাথীদের জড়ো করলেন এবং বললেন, "হে আমার পরিবারের সদস্যরা এবং আমার শিয়ারা, এ রাত সম্পর্কে ভেবে দেখো যা তোমাদের কাছে বহনকারী উট হয়ে এসেছে এবং নিজেদেরকে রক্ষা করো। কারণ লোকেরা আমাকে ছাড়া কাউকে চায় না। আমাকে হত্যা করার পর তারা তোমারদেরকে তাড়া করবে না। আল্লাহ তোমাদের উপর রহমত করুন। নিজেদেরকে রক্ষা করো। নিশ্চয়ই আমি আনুগত্য ও শপথের দায়ভার তুলে নিলাম যা তোমরা আমার হাতে করেছো।" এ কথা শুনে তার ভাইয়েরা, আত্মীয়-স্বজন ও সাথীরা একত্রে বলে উঠলো, "আল্লাহর শপথ হে আমাদের অভিভাবক, হে আবা আবদিল্লাহ আমরা আপনার সাথে কখনোই বিশ্বাসঘাতকতা করবো না, তাতে লোকেরা বলতে পারে যে আমরা আমাদের ইমামকে, প্রধানকে এবং অভিভাবককে পরিত্যাগ করেছি এবং তাকে শহীদ করা হয়েছে। তখন আমরা আমাদের ও আল্লাহর মাঝে ওজর খুঁজবো। আমরা আপনাকে কখনোই পরিত্যাগ করবো না যতক্ষণ না আমরা আপনার জন্য কোরবান হই।" ইমাম বললেন, "নিশ্চয়ই আগামীকাল আমাকে হত্যা করা হবে এবং তোমাদের সবাইকে আমার সাথে হত্যা করা হবে এবং তোমাদের কাউকে রেহাই দেয়া হবে না।" তারা বললেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যে তিনি আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন আপনাকে সাহায্য করার জন্য এবং

আমাদেরকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন আপনার সাথে শহীদ হওয়ার জন্য। তাহলে কি আমরা পছন্দ করবো না যে আমরা আপনার সাথে উচ্চ মাক্বামে (বেহেশতে) থাকবো, হে রাসূলুল্লাহর সন্তান?" ইমাম বললেন, "আল্লাহ তোমাদের উদারভাবে পুরস্কৃত করুন।" এরপর তিনি তাদের জন্য দোআ করলেন।

তখন ক্বাসিম বিন হাসান (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি শহীদদের তালিকায় আছি?" তা শুনে ইমাম আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং বললেন, "হে আমার প্রিয় সন্তান, তুমি মৃত্যুকে তোমার কাছে কিভাবে দেখো?" ক্বাসিম বললেন, "মধুর চেয়ে মিষ্টি।" ইমাম বললেন, "নিশ্চয়ই, আল্লাহর শপথ, তোমার চাচা তোমার জন্য কোরবান হোক, তুমি তাদের একজন যাদেরকে শহীদ করা হবে আমার সাথে কঠিন অবস্থার শিকার হওয়ার পর এবং আমার (শিশু) সন্তান আব্দুল্লাহ (আলী আসগার)- কেও শহীদ করা হবে।"

এ কথা শুনে ক্বাসিম বললেন, "হে চাচাজান, তাহলে কি শত্রুরা মহিলাদের কাছে পৌঁছে যাবে দুধের শিশু আব্দুল্লাহকে হত্যা করতে?"

ইমাম বললেন, "আব্দুল্লাহকে হত্যা করা হবে তখন, যখন আমি প্রচণ্ড পিপাসার্ত হয়ে ফিরে আসবো তাঁবুতে এবং পানি অথবা মধু চাইতে, কিন্তু কিছুই পাওয়া যাবে না। তখন আমি অনুরোধ করবো আমার সন্তানকে আমার কাছে আনার জন্য যেন আমি তার ঠোঁটে চুমু দিতে পারি (এবং এর মাধ্যমে স্বস্তিপাই)। সন্তানকে আনা হবে এবং আমার হাতে দেয়া হবে এবং একজন (শত্রুদের মাঝ থেকে) জঘন্য ব্যক্তি একটি তীর ছুঁড়বে তার গলায় এবং বাচ্চাটি চিৎকার করে উঠবে। তখন তার রক্ত আমার দুহাতে ভরে যাবে এবং আমি আমার হাত দুটো আকাশের দিকে তুলে বলবো: হে আল্লাহ, আমি সহ্য করছি এবং হিসাব নিকাশ আপনার কাছে ছেড়ে দিচ্ছি। তখন শত্রুদের বর্শা আমার দিকে দ্রুত ছুঁড়ে দেয়া হবে এবং তাঁবুর পেছনে খোড়া গর্তের ভিতর আগুন গর্জন করতে থাকবে। এরপর আমি তাদেরকে আক্রমণ করবো। সে সময়টি হবে আমার জীবনের সবচেয়ে তিক্ত সময়। এরপর আল্লাহ যা চান তা- ই ঘটবে।"

এ কথা বলে ইমাম কাঁদতে লাগলেন এবং আমরাও অশ্রু নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। আল্লাহর রাসূল (সা.) এর সন্তানের তাঁবু থেকে কান্নার রোল উঠলো।

আবু হামযা সুমালি থেকে কুতুবুদ্দীন রাওয়ানদি বর্ণনা করেন যে, ইমাম আলী আল যায়নুল আবেদীন (আ.) বলেছেন যে: আমি আমার বাবার (ইমাম হোসেইনের) সাথে ছিলাম তার শাহাদাতের আগের রাতে। তখন তিনি তার সাথীদের সম্বোধন করে বললেন: "এ রাতকে তোমাদের জন্য বর্ম মনে করো কারণ এ লোকগুলো আমাকে চায় এবং আমাকে হত্যা করার পর তারা তোমাদের দিকে ফিরবে না, এখন তোমাদেরকে ক্ষমা করা হচ্ছে এবং (এখনও) তোমরা সক্ষম।"

তারা বললো, "আল্লাহর শপথ, তা কখনোই ঘটবে না।" ইমাম বললেন, "আগামীকাল তোমাদের সবাইকে হত্যা করা হবে এবং কাউকে রেহাই দেয়া হবে না।" তারা বললো, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন আপনার সাথে শহীদ হওয়ার জন্য।" তখন ইমাম তাদের জন্য দোআ করলেন এবং তাদের মাথা তুলতে বললেন। তারা তাই করলেন এবং বেহেশতে তাদের মর্যাদা দেখতে পেলেন এবং ইমাম তাদের প্রত্যেককে সেখানে তাদের স্থান দেখালেন। এর ফলে প্রত্যেকে তাদের চেহারা ও বুক তরবারির দিকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন।

শেইখ সাদুক্বের 'আমালি' গ্রন্থে ইমাম জাফর সাদিক্ব (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন যে: সাথীদের সাথে ইমামের আলোচনার পর তিনি আদেশ দিলেন তার সেনাদলের চারদিকে একটি গর্ত খোঁড়ার জন্য। গর্ত খোঁড়া হলো এবং তা জ্বালানী কাঠ দিয়ে পূর্ণ করা হলো। এরপর ইমাম তার ছেলে আলী আকবার (আ.) কে পানি আনতে যেতে বললেন ত্রিশ জন ঘোড়সওয়ার ও বিশ জন পদাতিক সৈন্যসহ। তারা বেশ ভীতির ভিতর ছিলেন এবং ইমাম নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করতে লাগলেন,

"হে সময়, বন্ধু হিসেবে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত, প্রভাত হওয়ার সময় ও সূর্যাস্তের সময়, কত সাথী অথবা সন্ধানকারী লাশে পরিণত হবে, সময় এর পরিবর্তে অন্য কাউকে নিয়ে সন্তুষ্ট হবে

না, বিষয়টি ফায়সালার ভার থাকবে সর্বশক্তিমানের কাছে এবং প্রত্যেক জীবিত প্রাণীকে আমার পথে ভ্রমণ করতে হবে।”

এরপর তিনি তার সাথীদের আদেশ করলেন, “পানি পান করো, যা এ পৃথিবীতে তোমাদের শেষ রিযক্ব এবং অযু করো এবং গোসল করে নাও। তোমাদের জামা কাপড়গুলো ধুয়ে নাও, কারণ সেগুলো হবে তোমাদের কাফন।”

কিতাবুল ইরশাদ- এ বর্ণিত হয়েছে ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (আ.) বলেছেন যে, আমার বাবার শাহাদাতের আগের রাতে আমি জেগে ছিলাম এবং আমার ফুপু হযরত যায়নাব (আ.) আমার শুশ্রূষা করছিলেন। আমার বাবা তার তাঁবুতে একা ছিলেন এবং আবু যার গিফারীর দাস জন তার সাথে ছিলো এবং সে উনার তরবারি প্রস্তুত করছিলো ও মেরামত করছিলো। আমার বাবা এ কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন, “(হে) সময়, বন্ধু হিসেবে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত প্রভাত হওয়ার সময় এবং সূর্যাস্তের সময়, কত সাথী অথবা সন্ধানকারীই না লাশে পরিণত হবে, সময় এর বদলে অন্য কাউকে নিয়ে সন্তুষ্ট হবে না, বিষয়টির ফায়সালার ভার থাকবে সর্বশক্তিমানের কাছে এবং প্রত্যেক জীবিত প্রাণীকে আমার পথে ভ্রমণ করতে হবে।”

তিনি তা দুবার অথবা তিন বার বললেন এবং বুঝতে পারলাম তিনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন এবং আমি শোকার্ত হলাম কিন্তু নীরবে তা সহ্য করলাম এবং বুঝলাম যে আমাদের উপর দুরযোগ নেমে এসেছে। আমার ফুপু যায়নাব ও (আ.) তা শুনতে পেয়েছিলেন। অনুভূতি এবং দুশ্চিন্তা নারীদের বৈশিষ্ট্য, তাই তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। তিনি নিজের পোষাক ছিড়ে মাথার চাদর ছাড়া আমার বাবার দিকে দৌড়ে গেলেন এবং বললেন: আক্ষেপ এ মর্মান্তিক ঘটনার জন্য, আমার যেন মৃত্যু হয়ে যায়। আজ আমার মা ফাতিমা (আ.), আমার বাবা আলী (আ.) এবং আমার ভাই হাসান (আ.) আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। হে তাদের উত্তরাধিকারী, যারা বিদায় নিয়েছে, হে জীবিতদের আশা।

ইমাম তার বোনের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, “হে প্রিয় বোন, শয়তান যেন তোমার ধৈর্যকে কেড়ে না নেয়।”

তখন তিনি (যায়নাব) বললেন, "আক্ষেপ, তাহলে কি আপনি নৃশংসভাবে এবং অসহায়ভাবে নিহত হবেন? তা আমার হৃদয়কে আহত করছে এবং তা আমার জীবনের উপর অত্যন্ত কঠিন।"

এরপর তিনি তার চেহারায় আঘাত করতে শুরু করলেন, জামার কলার ছিঁড়ে ফেললেন এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তখন ইমাম উঠে দাঁড়ালেন এবং তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দিয়ে এবং বললেন, "হে প্রিয় বোন, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো এবং একমাত্র আল্লাহর কাছে সান্তনা চাও এবং জেনো যে পৃথিবীর ওপরে যারা আছে তারা সবাই মৃত্যুবরণ করবে এবং আকাশের বাসিন্দারাও ধ্বংস হয়ে যাবে শুধু আল্লাহর সূরত (সত্তা) ছাড়া। আল্লাহ যিনি তার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আবার তাদেরকে জীবিত করবেন এবং তারা সবাই তার কাছে ফেরত যাবে। আর আল্লাহ অদ্বিতীয়। আমার নানা আমার চাইতে উত্তম ছিলেন। আমার বাবা আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন এবং আমার মা আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। প্রত্যেক মুসলমানের ওপরে বাধ্যতামূলক যে সে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উদাহরণ অনুসরণ করবে।"

এরপর তিনি একই ধরনের কথাবার্তা দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, "হে প্রিয় বোন, আমি তোমাকে শপথের মাধ্যমে অনুরোধ করছি যখন আমি শহীদ হয়ে যাবো তখন নিজের (জামার) কলার ছিঁড়ো না, চেহারায় আঘাত করো না অথবা আমার জন্য বিলাপ করো না।"

এরপর তিনি হযরত যায়নাব (আ.) কে নিয়ে আসলেন এবং তাকে আমার কাছে বসালেন, তারপর নিজের সাথীদের কাছে গেলেন। এরপর তিনি তাদেরকে আদেশ দিলেন তাদের তাঁবুগুলোকে পরস্পরের কাছে বাঁধার জন্য এবং খুঁটিগুলো এক সাথে বাঁধার জন্য যেন তাদের দিকে তা বৃত্ত হয়ে দাঁড়ায় এবং তিন দিক থেকে শত্রুদের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়ার জন্য যেন তারা সামনের দিকেই শুধু তাদের মোকাবিলা করতে পারে। এরপর ইমাম তার তাঁবুতে ফেরত গেলেন এবং সারারাত আল্লাহর কাছে ইবাদত, দোআ এবং তওবায় কাটালেন এবং তার সাথীরাও তার অনুসরণ করলেন এবং দোআ করলেন।

বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের দোআর আওয়াজ মৌমাছিদের গুনগুনের মত শোনা যাচ্ছিলো। তারা রুকু ও সিজদায়, দাঁড়িয়ে ও বসে ইবাদতে ব্যস্তছিলেন। প্রচুর নামায এবং শ্রেষ্ঠ নৈতিকতা

ছিলো ইমাম হোসেইন (আ.) এর জন্য সাধারণ বিষয়। ইমাম ছিলেন সে রকম যেমন ইমাম মাহদী (আ.) যিয়ারতে নাহিয়াতে উল্লেখ করেছেন,

“পবিত্র কোরআন যিনি পৌঁছে দেন এবং উম্মতের যিনি অস্ত্র এবং যিনি আল্লাহর আনুগত্যের পথে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন শপথ ও ঐশী চুক্তি রক্ষাকারী আপনি সীমা অতিক্রমকারীদের পথকে ঘৃণা করতেন বিপদগ্রস্তদের প্রতি দানশীল যিনি রুকু ও সিজদাকে দীর্ঘ করতেন (আপনি) পৃথিবী থেকে বিরত ছিলেন আপনি এটিকে সব সবসময় দেখেছেন তার দৃষ্টিতে যাকে তা শীঘ্রই ছেড়ে যেতে হবে।”

মানাক্বিব গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, যখন সেহরীর সময় হলো তখন ইমাম হোসেইন (আ.) একটি বিছানায় শুলেন এবং তন্দ্রায় গেলেন। তারপর তিনি জেগে উঠলেন এবং বললেন, “তোমরা কি জানো আমি এখন স্বপ্নে কী দেখলাম?” লোকজন বললো, “হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান, কী দেখেছেন?” ইমাম বললেন, “আমি দেখলাম কিছু কুকুর আমাকে আক্রমণ করেছে এবং একটি সাদাকালো কুকুর তাদের মধ্য থেকে আমার প্রতি বেশী হিংস্রতা দেখাচ্ছে এবং আমি ধারণা করছি, যে আমাকে হত্যা করবে সে এ জাতির মধ্যে একজন কুষ্ঠরোগী হবে। এরপর আমি আমার নানা আল্লাহর রাসূল (সা.) কে দেখলাম তার কিছু সাথীর সাথে। তিনি আমাকে বললেন, ‘হে আমার প্রিয় সন্তান, তুমি মুহাম্মাদ (সা.) এর বংশের শহীদ, বেহেশতের অধিবাসীরা ও আকাশের ফেরেশতারা তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছে, আজ রাতে তুমি আমার সাথে ইফতার করবে। তাই তাড়াতাড়ি করো, আর দেরী করো না। এ ফেরেশতারা আকাশ থেকে এসেছে তোমার রক্ত সংগ্রহ করতে এবং একটি সবুজ বোতলে তা সংরক্ষণ করতে।’ নিশ্চয়ই আমি বুঝতে পারছি যে আমার শেষ অতি নিকটে এবং এখন সময় হয়েছে এ পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার এবং এতে কোন সন্দেহ নেই।”

আযদি থেকে তাবারি বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুল্লাহ বিন আল- আসিম থেকে, তিনি যাহহাক বিন আব্দুল্লাহ বিন মাশরিক্বি থেকে, যিনি বলেন যে: আশুরার (দশই মহররম) রাতে ইমাম হোসেইন (আ.) এবং তার সব সাথীরা সারা রাত নামায, তওবা, দোআ ও কান্নায় কাটালেন। তিনি বলেন

যে, একদল রক্ষী আমাদের পাশ দিয়ে গেল যখন ইমাম হোসেইন (আ.) কোরআন এর এ আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন, "যারা অবিশ্বাস করে তারা যেন মনে না করে যে আমরা তাদের যে সময় দিচ্ছি তা তাদের জন্য ভালো, আমরা তাদের সময় দিচ্ছি শুধু এজন্যে যেন তারা গুনাহতে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি। আল্লাহ বিশ্বাসীদের সে অবস্থায় ফেলে রাখবেন না যে অবস্থায় তোমরা আছো, যতক্ষণ পর্যন্তনা ভালোর কাছ থেকে খারাপকে আলাদা করবেন।"

যখন প্রহরীদের মধ্যে একজন অশ্বারোহী এ আয়াত শুনলো সে বললো, "কা'বার রবের শপথ, নিশ্চয়ই আমরা (আয়াতে উল্লেখিত) ভালো দল যাদেরকে তোমাদের কাছ থেকে আলাদা করা হয়েছে।"

যাহহাক বলেন যে, আমি লোকটিকে চিনতে পারলাম এবং তখন বুরাইর বিন খুযাইরকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি তাকে চিনেছেন কিনা। তিনি উত্তরে 'না' বললেন। আমি বললাম, সে আবু হারব সাবী'ই আব্দুল্লাহ বিন শাহর। সে বিদ্রূপকারী, একজন সীমালঙ্ঘনকারী, যদিও ভালো বংশের লোক, সাহসী ও খুনী। সাঈদ বিন ক্বায়েস তাকে তার কোন অপরাধের কারণে গ্রেফতার করেছিলো। বুরাইর বিন খুযাইর তার দিকে ফিরলেন এবং বললেন, "হে বদমাশ, (তুমি কি মনে করো) আল্লাহ তোমাকে ভালোদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন?" সে জিজ্ঞেস করলো তিনি কে, এতে বুরাইর তার পরিচয় দিলেন। সে বললো, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন, হে বুরাইর আমি তাহলে ধ্বংস হয়ে গেলাম?" বুরাইর বললেন, "তুমি কি তোমার বড় গুনাহর জন্য তওবা করছো? আল্লাহর শপথ, আমরা সবাই ভালোর দল, আর তোমরা সবাই খারাপ দল।" সে বললো, "আমিও তোমার কথার সত্যতার সাক্ষী দিচ্ছি।" যাহহাক বলেন, তখন আমি তাকে বললাম, "তাহলে কি বুদ্ধিমত্তা তোমার কল্যাণে আসবে না?" সে বললো, "আমি তোমার জন্য কোরবান হই, (যদি আমি তা করি) তাহলে কে ইয়াযীদ বিন আযরাহ আনযীর সাথে থাকবে যে বর্তমানে আমার সাথে আছে।" এ কথা শুনে বুরাইর বললেন, "আল্লাহ তোমার অভিমত ও তোমার নীতি নষ্ট করুন, কারণ নিশ্চয়ই তমুি সব কিছুতে ব্যর্থ এক ব্যক্তি।" যাহহাক্ বলেন

যে, তখন আবু হারব ফেরত গেলো এবং সেই রাতে আমাদের প্রহরী ছিলেন আযরাহ বিন ক্বায়েস আহমাসি, যিনি অশ্বরোহীদলের অধিনায়ক ছিলেন।

সাইয়্যেদ ইবনে তাউস বলেন যে, সে রাতে উমর বিন সা'আদের দল থেকে বাইশ জন ইমাম হোসেইন (আ.) এর সাথীদের সাথে যোগ দিয়েছিলো।

'ইক্বদুল ফারীদ'- এ বর্ণিত হয়েছে যে উমর বিন সা'আদের কাছে ইমাম হোসেইন (আ.) এর তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণের অনুরোধের কথা শুনে উমর বিন সা'আদের পক্ষের বত্রিশজন কুফাবাসী তাকে বললো, "আল্লাহর রাসূলের সন্তান তোমাকে তিনটি প্রস্তাবের একটি গ্রহণ করতে বলছেন, আর তুমি এতে একমত হচ্ছো না।" এ কথা বলে তারা তাদের দল ত্যাগ করে ইমামের কাছে চলে এলো এবং তার পাশে থেকে যুদ্ধ করলো যতক্ষণ না তারা সকালে শহীদ হয়ে '

(শেখ আব্বাস কোমী প্রণীত নাফাসুল মাহমুম গ্রন্থ থেকে সংকলিত)

ইমাম হোসেইন (আ.) এর শাহাদাত

আমাদের অভিভাবক ইমাম হোসেইন (আ.) এর শাহাদাত এবং দুধের শিশুর এবং আব্দুল্লাহ বিন হাসান (আ.) এর শাহাদাত

এ অধ্যায়টি অশ্রু প্রবাহিত করে এবং বিশ্বাসীদের হৃদয়কে এবং কলিজাকে পুড়ে ফেলে, (অত্যাচারের বিরুদ্ধে) অভিযোগ আল্লাহর কাছে এবং শুধু তারই সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। শাহাদত সম্পর্কে লেখা কিছু সংখ্যক বইয়ে বর্ণিত আছে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.) দেখলেন তার বন্ধু ও আত্মীয়দের মধ্যে বাহাত্তরজন শহীদ হয়ে গেছেন তখন তিনি তার পরিবারের তাঁবুর দিকে ফিরে উচ্চকণ্ঠে বললেন, "হে সাকিনা, হে ফাতিমা, হে উম্মে কুলসুম, আমার সালাম সবার ওপরে।" তা শুনে সাকিনা বললেন, "কিভাবে সে ব্যক্তি মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিতে না পারে যার বন্ধুরা ও সাহায্যকারীরা ইতোমধ্যে শাহাদাত বরণ করেছে।" সাকিনা বললেন, "আব্বাজান, তাহলে আমাদেরকে দাদার আশ্রয়ে ফেরত নিয়ে আসুন।" ইমাম বললেন, "হায়, যদি মরুভূমির পাখিকে রাতে মুক্ত করে দেয়া হয় সে শান্তিতে ঘুমাবে।" তা শুনে তার পরিবারের নারী সদস্যরা কাঁদতে শুরু করলেন এবং ইমাম হোসেইন (আ.) তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম হোসেইন (আ.) তখন উম্মে কুলসুম (আ.) এর দিকে ফিরলেন এবং বললেন, "আমি তোমাকে তোমার বিষয়ে কল্যাণের আদেশ দেই। আমি রওনা করছি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এ শত্রুদের মাঝে।"

তা শুনে সাকিনা কাঁদতে লাগলেন। ইমাম তাকে খুব বেশী ভালোবাসতেন। তিনি তাকে তার বুকের সাথে চেপে ধরলেন এবং তার অশ্রুমুছে দিয়ে বললেন, "জেনে রাখো আমার প্রিয় সাকিনা, খুব শীঘ্রই তুমি আমার জন্যে আমার পরে কাঁদবে, যখন মৃত্যু আমাকে ঘেরাও করে ফেলবে। তাই এখন তোমার অশ্রুদিয়ে আমার বুককে ভারী করে দিও না যতক্ষণ আমার দেহতে

রুহ আছে। যখন আমি শহীদ হয়ে যাবো তখন তুমি আমার জন্য কান্নাকাটি করার জন্য অধিকতর যোগ্য, হে নারীদের মধ্যে শ্রেয়তম।"

ইমাম বাক্বির (আ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, "যখন ইমাম হোসেইন (আ.) সিদ্ধান্ত নিলেন শহীদ হবেন তিনি তার সবচেয়ে বড় কন্যা ফাতিমা (আ.) কে ডাকলেন। তিনি তাকে একটি মুখবন্ধ খাম দিলেন এবং একটি খোলা অসিয়ত দিলেন। ইমাম আলী বিন হোসেইন (যায়নুল আবেদীন) (আ.) সে সময় অসুস্থ ছিলেন, পরে ফাতিমা চিঠিটি ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (আ.) কে দিয়েছিলেন এবং তার কাছ থেকে তা আমাদের কাছে এসেছে।"

মাসউদীর 'ইসবাত আল ওয়াসিয়্যাহ'- তে বর্ণিত আছে যে, ইমাম হোসেইন (আ.) ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (আ.) কে অসুস্থ অবস্থাতে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে (আল্লাহর) সম্মানিত নামগুলো এবং নবীদের নিদর্শনগুলো দিলেন। তিনি তাকে বললেন যে, তিনি (ঐশী) প্রজ্ঞা, নথিপত্র, বইগুলো এবং অস্ত্রশস্ত্র উম্মু সালামা (আ.) এর কাছে দিয়েছেন এবং তাকে পরামর্শ দিয়েছেন তা তার কাছে হস্তান্তর করার জন্য।

একই গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইমাম জাওয়াদ (আ.) এর কন্যা এবং ইমাম হাদী (আ.) এর বোন খাদিজা বলেছেন যে, যতটুকু জানা যায় ইমাম হোসেইন (আ.) তার বোন সাইয়্যেদা যায়নাব (আ.) কে অসিয়ত করে যান যাতে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) এর ইমামতের দিনগুলোতে মুহাম্মাদ (সা.) এর পরিবারের জ্ঞান তার (যায়নাব) মাধ্যমে ছড়িয়ে যায় এবং ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) কে শত্রুদের কাছ থেকে গোপন রাখা যায়।

যে শিশু তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছিলো এবং শহীদ হয়েছিলো তা উল্লেখ করার পর 'বিহারুল আনওয়ার'- এ আছে, ইমাম হোসেইন (আ.) ডান দিকে ফিরলেন এবং কাউকে দেখলেন না, এরপর তিনি বাম দিকে ফিরলেন এবং কাউকে দেখলেন না। ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) বেরিয়ে এলেন যার একটি তরবারি তোলার ক্ষমতা ছিলো না (অসুস্থতার কারণে)। উম্মে কুলসুম (আ.) (যায়নাব (আ.) এর বোন) তার অনুসরণ করলেন এবং ডাক দিলেন, "হে প্রিয় সন্তান, ফিরে আসো।" তিনি বললেন, "প্রিয় ফুপু, আমাকে ছেড়ে দিন যেন আমি আল্লাহর রাসূল (সা.) এর

সন্তানের জন্য জিহাদ করতে পারি।” ইমাম হোসেইন (আ.) তাকে দেখলেন এবং বললেন, “হে উম্মে কুলসুম, তাকে থামাও, পাছে এ পৃথিবী থেকে মুহাম্মাদ (সা.) এর বংশ লোপ পেয়ে যায়।”

দুধের শিশু আবদুল্লাহ আলী আল আসগার- এর শাহাদাত

তার মা ছিলেন রুবাব, যিনি ছিলেন ইমরুল ক্বায়েস বিন আদির কন্যা এবং তার মা ছিলেন হিন্দ আল হানূদ। সাইয়্যেদ ইবনে তাউস বলেন, যখন ইমাম হোসেইন (আ.) তার যুবকদের ও বন্ধুদের লাশ দেখতে পেলেন তিনি শহীদ হওয়ার জন্য দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে বললেন, “কেউ কি আছে আল্লাহর রাসূলের পরিবারকে রক্ষা করবে? তওহীদবাদী কেউ কি আছে যে আল্লাহকে ভয় করবে আমাদের বিষয়ে? কোন সাহায্যকারী কি আছে যে আল্লাহর জন্য আমাদেরকে সাহায্য করতে আসবে? কেউ কি আছে যে আমাদের সাহায্যে দ্রুত আসবে আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের বিনিময়ে?”

নারীদের কান্নার আওয়াজ উঁচু হলো এবং ইমাম তাঁবুর দরজায় এলেন এবং যায়নাব (আ.) কে ডাকলেন, “আমাকে আমার দুধের শিশুটিকে দাও যেন বিদায় নিতে পারি।” এরপর তিনি তাকে দুহাতে নিলেন এবং উপুড় হলেন তার ঠোঁটে চুমু দেয়ার জন্য। হুরমালা বিন কাহিল আসাদি শিশুটির দিকে একটি তীর ছুঁড়লো, যা তার গলা ভেদ করে তার মাথা আলাদা করে ফেললো (আল্লাহর রহমত ও রবকত তার উপর বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক তার হত্যাকারীর উপর)। এক কবি এ বিষয়ে বলেছেন, “এবং সে ব্যক্তি যে নিচু হয়েছিলো তার বাচ্চাকে চুমু দেয়ার জন্য কিন্তু তার আগেই তীর তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায় তার ঘাড়ে চুমু দেয়ার জন্য।”

এরপর তিনি যায়নাব (আ.) কে উচ্চ কণ্ঠে ডাকলেন তাকে ফেরত নেয়ার জন্য। তিনি শিশুর রক্ত তার হাতের তালুতে নিলেন এবং আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, “প্রত্যেক কষ্টই আমার জন্য সহজ যখন আল্লাহ তা দেখছেন।”

দুধের শিশুটি সম্পর্কে শেইখ মুফীদ বলেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.) তাঁবুর সামনে বসলেন এবং শিশু আব্দুল্লাহকে তার কাছে আনা হলো। বনি আসাদের এক লোক তাকে হত্যা করলো তীর ছুঁড়ে।

আযদি বলেন যে, আকাবাহ বিন বাশীর আসাদি ইমাম মুহাম্মাদ আল বাক্বির (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আমাকে বলেছেন, "হে বনি আসাদ, আমাদের রক্তের একটি দায় ভার তোমাদের উপর আছে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হে আবা জাফর, কোন গুনাহতে আমার অংশ রয়েছে এবং কোন সে রক্ত?"

ইমাম বললেন, "একটি শিশুকে আনা হয়েছিলো ইমাম হোসেইন (আ.) এর কাছে যিনি তাকে তার কোলে ধরলেন, তোমাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি, বনি আসাদের, তার দিকে একটি তীর ছোঁড়ে এবং তার মাথা আলাদা করে ফেলে। ইমাম তার রক্ত জমা করলেন এবং যখন তার দুহাতের তালু রক্তে পূর্ণ হলো তিনি তা যমীনে ছিটিয়ে দিলেন এবং বললেন: সর্বশক্তিমান আল্লাহ, যদি আপনি আকাশ থেকে সাহায্য বন্ধ করে দিয়ে থাকেন তাহলে আমাদের উপর তা দান করুন যা এর চেয়ে ভালো এবং এই দুষ্কৃতিকারীদের উপর আমাদের হয়ে প্রতিশোধ নিন।"

সিবতে ইবনে জওযি তার 'তাযকিরাহ'- তে হিশাম বিন মুহাম্মাদ কালবি থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন ইমাম হোসেইন (আ.) দেখলেন তারা তাকে হত্যা করবেই, তিনি কোরআন আনলেন এবং তা খুলে মাথার উপর রাখলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে বললেন, "আল কোরআন এবং আমার নানা, আল্লাহর রাসূল (সা.) হলেন আমার ও তোমাদের মধ্যে বিচারক। হে জনতা, কিভাবে তোমরা আমার রক্ত ঝরানোকে বৈধ মনে করছো? আমি কি তোমাদের নবীর নাতি নই? আমার নানা থেকে কি হাদীস পৌঁছায়নি তোমাদের কাছে আমার ও আমার ভাই সম্পর্কে যে আমরা জান্নাতের যুবকদের সর্দার? তাহলে জিজ্ঞেস করো জাবির (বিন আব্দুল্লাহ আনসারি)- কে, যায়েদ বিন আরকামকে এবং আবু সাঈদ খুদরীকে, জাফর তাইয়ার কি আমার চাচা নন?"

শিমর উত্তর দিলো, “খুব শীঘ্রই তুমি জ্বলন্ত আগুনের (জাহান্নামের) দিকে দ্রুত যাবে।” (আউযুবিল্লাহ)। ইমাম বললেন, “আল্লাহু আকবার, আমার নানা আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি দেখেছেন একটি কুকুর তার গলা পূর্ণ করছে তার আহলুল বাইত (আ.) এর রক্ত দিয়ে এবং আমি বুঝতে পারছি সেটি তুমি ছাড়া কেউ নয়।”

শিমর বললো, “আমি শুধু জিহ্বা দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবো, যদি আমি বুঝি তুমি কী বলছো।” ইমাম হোসেইন (আ.) ফিরে দেখলেন তার শিশুপুত্র পিপাসায় কাঁদছে। তিনি তাকে কোলে নিলেন এবং বললেন, “হে জনতা, যদি তোমরা আমার প্রতি দয়া না দেখাও, কমপক্ষে এ বাচ্চার উপর দয়া করো।” এক ব্যক্তি একটি তীর ছুঁড়লো যা তার গলা বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। ইমাম কেঁদে বললেন, “হে আল্লাহ, আপনি বিচারক হোন আমাদের মাঝে ও তাদের মাঝে, যারা আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং এর বদলে আমাদের হত্যা করেছে।” একটি কণ্ঠ আকাশ থেকে ভেসে এলো, “তাকে ছেড়ে দাও হে হোসেইন, কারণ এক সেবিকা তাকে শুশ্রূষা করার জন্য বেহেশতে অপেক্ষা করছে।” এরপর হাসীন বিন তামীম একটি তীর ছোঁড়ে তার ঠোঁটের দিকে এবং তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে।

ইমাম কাঁদলেন এবং বললেন, “হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে অভিযোগ করি, তারা যেভাবে আমার সাথে, আমার ভাই, আমার সন্তানদের এবং আমার পরিবারের সাথে আচরণ করেছে।”

ইবনে নিমা বলেন যে, তিনি বাচ্চাটিকে তুললেন এবং তার পরিবারের শহীদদের সাথে রাখলেন। মুহাম্মাদ বিন তালহা তার গ্রন্থ ‘মাতালিবুস স’উল’- এ ‘ফুতূহ’ নামের গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.) এর একটি শিশু পুত্র ছিলো, তার দিকে একটি তীর ছোঁড়া হয় যা তাকে হত্যা করে এবং এরপর ইমাম তার তরবারি দিয়ে একটি কবর খোরেন তার জন্য এবং তার জন্য দোআ করে তাকে দাফন করেন।

‘ইহতিজাজ’- এ উল্লেখ আছে যে যখন ইমাম হোসেইন (আ.) একা হয়ে গেলেন এবং তার সাথে তার সন্তান আলী যায়নুল আবেদীন (আ.) এবং দুধের শিশু আব্দুল্লাহ ছাড়া কেউ ছিলো না, তিনি বাচ্চাটিকে তুলে ধরলেন বিদায় জানানোর জন্য, তখন একটি তীর এলো এবং তার গলা ভেদ

করে তাকে হত্যা করলো। ইমাম ঘোড়া থেকে নামলেন এবং তার তরবারির খাপ দিয়ে একটি কবর খুঁড়লেন এবং এরপর রক্তে ভেজা বাচ্চাকে বালির নিচে দাফন করলেন। এরপর তিনি তার জায়গা থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং শোকগাঁথা আবৃত্তি করলেন। শাহাদাতের লেখকরা এবং ইহতিজাজের লেখকও বলেন যে, ইমাম এরপর তার ঘোড়ায় চড়লেন এবং যুদ্ধের জন্য এগিয়ে গেলেন এই বলে, "এ জাতি অবিশ্বাস করেছে এবং তারা রাব্বুল আলামীনের পুরস্কার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, এ জাতি হত্যা করেছে আলীকে এবং তার সন্তান হাসানকে, যিনি ছিলেন উত্তম এবং সম্মানিত পিতা- মাতার সন্তান। তারা ঘৃণা ও বিদ্বেষে পূর্ণ ছিলো এবং তারা জনতাকে ডাক দিয়েছে এবং জমা হয়েছে হোসেইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। অভিশাপ এ নীচ জাতির উপর যারা বিভিন্নদলকে একত্র করেছে 'দুই পবিত্র আশ্রয়স্থানের' লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। এভাবে মুশরিকদের বংশধর উবায়দুল্লাহর জন্য তারা যাত্রা করেছে এবং মুরতাদদের আনুগত্য করার জন্য অন্যদেরকে আহ্বান করেছে আল্লাহর বিরোধিতা করে আমার রক্ত ঝরানোর জন্য, এবং সা'আদের সন্তান আমাকে হত্যা করেছে আক্রমণাত্মকভাবে এক সেনাবাহিনীর সাহায্যে যা প্রবল প্লাবনের মত এবং এ সব আমার কোন অপরাধের প্রতিশোধের জন্য নয়, শুধু এ কারণে যে, আমার গর্ব হচ্ছে দুই নক্ষত্র, আলী যিনি ছিলেন নবীর পরে শ্রেষ্ঠ এবং নবী ছিলেন কুরাইশ পিতা- মাতার সন্তান, আমার বাবা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আমি দুজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান, রূপার মত যা বেরিয়ে এসেছে স্বর্ণ থেকে, আমি হচ্ছি রূপা, দুই স্বর্ণালীর সন্তান, আর কারো নানা কি আমার নানার মত, অথবা তাদের পিতা আমার পিতার মত, এরপর আমি দুজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুত্র সন্তান, আমার মা ফাতিমাতুয যাহরা এবং বাবা যিনি মুশরিকদের পিঠ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন বদর ও হুনাইনের যুদ্ধে এবং যিনি শৈশবকাল থেকেই রবের ইবাদত করেছেন যখন কুরাইশরা ইবাদত করতো একসাথে দুই মূর্তির, লাত ও উযযার, তখন আমার বাবা নামায পড়েছেন দুই কিবলার দিকে ফিরে। আর আমার বাবা হলেন সূর্য এবং আমার মা চাঁদ, আর আমি এক নক্ষত্র, দুই চাঁদের সন্তান এবং তিনি (আলী) উহুদের দিনে এমন মোজেযা দেখিয়েছেন সেনাবাহিনীকে দুভাগ করে দেয়ার মাধ্যমে, যা হিংসা দুর করেছিলো এবং আহযাবে (এর যুদ্ধে) ও

মক্কা বিজয়ে। যেদিন দুই সেনাবাহিনীতে একটি কথাই ছিলো - মৃত্যু এবং এ সবই আল্লাহর রাস্তায় করা হয়েছিলো, কিন্তু কিভাবে এই নীচ জাতি এ দুই সন্তানের সাথে আচরণ করেছে - যারা সৎকর্মশীল নবী ও আলীর সন্তান, দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধের দিনে যারা লাল গোলাপের মত।"

এরপর তিনি তার তরবারি খাপমুক্ত করে, জীবনের মায়া পরিত্যাগ করে এবং হৃদয়ে মৃত্যুর দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে সেনা বাহিনীর দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। তিনি বলছিলেন, "আমি আলীর সন্তান, যিনি ছিলেন পবিত্র ও হাশিমের বংশধর এবং এ মর্যাদা আমার জন্য যথেষ্ট যখন আমি গর্ব করি, আমার নানা আল্লাহর রাসূল সবার চেয়ে সম্মানিত। আমরা সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর বাতি এবং আমার মা ফাতিমা যাহরা (আ.), যিনি আহমাদ (সা.) এর কন্যা এবং আমার চাচা যিনি দুপাখার অধিকারী বলে পরিচিত এবং আমাদের মাঝে আছে আল্লাহর কিতাব এবং তা সত্যসহ নাযিল হয়েছে এবং আমাদের মধ্যেই আছে বৈধতা এবং কল্যাণপূর্ণ ওহী এবং আমরা হলাম সব মানুষের মধ্যে আল্লাহর আমানত এবং আমরা গোপনে ও প্রকাশ্যে ঘোষণা করি যে কাউসারের উপর আমরা কর্তৃত্ব রাখি এবং আমরা আমাদের অনুসারীদের পান করাবো নবীর পেয়ালা দিয়ে, যা অস্বীকার করা যায় না এবং আমাদের অনুসারীরা হলো অনুসারীদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং যারা আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে কিয়ামতের দিন তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।"

মুহাম্মাদ বিন আবু তালিব বলেন আবু আলী সালামি তার ইতিহাসে বর্ণনা করেছেন যে, এ শোকগাঁথাটি ইমাম হোসেইন (আ.) এর নিজের সৃষ্টি এবং এর মত কোন শোকগাঁথা নেই:

"যদিও এ পৃথিবীকে প্রিতীকর মনে করা হয়, আল্লাহর পুরস্কার হচ্ছে সুমহান ও বিশেষ বৈশিষ্টের অধিকারী এবং যদি দেহকে তৈরী করা হয়ে থাকে মৃত্যুর জন্য তাহলে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া মানুষের জন্য সবচেয়ে ভালো এবং যদি রিযক্ব বিতরণ করা হয় ও নিশ্চয়তা থাকে তাহলে মানুষের উচিত না তা অর্জনের জন্য কঠিন চেষ্টা করা এবং যদি এ সম্পদ জমা করার ফলাফল হয় তা পেছনে ফেলে যাওয়া তাহলে কেন মানুষ লোভী হবে?"

এরপর তিনি সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন এবং যে- ই কাছে এলো তৎক্ষনাৎ নিহত হলো এবং লাশের স্তুপ জমা হলো। এরপর তিনি সেনাবাহিনীর ডান অংশকে আক্রমণ করলেন এবং বললেন, "অপমান হওয়ার মৃত্যু চাইতে উত্তম এবং অপমান জাহান্নামের আগুনে প্রবেশের চাইতে উত্তম।"

এরপর তিনি সেনাবাহিনীর বাম অংশকে আক্রমণ করলেন এবং বললেন, "আমি হোসেইন, আলীর সন্তান, আমি শপথ করেছি যে শত্রুদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবো না এবং আমার বাবার পরিবারকে রক্ষা করবো, যতক্ষণ না আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ধর্মের উপর নিহত হই।"

কিছু বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর শপথ, আমি তার মত কোন বীর দেখিনি, যিনি তার সন্তান, পরিবার ও বন্ধুদের হারিয়েছেন। যোদ্ধারা তার ওপরে প্রথমে আক্রমণ চালালো এবং তিনিও তাদের আক্রমণের সমান জবাব দিলেন এবং তিনি তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন যেভাবে নেকড়ে ভেড়ার সাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং তাদের তিনি বিতাড়িত করলেন এবং পঙ্গপালের মত ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। তিনি অস্ত্রে সুসজ্জিত ত্রিশ হাজার সৈন্যের বাহিনীকে আক্রমণ করলেন এবং তারা তার সামনে পঙ্গপালের মত ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। এরপর তিনি তার জায়গায় ফেরত এলেন এবং বললেন, "কোন ক্ষমতা নেই ও কোন শক্তি নেই শুধু আল্লাহর কাছে ছাড়া যিনি সুউচ্চ মহান।"

'ইসবাত আল ওয়াসিয়াহ'তে বর্ণিত আছে যে তিনি নিজ হাতে আঠারোশ যোদ্ধাকে হত্যা করেন।

'বিহারুল আনওয়ার'- এ আছে যে, ইবনে শাহরাশুব এবং মুহাম্মাদ বিন আবি তালিব বলেছেন যে, তিনি অবিরাম আক্রমণ করলেন যতক্ষণ না তিনি উনিশশত পঞ্চাশ ব্যক্তিকে হত্যা করলেন, আহতদের সংখ্যা ছাড়াই। উমর বিন সা'আদ সেনাবাহিনীকে উচ্চ কণ্ঠে বললো, "আক্ষেপ তোমাদের জন্য, তোমরা জানো তোমরা কার সাথে যুদ্ধ করছো? সে হলো ভুড়িওয়ালার সন্তান (এখানে সে ইমাম আলী (আ.) কে বিদ্রুপ করতে চেয়েছে, আউযুবিল্লাহ) সে

হচ্ছে আবরদের ঘাতকের সন্তান। তাকে সব দিক থেকে আক্রমণ করো।" চার হাজার তীরন্দাজ তাকে ঘেরাও করে ফেললো এবং তাঁবুর দিকে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিলো।

মুহাম্মাদ বিন আবি তালিব, ইবনে শাহরাশুব এবং সাইয়্যেদ ইবনে তাউস বলেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.) তখন বললেন, "দুর্ভোগ তোমাদের উপর হে আবু সুফিয়ানের পরিবারের অনুসারীরা, যদি তোমরা অধার্মিক লোক হও এবং কিয়ামতের দিনটিকে ভয় না পাও তাহলে কমপক্ষে স্বাধীন চিন্তার লোক হও এবং বুঝতে চেষ্টা করো যদি তোমরা আরবদের বংশধর হও।"

শিমর বললো, "হে ফাতিমার সন্তান, তুমি কী বুঝাতে চাও?"

ইমাম বললেন, "আমি বলছি যে আমরা পরস্পর যুদ্ধ করবো কিন্তু নারীরা তো কোন ভুল করে নি। আমার পরিবারের তাঁবু লুট করা থেকে বিরত থাকো যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি।"

শিমর বললো, "নিশ্চয়ই তোমার অধিকার আছে।" তখন সে উচ্চ কণ্ঠে ডাকলো, "তাঁবুগুলো থেকে ফেরত আসো এবং তাকে তোমাদের লক্ষ্যে পরিণত করো এবং সে দয়ালু সমকক্ষ।" তখন পুরো সেনাবাহিনী তার দিকে ফিরলো এবং ইমাম হোসেইন (আ.) পানি পান করতে চাইলেন। যখনই তিনি ফোরাত নদীর দিকে যেতে চাইলেন, সেনাবাহিনী তাকে আক্রমণ করলো এবং নদী থেকে ফিরিয়ে দিলো।

ইবনে শাহরাশুব বলেন জালুদি থেকে আবু মাখনাফ বর্ণনা করেছে যে, ইমাম হোসেইন (আ.) আক্রমণ করেন আ'ওয়ার সালামি ও আমর বিন হাজ্জাজ যুবাইদিকে যারা চার হাজার সৈন্যসহ ফোরাত নদীর তীর পাহারা দেয়ার জন্য নিয়োজিত ছিলো। তখন তিনি তার ঘোড়াকে নদীতে প্রবেশ করালেন এবং যখন ঘোড়া তার মুখ পানিতে রাখলো পান করার জন্য ইমাম বললেন, "হে আমার ঘোড়া, তুমি তৃষ্ণার্ত এবং আমিও এবং যতক্ষণ না তুমি পান করো আমি আমার তৃষ্ণা মিটাবোনা।" যখন ঘোড়াটি ইমামের এ কথাগুলি শুনলো সে তার মাথা তুলে ফেললো এবং পানি খেলো না, যেন সে বুঝতে পেরেছে ইমাম কী বলেছেন। ইমাম বললেন, "আমি পান করবো এবং তুমিও পান করো।" তিনি তার হাত লম্বা করে দিলেন এবং হাতের তালু পানিতে পূর্ণ করলেন। তখন সেনাবাহিনীর এক ব্যক্তি চিৎকার করে বললো, "হে আবা আব্দিল্লাহ, তুমি শান্তিতে পানি

পান করছো অথচ তোমার তাঁবুগুলো লুট করা হচ্ছে?" তা শুনে ইমাম পানি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং আক্রমণ করলেন। তিনি শত্রুবাহিনীকে দুভাগ করে এগিয়ে দেখতে পেলেন তার তাঁবুগুলি নিরাপদ আছে।

আল্লামা মাজলিসি তার 'জালাউল উয়ুন'- এ বলেছেন যে, আবারও তিনি তার পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং তাদেরকে সহনশীল হওয়ার আদেশ করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কার ও প্রতিদানের শপথ করলেন, এরপর বললেন, "তোমাদের চাদরগুলো পরো, পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও এবং জেনে রাখো আল্লাহ তোমাদের সাহায্য ও নিরাপত্তা দানকারী এবং তোমাদেরকে শত্রুদের খারাপ আচরণ থেকে মুক্তি দিবেন এবং তোমাদের উত্তম পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। তার ক্রোধ তোমাদের শত্রুদের ঢেকে ফেলবে বিভিন্ন দুর্যোগে এবং তিনি তোমাদের উপর বিশেষ বরকত ও আশ্চযজর্নক উপহার দিবেন এ পরীক্ষার পরে। অভিযোগ করো না, এমন কিছু বলো না যা তোমাদের মর্যাদা কমিয়ে দেয়।"

'বিহারুল আনওয়ার'- এ আছে যে আবুল ফারাজ বলেছেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.) নদীর দিকে গেলেন এবং শিমর বললো, "তুমি নদীর দিকে যাবে না, বরং তুমি আগুনের দিকে যাবে।" (আউযুবিল্লাহ)। এক ব্যক্তি উচ্চ কণ্ঠে বললো, "ও হোসেইন, তুমি কি দেখছো না মাছের পেটের মত ফোরাত নড়াচড়া করছে? আল্লাহর শপথ, তুমি অবশ্যই এর স্বাদ পাবে না যতক্ষণ না তৃষ্ণায় মারা যাও।" ইমাম বললেন, "ইয়া রব, তাকে তৃষ্ণার কারণে মৃত্যু দাও।" বর্ণনাকারী বলে যে (একই) ব্যক্তি বলতো, "আমাকে পান করার জন্য পানি দাও।" তাকে পানি দিলে সে তা থেকে পান করতো এবং বমি করে ফেলতো। আবারও সে বলতো, "আমাকে পান করার জন্য পানি দাও কারণ তৃষ্ণা আমাকে মেরে ফেলছে।" এ রকম চলতে থাকলো যতক্ষণ না সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো (আল্লাহর অভিশাপ তার উপর)।

আবু হাতূফ নামে এক ব্যক্তি একটি তীর ছোঁড়ে ইমাম হোসেইন (আ.) এর দিকে যা তার কপালে বিদ্ধ হয়। তিনি তা টেনে বের করলেন এবং রক্ত তার চেহারা ও দাড়ি ভিজিয়ে দিলো। তখন তিনি বললেন, "হে আমার রব, আপনি কি দেখছেন এ খারাপ লোকদের হাতে আমাকে কী সহ্য করতে

হচ্ছে? ইয়া রব, তাদের সংখ্যা কমিয়ে দিন এবং তাদের শেষটিকেও হত্যা করুন এবং তাদের একটিকেও পৃথিবীর উপর রেখেন না এবং তাদের ক্ষমা করবেন না।"

এরপর তিনি এক ভয়ঙ্কর সিংহের মত তাদের আক্রমণ করলেন এবং কেউ ছিলো না যে তার কাছে পৌঁছতে পারে, তিনি তাদের পেট কেটে হত্যা করলেন। তারা সব দিক থেকে তাকে তীর ছুঁড়তে লাগলো যেগুলোর আঘাত তিনি বুকে ও ঘাড়ে নিলেন এবং বললেন, "কত খারাপ আচরনই না তোমরা করলে মুহাম্মাদ (সা.) এর বংশধরদের সাথে তার মৃত্যুর পর। আমাকে হত্যা করার পর তোমরা আল্লাহর কোন বান্দাহকে হত্যা করতে আর ভয় পাবে না এবং আমাকে হত্যা করা তোমাদের কাছে তাদের হত্যাকে সহজ করে দিবে। আমি আল্লাহর কাছে আশা করি যে তিনি তোমাদের হাতে আমাকে অপমানের বদলে আমাকে শাহাদাত দান করবেন এবং এরপর আমার প্রতিশোধ নিবেন এমন মাধ্যমে যে তোমরা তা কখনো চিন্তাও করতে পারবেনা।"

এ কথাগুলো শুনে হাসীন বিন মালিক সাকনি বললো, "হে ফাতিমার সন্তান, কিভাবে আল্লাহ আমাদের উপর তোমার প্রতিশোধ নিবেন?" ইমাম বললেন, "তিনি তোমাদের যুদ্ধে ঢেকে ফেলবেন এবং তোমাদের রক্ত ঝরাবেন, এরপর এক ভয়ানক শাস্তিতোমাদের উপর আসবে।" এরপর তিনি যুদ্ধ করলেন যতক্ষণ না অনেক আঘাতে জর্জরিত হলেন। ইবনে শাহরাশুব ও সাইয়্যেদ ইবনে তাউস বলেন আঘাতের সংখ্যা ছিলো বাহাত্তর।

ইবনে শহর আশোব আবু মাখনাফ থেকে তিনি ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, "ইমাম হোসেইন (আ.) এর শরীরে বর্শার তেত্রিশটি আঘাত ও তরবারির চৌত্রিশটি আঘাত ছিলো।"

ইমাম মুহাম্মাদ আল বাক্বির (আ.) বলেন যে, "ইমাম হোসেইন (আ.) বর্শা, তরবারি ও তিনশ বিশটির বেশী তীর থেকে আঘাত পেয়েছিলেন।"

অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে আঘাতের সংখ্যা ছিলো তিনশ ষাটটি। অন্য আরেক বর্ণনা অনুযায়ী আঘাতের সংখ্যা ছিলো তিনশ তিনটি এবং এটিও বলা হয় যে তার আঘাতের

সংখ্যা এক হাজার তিনশতে পৌঁছে। তীর তার বর্ম ভেদ করে সজারুর কাটার মত এবং বর্ণনা করা হয় যে তার সব আঘাত ছিলো দেহের সামনের দিকে।

বর্ণিত আছে যে (অতিরিক্ত) যুদ্ধ ইমাম হোসেইন (আ.) কে ক্লান্তকরে ফেলে এবং তিনি বিশ্রাম নেয়ার জন্য খানিক ক্ষণের জন্য থামেন। সে সময় একটি পাথর তার কপালে ছোঁড়া হয় এবং তিনি তার জামার সামনের দিক উচু করলেন তা (রক্ত) মোছার জন্য। তখন একটি বিষ মাখানো তিন মাথার তীর তার বুক ভেদ করলো। কিছু বর্ণনায় আছে যে, তা তার হৃৎপিণ্ডভেদ করলো এবং তিনি বললেন, "আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর সাহায্যে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিশ্বাসের ওপরে।" এরপর তিনি তার মাথা আকাশের দিকে তুললেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ, তুমি জানো তারা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাকে হত্যা করতে যে ছাড়া পৃথিবীতে নবীর আর কোন সন্তান নেই।" এরপর তিনি তীরটি টেনে বের করলেন তার (বুক অথবা) পিঠ থেকে এবং রক্ত প্রবাহিত হলো ছোট্ট একটি নদীর মত। তিনি তা দিয়ে তার হাতের তালু ভরে ফেললেন এবং তা আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলেন এবং একটি ফোঁটাও তা থেকে মাটিতে ফিরে এলো না। এরপর তিনি তার অন্য হাতের তালু রক্তে ভরে ফেললেন এবং তা মাথায় ও দাড়িতে মাখলেন এবং বললেন, "আমি চাই আমার নানা আল্লাহর রাসূল (সা.) এর সাথে আমার রক্তে রঙ্গীন হয়ে মিলিত হতে এবং আমি বলবো, হে রাসূলুল্লাহ, অমুক অমুক ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছে।"

শেইখ মুফীদ ইমাম হোসেইন (আ.) এর ঘোড়ায় চড়া ও ফোরাত নদীর তীরের দিকে যাওয়া এবং তার ভাই আব্বাস (আ.) এর শাহাদাত বর্ণনা করার পর বলেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.) ফোরাত থেকে ফিরে তার তাঁবুর দিকে আসেন। শিমর বিন যিলজাওশান, তার কিছু সহযোগী নিয়ে তার কাছে এলো এবং তাকে সব দিক থেকে ঘেরাও করে ফেললো। মালিক বিন বিশর কিনদি নামে এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে ইমাম হোসেইন (আ.) কে গালাগালি করতে লাগলো এবং তার তরবারি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলো। তা তার রাতে পড়ার টুপি কেটে মাথায় পৌঁছে গেলো এবং রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করলো এবং টুপিটি ভরে ফেললো। ইমাম হোসেইন (আ.) বললেন, "তুমি এ হাত দিয়ে আর কখনো খাবে না ও পান করবে না এবং তুমি উঠে দাঁড়াবে (কিয়ামতের দিন)

অত্যাচারীদের সাথে।" তিনি মাথা থেকে টুপিটি সরালেন এবং একটি রুমাল চেয়ে তা দিয়ে মাথা বাঁধলেন। এরপর তিনি আরেকটি টুপি পড়লেন এবং তার উপর একটি পাগড়ী বাঁধলেন।

আমরা (লেখক) বলি যে, তাবারিও এরকমই বর্ণনা করেছেন, কিন্তু বলেছেন তিনি রাতের টুপির বদলে একটি আরবীয় রুমাল পড়েছিলেন এবং আরও বলেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.) ক্লান্তহয়ে পড়েছিলেন এবং তখন কিনদার এক ব্যক্তি (মালিক বিন বিশর) এগিয়ে এলো এবং তার মাথার রুমালটি নিয়ে নিলো যা পশম দিয়ে তৈরী ছিলো। সে সেই রুমালটি তার স্ত্রী উম্মে আব্দুল্লাহর কাছে নিয়ে এলো যে ছিলো আল হুরের কন্যা এবং হোসেইন বিন আল হুর বাদির বোন। যখন সে তা থেকে রক্ত ধোয়ার চেষ্টা করলো, তার স্ত্রী বুঝতে পারলো যে তা ছিলো ইমাম হোসেইন (আ.) এর এবং সে বললো, "তুমি আল্লাহর রাসূল (সা.) এর নাতির কাপড় চুরি করে এনেছো আমার বাড়িতে? তা নিয়ে এখান থেকে চলে যাও।" তার বন্ধুরা বলে যে সে (মালিকের স্ত্রী) মৃত্যু পর্যন্ত রাগ করে ছিলো।

তাবারি বলেন যে, আবু মাখনাফ বর্ণনা করেছে, শিমর দশ জন কুফী পদাতিক সৈন্যকে একত্র করলো এবং ইমাম হোসেইন (আ.) এর নারীদের তাঁবগুলোর দিকে অগ্রসর হলো এবং ইমাম ও তার পরিবারের মাঝখানে অবস্থান গ্রহণ করলো। ইমাম হোসেইন (আ.) বললেন, "দুর্ভোগ তোমাদের উপর, যদি তোমরা ধর্মহীন মানুষ হয়ে থাকো এবং ফেরত যাওয়ার দিনকে (কিয়ামতকে) ভয় না পাও, কমপক্ষে তোমাদের পৃথিবীতে স্বাধীন চিন্তাসম্পন্ন এবং মর্যাদাবান লোক হও। তোমার আমার পরিবারের কাছ থেকে অসভ্য ও নির্বোধ লোকদের দূরে রাখো।" শিমর বললো, "হে ফাতিমার সন্তান, নিশ্চয়ই তোমার অধিকার আছে।" এরপর সে তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে ইমাম হোসেইন (আ.) এর দিকে অগ্রসর হলো। তাদের মাঝে ছিলো আবুল জুনুব আব্দুর রহমান জু'ফি, ক্বাশ'আম বিন আমর বিন ইয়াযীদ জু'ফি, সালেহ বিন ওয়াহাব ইয়াযবী, সিনান বিন আনাস নাখাই এবং খাত্তলি বিন ইয়াযীদ আসবাহি। শিমর তাদের উস্কানি দিলো ইমাম হোসেইন (আ.) কে হত্যা করার জন্য। সে আবুল জুনুবকে বললো, যে অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলো, "এগিয়ে যাও।" সে বললো, "তুমি কেন আরও এগোচ্ছো না?" শিমর উত্তর

দিলো, "তুমি কি আমাকে মুখের উপর উত্তর দাও?" সে বললো, "তাহলে তুমি কি আমাকে আদেশ করছো?" তারা পরস্পরকে গালিগালাজ শুরু করলো এবং আবুল জুনুব, যে ছিলো এক সাহসী লোক বললো, "আল্লাহর শপথ, আমি কত যে চাই এ বর্শাটি তোমার চোখে ঢুকিয়ে দিতে।" শিমর তাকে ছেড়ে দিলো এবং বললো, "আল্লাহর শপথ, আমার ইচ্ছা করছে তোমাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করতে।"

বর্ণনায় আছে যে শিমর, সঙ্গে দশ জন পদাতিক সৈন্য নিয়ে, ইমাম হোসেইন (আ.) এর দিকে ফিরলো এবং তিনি তাদেরকে আক্রমণ করলেন ও ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। তখন তারা তাকে আরও কঠিনভাবে ঘেরাও করলো। সে মুহূর্তে একটি শিশু ইমাম হোসেইন (আ.) এর দিকে ছুটে এলো ইমামের পরিবারের তাঁবু থেকে। ইমাম উচ্চ কণ্ঠে তার বোন সাইয়েদা যায়নাব (আ.) কে ডাক দিলেন, "এর যত্ন নাও।" শিশুটি শুনলো না এবং দৌড় দিলো ইমামের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত এবং তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। শেইখ মুফীদ তাকে চিহ্নিত করেছেন আব্দুল্লাহ বিন (ইমাম) হাসান নামে, শিশুটি বললো, "আল্লাহর শপথ, আমি আমার চাচার কাছ থেকে সরে যাবো না।"

তাবারি বর্ণনা করেছে বাহর বিন কা'আব ইমাম হোসেইন (আ.) কে আঘাত করলো তার তরবারি দিয়ে এবং শিশুটি বললো, "দুর্ভোগ হোক তোমার হে খারাপ চরিত্রের লোকের সন্তান। তুমি কি আমার চাচাকে হত্যা করতে চাও?" অভিশপ্ত শয়তান তাকে তার তরবারি দিয়ে আঘাত করলো, তা শিশুটি তার দুহাতের উপর নিলো এবং তা গোশত পর্যন্ত কাটলো এবং ঝুলতে লাগলো। শিশুটি কেঁদে উঠলো, "ও মা, আমার সাহায্যে আসো।" ইমাম তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং বললেন, "হে ভাতিজা, সহ্য করো এ পরীক্ষা এবং তা তোমার জন্য বরকত মনে করো। তুমি শীঘ্রই মিলিত হবে তোমার ধার্মিক পিতৃপুরুষদের সাথে যারা হলেন আল্লাহর রাসূল (সা.), ইমাম আলী বিন আবি তালিব (আ.), হামযা (আ.), জাফর (আত তাইয়ার) (আ.) এবং (ইমাম) হাসান বিন আলী (আ.)।" এরপর তিনি তার হাত তুললেন দোআ করার জন্য এবং বললেন, "হে আল্লাহ, আকাশের বৃষ্টি ও পৃথিবীর প্রাচুর্য তাদের জন্য স্থগিত করে দাও। ইয়া রব, যদি তুমি তাদের আরও কিছু দিনের জন্য জীবন দাও, তাহলে তাদেরকে বিতাড়িত করো

এবং শাসকদেরকে তাদের উপর সব সময় অসন্তুষ্ট রাখো, কারণ তারা আমাদের আমন্ত্রণ করেছে সাহায্য করার জন্য কিন্তু এরপর আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং আমাদেরকে হত্যা করেছে।”

'মালহুফ' গ্রন্থে বর্ণিত, সাইয়্যেদ ইবনে তাউস বলেন যে, হুরমালাহ তার (আব্দুল্লাহ বিন হাসানের) দিকে একটি তীর ছুঁড়লো এবং তাকে হত্যা করলো, তখন সে তার চাচা ইমাম হোসেইন (আ.) এর হাতের উপর ছিলো (আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক তার উপর)।

ইবনে আবদে রাব্বিহী তার 'ইকদুল ফারীদ' গ্রন্থে বলেন যে, সিরিয়ার এক সৈন্যের দৃষ্টি পড়ে আব্দুল্লাহ বিন হাসান বিন আলী (আ.) এর উপর, যিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে খুবই সুন্দর এবং সে বললো, "আমি এ কিশোরকে হত্যা করতে চাই।" এক ব্যক্তি তাকে বললো, "দুর্ভোগ তোমার উপর, তার উপর থেকে হাত সরিয়ে নাও।" কিন্তু সে কোন কান দিলো না এবং তাকে আঘাত করলো তরবারি দিয়ে এবং তাকে হত্যা করলো। যখন তরবারি তার কাছে পৌঁছে গেলো তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "হে চাচা, আমার সাহায্যে আসেন।" ইমাম বললেন, "এই তো আমি, এ তার কণ্ঠ যার আছে অল্প কজন সাথী এবং প্রচুর হত্যাকারী।" ইমাম তার হত্যাকারীকে আক্রমণ করলেন এবং তার হাত বিচ্ছিন্ন করে দিলেন এবং অন্য একটি আঘাতে তাকে হত্যা করলেন।

আমি (লেখক) বলি যে, ইবনে আবদে রাব্বিহী পরিষ্কারভাবে ভুল করেছে। সে ক্বাসিম বিন হাসানকে আব্দুল্লাহ বিন হাসান বলে চিহ্নিত করেছে, ক্বাসিম বিন হাসানের শাহাদাত আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি।

তাবারি বলেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.) তখন পদাতিক সৈন্যদের আক্রমণ করেন এবং তাদেরকে তার কাছে ঠেলে সরিয়ে দেন।

শেইখ মুফীদ বলেন যে, পদাতিক সৈন্যরা ইমাম হোসেইন (আ.) এর সাথীদেরকে বাম ও ডান দিক থেকে আক্রমণ করে এবং তাদেরকে হত্যা করে যতক্ষণ না তিন থেকে চারজন ইমামের সাথে রয়ে যান।

তাবারি এবং (ইবনে আসীর) জাযারি একই ভাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.) এর সাথে মাত্র তিন থেকে চারজন সাথী ছিলো তিনি একটি লম্বা জামা চাইলেন যা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তা ছিলো ইয়েমেনের এবং খুব সূক্ষ্মভাবে সেলাই করা, তিনি এর দুই পাশের কিছু অংশ ছিঁড়ে দিলেন যেন তা তার শরীর থেকে খুলে নেয়া না হয়। তার একজন সাথী বললেন, "আমার মনে হয় আপনার পোশাকের নিচে বর্ম পড়লে ভালো করতেন।" ইমাম বললেন, "তা হলো অপমানকর জামা এবং তা পড়া আমার জন্য মানায় না।" বলা হয় যখন তিনি নিহত হন, বাহর বনি কা'আব তার শরীরকে আবরণহীণ অবস্থায় রেখে জামাটি তার শরীর থেকে লুট করে নিয়ে যায়।

আযদি বলেন যে, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান থেকে আমর বিন শুয়াইব বর্ণনা করেছে যে, বাহর বিন কা'বের দুহাত দিয়ে শীতকালে পুঁজ বের হতো এবং গ্রীষ্মকালে তা কাঠের লাঠির মত শুকিয়ে যেতো।

সাইয়্যেদ ইবনে তাউস বলেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.) বলেছিলেন যে, "আমার জন্য একটি জামা আনো যা আমি আমার পোশাকের নিচে পড়বো যেন তারা আমাকে খালি গা করতে না পারে।" পাতলা বর্ম আনা হলো, তিনি বললেন, "এগুলো মর্যাদাহীন ব্যক্তিদের পোষাক।" এরপর তিনি একটি জীর্ণ ছেঁড়া জামা চাইলেন এবং তা ছিঁড়ে পোষাকের নিচে পড়লেন। যখন তিনি শহীদ হলেন তখন তা তার শরীর থেকে খুলে নেয়া হয়েছিলো।

শেইখ মুফীদ বলেন যে, যখন মাত্র তিন জন সাথী ইমাম হোসেইন (আ.) এর সাথে ছিলো তিনি শত্রুদের দিকে ফিরলেন এবং ঐ তিন জন তাকে রক্ষা করতে দাঁড়ালেন এবং সেনাবাহিনীকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন যতক্ষণ পর্যন্তনা তারা শহীদ হয়ে গেলেন এবং ইমাম একা হয়ে গেলেন। তিনি মাথায় এবং শরীরে আহত ছিলেন, এরপর তিনি বাম দিক ও ডান দিক থেকে তাদের আক্রমণ করলেন এবং ছত্রভঙ্গ করে দিলেন।

হামীদ বিন মুসলিম বলে, "আল্লাহর শপথ, আমি একজন বিদ্ধস্ত মানুষকে এত বীরত্ব প্রদর্শন করতে দেখি নি যার পুত্র সন্তানদের এবং বন্ধুদের হত্যা করা হয়েছে, তবুও তার হৃদয় ছিলো

অপরাজেয়। পদাতিক সৈন্যরা তাকে আক্রমণ করেছে এবং তিনি তাদেরকে মোকাবিলা করেছেন এক নেকড়ের মত যে ভেড়ার পালকে আক্রমণ করে এবং তাদেরকে ডান বামে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।" যখন শিমর তা দেখলো, সে অশ্বারোহীদের ডাকলো এবং পদাতিক সৈন্যদের সারির পেছনে তাদের অবস্থান নিতে বললো। এরপর সে তীরন্দাজদের আদেশ করলো ইমামের প্রতি তীর ছুঁড়তে। এমন সংখ্যায় তীর তার দেহে বিদ্ধ হলো যে তা দেখতে সজারুর কাটার মত লাগলো, তখন তিনি তাদের উপর থেকে তার হাত সরিয়ে নিলেন এবং তারা এগিয়ে এলো এবং তার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে থাকলো।

যায়নাব (আ.) তাঁবুর দরজায় এলেন এবং উমর বিন সা'আদকে উচ্চ কণ্ঠে ডাকলেন, "দুর্ভোগ তোমাদের জন্য হে উমর (বিন সা'আদ) আবু আব্দুল্লাহকে হত্যা করা হচ্ছে আর তুমি তাকিয়ে দেখছো?" সে কোন উত্তর দিলো না এবং তিনি আবার বললেন, "দুর্ভোগ তোমার উপর, তোমাদের মধ্যে কি একজন মুসলমানও নেই?" কিন্তু আবারও কেউ উত্তর দিলো না।

তাবারি বলেন যে, উমর বিন সা'আদ ইমাম হোসেইন (আ.) এর কাছে গেলো এবং যায়নাব (আ.) বললেন, "হে উমর বিন সা'আদ, আবু আব্দুল্লাহকে হত্যা করা হচ্ছে আর তুমি তাকিয়ে দেখছো?" বর্ণনাকারী বলে যে, আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি তার গাল ও দাড়িতে অশ্রু ঝরছে এবং সে যায়নাব (আ.) এর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

সাইয়্যেদ ইবনে তাউস বলেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.) অনেক আঘাতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং তাকে সজারুর মত (তীরের কারণে) দেখতে লাগছিলো। সালেহ বিন ওয়াহাব ইয়াযনী একটি বর্শা তার একপাশে বিদ্ধ করে এবং তিনি ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে যান বাম গালের ওপরে। এরপর তিনি বললেন, "আল্লাহর নামে, এবং আল্লাহর অনুমতিতে এবং আল্লাহর রাসূলের বিশ্বাসের ওপরে।" এরপর উঠে দাঁড়ালেন।

বর্ণনাকারী বলে যে, সাইয়েদা যায়নাব (আ.) তাঁবুর দরজা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে বললেন, "হে আমার ভাই, হে আমার অভিভাবক, হে আমার পরিবার, হায় যদি আকাশ পৃথিবীতে ভেঙ্গে পড়তো এবং পাহাড়গুলো চূর্ণ হয়ে মরুভুমিতে ছড়িয়ে যেতো!"

বর্ণিত হয়েছে, শিমর তার সাথীদের উচ্চ কণ্ঠে ডেকে বললো, "এ মানুষটির জন্য তোমরা অপেক্ষা করছো কেন?" তখন তারা তাকে সব দিক থেকে আক্রমণ করে।

হামীদ বিন মুসলিম বলে যে, ইমাম হোসেইন (আ.) একটি পশমী লম্বা জামা পড়েছিলেন এবং মাথায় পাগড়ী এবং চুলে ওয়াসমাহর কলপ ছিলো। আমি তাকে শহীদ হওয়ার আগে বলতে শুনলাম, যখন তিনি পায়ের উপর ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধ করছিলেন যেন ঘোড়ায় চড়ে আছেন এবং নিজেকে তীর থেকে রক্ষা করছিলেন এবং অশ্বারোহী বাহিনী সব দিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিলো এবং তিনি তাদের তরবারি দিয়ে আক্রমণ করলেন, "তোমরা একত্রে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছো? আল্লাহর শপথ, আমার পরে তোমরা আর কাউকে হত্যা করবে না যার হত্যাতে আল্লাহ তোমাদের উপর এর চাইতে বেশী ক্রোধান্বিত হবেন। আল্লাহর শপথ, আমি চাই যে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসুন তোমাদের ঘৃণার পরিবর্তে এবং তিনি আমার প্রতিশোধ নিন তোমাদের উপর এমন এক মাধ্যমে যে সম্পর্কে তোমরা সচেতন নও। সাবধান, যদি তোমরা আমাকে হত্যা করো, আল্লাহও তোমাদেরকে হত্যা করবেন এবং তোমাদের রক্ত ঝরাবেন। এরপর তিনি তোমাদের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিবেন না যতক্ষণ না তিনি ভয়ানক শাস্তিকে দ্বিগুণ করবেন।"

বর্ণিত আছে যে, তিনি সেদিন দীর্ঘ সময়ের জন্য বেঁচে ছিলেন এবং সেনাবাহিনী যদি চাইতো তাকে হত্যা করতে পারতো। কিন্তু তারা এ বিষয়ের জন্য একে অন্যকে উপযুক্ত মনে করলো এবং প্রত্যেক দল চাইলো অন্যরা তাকে হত্যা করুক। শিমর তাদের মাঝে চিৎকার করে বললো, "কিসের জন্য তোমরা অপেক্ষা করছো? এ লোককে হত্যা করো। তোমাদের মা তোমাদের জন্য কাঁদুক।" এরপর তারা তাকে সবদিক থেকে আক্রমণ করলো।

শেইখ মুফীদ বলেন যে, যারাহ বিন শারীক তার বাম হাতকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং তার কাঁধে তরবারির আরেকটি আঘাত বসিয়ে দেয় এবং তিনি মুখের উপর পড়ে গেলেন।

তাবারি বলেন যে, তখন তারা পিছনে হটে গেলো এবং তিনি ছিলেন খুবই খারাপ অবস্থায় এবং তিনি উঠে দাঁড়ালেন ও পড়ে গেলেন। সেই মুহূর্তে সিনান বিন আনাস বিন আমর নাখাই তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করলো এবং মাটিতে ফেলে দিলো।

শেইখ মুফীদ ও তাবারসি বলেন যে, খাওলি বিন আল আসবাহি দ্রুত এগিয়ে এলো এবং ঘোড়া থেকে নেমে এলো তার মাথা বিচ্ছিন্ন করতে, কিন্তু সে কাঁপতে লাগলো। শিমর বললো, “আল্লাহ তোমার হাত ভেঙ্গে দিক, কেন তুমি কাঁপছো?” এরপর সে ঘোড়া থেকে নেমে এলো এবং তার মাথা কেটে ফেললো।

আবুল আব্বাস আহমেদ বিন ইউসুফ দামিশকি ক্বিরমানি, যিনি ১০১৯ হিজরিতে মারা যান, তার ‘আখবারুল দাওল’ গ্রন্থে বলেছেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.) এর পিপাসা তীব্র হয়ে উঠলো, কিন্তু তারা তাকে পানি পান করার জন্য পানি দেয় নি। এক পেয়ালা পানি তার হাতে এলো এবং তিনি উপুড় হলেন তা পান করার জন্য। হাসীন বিন নামীর তার দিকে একটি তীর ছুঁড়লো, যা তার থুতনি ভেদ করলো এবং পেয়ালাটি রক্তে ভরে গেলো। তখন তিনি তার দুহাত আকাশের দিকে তুলে বললেন, “হে আল্লাহ, তাদের সংখ্যা কমিয়ে দাও, তাদের প্রত্যেককে হত্যা করো এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকেও পৃথিবীর উপর ছেড়ে দিও না।” তখন তারা তাকে সব দিক থেকে আক্রমণ করলো এবং তিনি তাদেরকে বাম ও ডান দিকে তাড়িয়ে দিলেন যতক্ষণ পর্যন্তনা যারাহ বিন শারীক তার বাম কাঁধে আঘাত করে এবং আরেকটি আঘাত কাঁধে ঢুকিয়ে দেয় এবং তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। শিমর তখন তার ঘোড়া থেকে নেমে এসে তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং তা খাওলি আসবাহির হাতে হস্তান্তর করে। এরপর তারা তার জামা- কাপড় লুট করে।

আমি (লেখক) বলি যে, সাইয়্যেদ ইবনে তাউস, ইবনে নিমা, শেইখ সাদুক্ব, তাবারি, ইবনে আসীর জাযারি, ইবনে আব্দুল বির, মাসউদী এবং আবুল ফারাজ বলেছেন যে, অভিশপ্ত সিনান (বিন আনাস) তার মাথা বিচ্ছিন্ন করেছিলো।

সাইয়্যেদ ইবনে তাউস বলেন যে, সিনান এগিয়ে এলো এবং বললো, “যদিও আমি জানি যে সে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নাতি এবং তার মা-বাবা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তবুও আমি তার মাথা কাটবো।” এরপর সে তার পবিত্র ঘাড়ে আঘাত করে তার তরবারি দিয়ে এবং তার পবিত্র ও সম্মানিত মাথা আলাদা করে ফেলে।

একজন কবি এ সম্পর্কে বলেছেন, "কোন দুর্যোগ হোসেইনের দুর্যোগ থেকে বড় হতে পারে যখন সিনানের হাত তাকে হত্যা করছিলো।"

আবু তাহির মুহাম্মাদ বিন হাসান (অথবা হোসেইন) বারাসি (অথবা নারাসি) 'মা'আলিমুদ দ্বীন' গ্রন্থে বলেন যে, ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) বলেছেন, যখন ইমাম হোসেইন (আ.) এর বিষয়টি এই পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন ফেরেশতারা আল্লাহর সামনে কাঁদতে থাকে এবং বলে, "হে আল্লাহ এ হোসেইন আপনার মেহমান, সে আপনার রাসূলের নাতি", তখন আল্লাহ ইমাম আল ক্বায়েম (আল মাহদী)- এর একটি ছবি দেখালেন এবং বললেন, "আমি তাদের উপর প্রতিশোধ নিবো এর মাধ্যমে।"

বর্ণিত হয়েছে যে, মুখতার সিনানকে গ্রেফতার করে এবং তার প্রতিটি আঙ্গুল একের পর এক কেটে ফেলে। এরপর সে হাত দুটো ও পা দুটো কেটে ফেলে এবং তাকে একটি বড় পাত্রে ছুঁড়ে ফেলে, যাতে ছিলো ফুটন্তজলপাই তেল।

বর্ণনাকারী বলেন, যে মুহূর্তে তারা ইমাম হোসেইন (আ.) এর মাথা কেটে ফেললো এক প্রচণ্ডঘুর্ণিঝড় আবির্ভূত হলো এবং পুরো দিগন্তকে অন্ধকারে ছেয়ে ফেললো। এরপর এক লাল ঝড় বইলো যার কারণে কিছু দেখা যাচ্ছিলো না এবং সেনাবাহিনী ভাবলো আল্লাহর অভিশাপ বোধ হয় নামলো। এরকম এক ঘন্টা চললো।

হিলাল বিন নাফে' বলেন যে, আমি উমর বিন সা'আদের সাথীদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং কেউ একজন চিৎকার করে বললো, "অধিনায়ক, সুসংবাদ নিন, শিমর হোসেইনকে হত্যা করেছে।" তখন আমি তার শাহাদাতের স্থানে গেলাম এবং তার পাশে দাঁড়ালাম এবং তিনি মারা যাচ্ছিলেন। আল্লাহর শপথ, আমি এর চেয়ে ভালো কোন লাশ যা রক্তে ভেজা ছিলো এবং তার চেহারার চাইতে আলোকিত কোন চেহারা দেখিনি। তার চেহারার আলো এবং অসাধারণ সৌন্দর্য আমাকে তার মৃত্যু ভুলিয়ে দিলো।

এ অবস্থায় তিনি পানি চাইলেন এবং এক ব্যক্তি তাকে বললো, "আল্লাহর শপথ, তুমি তা পাবে না যতক্ষণ না জ্বলন্তআগুনে (জাহান্নামে) প্রবেশ কর।" (আউযুবিল্লাহ)। আমি ইমামকে বলতে

শুনলাম, “দুর্ভোগ হোক তোমার, আমি জ্বলন্ত আগুনের দিকে যাচ্ছি না, না আমি সেখানে ফুটন্তপানির স্বাদ নিবো, বরং আমি যাচ্ছি আমার নানা আল্লাহর রাসূল (সা.) এর কাছে এবং আমি বাস করবো তার সত্যপূর্ণ বাসস্থানে আল্লাহর আশ্রয়ে, যিনি সর্বশক্তিমান এবং আমি পবিত্র পানি পান করবো এবং এরপর আমি তার কাছে অভিযোগ করবো তোমরা আমার সাথে কী করেছো”। তা শুনে তাদের সবাই ক্রুদ্ধ হলো। যেন তাদের বুকের ভেতর কোন দয়ামায়া ছিলো না এবং এ পরিস্থিতিতে যখন তিনি তাদের সাথে কথা বলছিলেন তারা তার মাথা কেটে নিলো। আমি তাদের নৃশংসতায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম এবং বললাম, “আমি আর কোন দিন কোন কাজে এখন থেকে তোমাদের সাথে থাকবো না।”

কামালুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন তালহা তার ‘মাতালিবুস সা’উল’- এ বলেন যে, আল্লাহর হাবীব রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নাতির মাথা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিলো একটি ধারালো তরবারি দিয়ে। এরপর তার মাথাকে ওপরে তুলে বর্শার আগায়, যা ধর্মত্যাগীদের জন্য করা হয়, এবং তারা একে প্রদর্শন করে বিভিন্ন শহরের রাস্তায় আল্লাহর বান্দাদের মাঝে এবং তারা তার পরিবার ও সন্তানদেরকে নিয়ে যায় অসম্মানের সাথে এবং উটের উপর তাদের চড়িয়ে দেয় বসার জন্য কোন জিন ছাড়াই। একথা জেনেও যে, তারা রাসূলের বংশধর, অথচ তাদের প্রতি ভালোবাসা বাধ্যতামূলক যেভাবে কোরআনে ও প্রকৃত বিশ্বাসে উল্লেখ আছে। যদি আকাশগুলো ও পৃথিবীর কথা বলার শক্তি থাকতো তাহলে তারা তাদের জন্য কাঁদতো ও বিলাপ করতো। যদি অবিশ্বাসীরা এ বিষয়ে জানতো তারা তাদের জন্য কাঁদতো ও বিলাপ করতো। যদি আইয়ামে জাহেলিয়াত (অজ্ঞতার যুগ)- এর সময়কার উদ্ধত লোকগুলো উপস্থিত থাকতো তারাও তাদের জন্য কাঁদতো এবং তাদের শাহাদাতে পরস্পরকে সমবেদনা জানাতো। যদি নিপীড়নকারী অত্যাচারীরা শাহাদাতের ঘটনাবলীর সময় উপস্থিত থাকতো তারা তাদের সহযোগিতা ও সাহায্য করতো। আক্ষেপ সেই দুর্যোগের জন্য যা খোদাভীরুদের হৃদয়কে আঘাত করেছে এবং তা উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছে। আক্ষেপ সেই ভয়ানক দুর্যোগের জন্য যা বিশ্বাসীদের হৃদয়কে করেছে শোকার্ত ও ব্যথাতুর করেছে তাদের জন্য যারা ভবিষ্যতে আসবে। আফসোস নবীর বংশধরের জন্য, যাদের রক্ত

ঝরানো হয়েছে, এবং মুহাম্মাদ (সা.) এর পরিবারের জন্য যাদের তরবারি গতি হারিয়ে ফেলেছে এবং আলীর বংশধরের জন্য আফসোস যারা সাহায্য থেকে বঞ্চিত ছিলো এবং তাদের অভিভাবকদের হত্যা করা হয়েছিলো। আফসোস হাশিমীদের জন্য। যাদের পবিত্রতা লংঘন করা হয়েছিলো এবং যাদের রক্ত ঝরানো বৈধ বলে মনে করা হয়েছিলো।

আলী বিন আসবাত থেকে 'নাওয়াদির'- এ বর্ণিত হয়েছে, তিনি বর্ণনা করেছেন তার কিছু সাথী থেকে, যে ইমাম মুহাম্মাদ আল বাক্বির (আ.) বলেছেন, "দশই মহররম, আমার বাবা (ইমাম যায়নুল আবেদীন আ.) ভীষণ অসুস্থ ছিলেন এবং তাঁবুর ভিতরে ছিলেন। আমি দেখলাম আমার বন্ধুরা এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করছে ইমাম হোসেইন (আ.) এর সাথে এবং তার জন্য পানি আনছে। একবার তিনি সেনাবাহিনীর ডান অংশকে আক্রমণ করলেন এবং তার পর বাম অংশ এবং একবার মাঝখানের অংশকে। তারা তাকে হত্যা করলো এমনভাবে যে রাসূল (সা.) তাদেরকে একটি পশুকেও এভাবে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তারা তাকে হত্যা করে তরবারি, বর্শা, পাথর, লম্বা লাঠি এবং ছোট লাঠি দিয়ে। এরপর তারা তার দেহকে ঘোড়ার খুর দিয়ে পদদলিত করে।"

আমি (লেখক) বলি যে, ইমাম হোসেইন (আ.) শুক্রবার দিন, ১০ই মহররম শাহাদাত বরণ করেন, একষট্টি হিজরিতে, যোহরের নামাযের পর। তিনি সাতান্ন বছর বয়সী ছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে তাকে শহীদ করা হয়েছিলো শনিবার অথবা সোমবার, কিন্তু অধিকতর সঠিক বলে মনে হয় শুক্রবার।

আবুল ফারাজ (ইসফাহানি) বলেন যে, আম্মাহগণ (যারা শিয়া নন) সোমবার সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তা একটি ভুল এবং তা কোন রেওয়াতে সমর্থিত নয়। এটি এজন্য যে, যে মহররমে (৬১ হিজরি) শাহাদাত ঘটে তার প্রথম দিনটি ছিলো ভারতীয় জ্যোর্তিরবিদ্যার দিনক্ষণের সকল হিসাবে বুধবার, তাই ১০ই মহররম সোমবার হতে পারে না (বরং শুক্রবার), এবং এটি একটি প্রমাণ যা রেওয়াতের সত্যতাকে নিশ্চিত করে।

শেইখ মুফীদ ইমাম হোসেইন (আ.) এর শাহাদাত সম্পর্কে ১০ই মহররমকে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন তা ছিলো শুক্রবারের প্রভাত। অন্যরা বলেন শনিবার, উমর বিন সা'আদ তার বাহিনী জড়ো করেছিলো এবং পূর্ববর্তী সংবাদ অনুযায়ী তা ছিলো শুক্রবার। আর কারবালায় প্রবেশ সম্পর্কে শেইখ মুফীদ বলেন তা ছিলো ২রা মহররম বৃহস্পতিবার, একষট্টি হিজরিতে।

সিবতে ইবন জওযির 'তাযকিরাহ'তে বর্ণিত আছে যে, ইমাম হোসেইন (আ.) কে শহীদ করা হয় শুক্রবার, যোহর ও আসরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে। কারণ তিনি তার সাথীদের নিয়ে সালাতুল খওফ পড়েছিলেন।

একই বইতে উল্লেখ আছে তার হত্যাকারীদের সম্পর্কে বেশ কিছু সংবাদ আছে। হিশাম বিন মুহাম্মাদ (কালবি) বলেন যে, সিনান বিন আনাস নাখাঈ ছিলো হত্যাকারী, অন্যজন ছিলো হাসীন বিন নামীর, যে তার দিকে একটি তীর ছুঁড়ে ছিলো এবং এগিয়ে এসে তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে ছিলো। এরপর সে তার ঘোড়ার ঘাড় থেকে তালিঝয়ে দেয় যে ন (উবায়দুল্লাহ) ইবনে যিয়াদ এতে খুশী হয়। তৃতীয় নামটি হলো মুহাজির বিন আওস তামিমি, চতুর্থ জন কাসীর বিন আব্দুল্লাহ শা'আবি, পঞ্চম জন শিমর বিন যিলজাওশান। আমরা বলি ষষ্ঠ জন ছিলো খাওলি বিন ইয়াযীদ বিন আসবাহি (আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক ইমাম হোসেইন (আ.) এর সকল হত্যাকারীদের উপর)।

মুহাম্মাদ বিন তালহা শাফেঈ এবং আলী বিন ঈসা ইরবিলি ইমামি বলেন যে, উমর বিন সা'আদ তার সাথীদের আদেশ করলো, "সামনে যাও এবং তার মাথা কেটে ফেলো।" নাসর বিন হারশাহ যাবাবি সামনে অগ্রসর হলো এবং ইমাম হোসেইন (আ.) এর ঘাড়ে বার বার আঘাত করলো। উমর বিন সা'আদ ক্রোধান্বিত হলো এবং তার ডান দিকে দাঁড়ালো এক ব্যক্তিকে ইশারা করার পর বললো, "আক্ষেপ তোমার জন্য, এগিয়ে যাও এবং হোসেইনকে মুক্তি দাও।" খাওলি বিন ইয়াযীদ (আল্লাহ তাকে চিরকালের জন্য জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করান) এগিয়ে এলো এবং তার মাথা কেটে ফেললো।

দীনওয়ারী বলেন যে, সিনান বিন আওস নাখাঈ একটি বর্শা তার দিকে ঠেলে দেয় এবং তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। তখন খাওলি বিন ইয়াযীদ আসবাহি অগ্রসর হলো তার মাথা বিচ্ছিন্ন করার

জন্য। তার হাত কাঁপছিলো এবং তার ভাই কা'বাল বিন ইয়াযীদ তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে এবং তার ভাই খাওলির হাতে তা দেয়।

ইবনে আবদে রাব্বিহী বলেন যে, সিনান বিন আনাস তাকে হত্যা করে এবং খাওলি বিন ইয়াযীদ আসবাহি, যে ছিলো বনি হামীর থেকে, তার মাথা কেটে ফেলে। সে তার মাথাটি উবায়দুল্লাহর কাছে নিয়ে গেলো এবং বললো, "আমার ঘোড়ার থলেতে প্রচুর সম্পদ তুলে দিন।"

ইমাম জাফর আস সাদিকা.(আ.) বলেছেন, যখন ইমাম হোসেইন (আ.) এর উপর একটি আঘাত করা হলো, তিনি তার ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন এবং তারা দৌঁড়ে আসলো তার মাথা কেটে ফেলতে। একটি কণ্ঠ আকাশ থেকে শোনা গেলো, "হে, যে জাতি তাদের নবীর ইন্তেকালের পর উদ্ধত হয়ে গেছে এবং পথভ্রষ্ট হয়েছে, আল্লাহ যেন তাদের রোযা ও ঈদুল ফিতরের অনুগ্রহ দান না করেন।" তখন তিনি (ইমাম আ.) বললেন, অতএব আল্লাহর শপথ, তারা সমৃদ্ধি লাভ করে নি এবং তারা বৃদ্ধি পেতে থাকবে যতক্ষণ না প্রতিশোধ গ্রহণকারী (ইমাম মাহদী) উঠে দাঁড়াবেন ইমাম হোসেইনের জন্য।

ইবনে ক্বাওলাওয়েইহ কুম্মি বর্ণনা করেছেন হালাবি থেকে, যিনি বর্ণনা করেছেন ইমাম সাদিক্ব (আ.) থেকে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.) কে শহীদ করা হলো, কুফার সেনাবাহিনীর মধ্যে কেউ একজন চিৎকার দিলো। যখন তাকে এজন্য তিরস্কার করা হলো, সে বললো, "কেন আমি কাঁদবো না যখন আমি দেখছি যে আল্লাহর রাসূল (সা.) দাঁড়িয়ে আছেন একবার তিনি পৃথিবীর দিকে দেখছেন এবং অন্য সময় তেমাদেরদ্ধেযর দিকে দেখছেন এবং আমি ভয় পাচ্ছি পাছে তিনি পৃথিবীবাসীর উপর অভিশাপ দেন এবং তোমরা ধ্বংস হয়ে যাও।" কুফার সেনাবাহিনী বললো, "সে পাগল।" তাদের মধ্যে যারা অনুতপ্ত ছিলো তারা বললো, "আল্লাহর শপথ, আমরা আমাদের প্রতি কী করেছি? আমরা বেহেশতের যুবকদের সর্দারকে হত্যা করেছি সুমাইয়াহর সন্তানের জন্য।" এরপর তারা উবায়দুল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো এবং তাদের অবস্থা সে পর্যন্ত পৌঁছলো যা হওয়া উচিত। বর্ণনাকারী বলেন আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, "আমি তোমাদের

জন্য কোরবান হই, কে ছিলো সেই আহ্বানকারী?" তারা বললো, "আমরা অনুমান করি তিনি ছিলেন জিবরাঈল।"

মাশহাদির বর্ণনায় আছে যে, উম্মে সালামা (আ.) এর কাছে সালামা গেলেন, তখন তিনি কাঁদছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কাঁদছেন কেন?" তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) কে স্বপ্নে দেখলাম তার মাথা ও দাড়ি ধুলায় মাখা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হে রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনার কী হয়েছে যে আপনি ধুলায় মাখা? তিনি বললেন, "এই মাত্র আমি আমার হোসেইনের হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছি।"

ইবনে হাজার-এর সাওয়ায়েক্বে মুহরিক্বায় বর্ণিত আছে যে, ইমাম হোসেইন (আ.) এর শাহাদাতের দিন যে চিহ্নগুলি দেখা গিয়েছিলো তার মধ্যে একটি ছিলো আকাশ এত কালো হয়ে গিয়েছিলো যে, দিনের বেলা তারা দেখা গিয়েছিলো। যে কোন পাথর তুললে তার নিচে তাজা রক্ত দেখা গিয়েছিলো এবং আরও বলা হয় তার শাহাদাতে আকাশ লাল এবং সূর্য পীচের মত কালো হয়ে গিয়েছিলো। তারাগুলো দিনের বেলা দেখা যাচ্ছিলো এবং মানুষ মনে করেছিলো কিয়ামতের দিন চলে এসেছে। সে দিন সিরিয়াতে যে কোন পাথর উঠানো হয়েছিলো তার নিচে তাজা রক্ত দেখা গিয়েছিলো।

* আশুরার (দশ মহররম) রাতে ইমাম হোসাইন (আ.) ও
ইমাম হোসেইন (আ.) এর শাহাদাত এ বর্ণনা দু'টি শেখ
আব্বাস কোমী প্রণীত নাফাসুল মাহমুম গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

অত্যুজ্জ্বল শাহাদাত

আলী আকবর (আ.)- এর বীরত্ব

[সাইয়্যেদ ইবনে তাউস প্রণীত লোহুফ থেকে সংকলিত]

ইমাম হোসাইন (আ.) - এর সঙ্গীরা ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত অবস্থায় একে একে ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন। আহলে বাইত ছাড়া আর কেউ বেচে নেই।

এসময় সবচেয়ে সুন্দর অবয়ব, সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী আলী বিন হোসাইন তার পিতার কাছে এসে যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করেন। ইমাম হোসাইন তৎক্ষণাৎ অনুমতি দেন। এর পর তার দিকে উদ্বেগের দৃষ্টি ফেলেন আর ইমামের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। অশ্রুশিক্ত অবস্থায় বললেন :

اللهم اشهد فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا ومنْطقا برسولك وكنّا اذا اشتقنا الي نبيك نظرنا اليه

'হে আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থাক। তাদের দিকে এমন এক এক এক যুবক অগ্রসর হয়েছে যে শরীরের গঠন, সৌন্দর্য, চরিত্র ও বাক্যালাপে তোমার রাসূল (সা.) –এর সাদৃশ্যপূর্ণ। আমরা যখন তোমার নবী (সা.) - এর দিকে তাকানোর আকাঙ্ক্ষা করতাম তখন এ যুবকের দিকেই তাকাতাম।'

এর পর ওমর বিন সা'দের প্রতি লক্ষ করে উচ্চকণ্ঠে বললেন :

يا بن سعد قطع االله رحمك كما قطعت رحمي

'হে সা'দের ছেলে! আল্লাহ তোমার বংশধরকে বিচ্ছিন্ন করুন যেভাবে তুমি আমার বংশধরকে বিচ্ছিন্ন করেছ।'

আলী বিন হোসাইন দুশমনের মোকাবিলায় প্রচণ্ড লড়াই শুরু করেন। বহু সংখ্যক শত্রু সেনা হত্যা করে শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পিতা ইমাম হোসাইনের কাছে এসে বললেন :

يا ابة العطش قد قتلني وثقل الحديد قد اجهدني فهل الي شربة من الماء سبيل

'হে মহান পিতা ! পিপাসায় আমার জীবন ওষ্ঠাগত, যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় আমি ক্লান্ত, আমাকে একটু পানি দিয়ে জীবন বাচাতে দিন।' ইমাম হোসাইন কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন : 'হায়! কে

সাহায্য করবে? প্রিয় ছেলে! ফিরে যাও, যুদ্ধ চালাও, সময় ঘনিয়ে এসেছে। একটু পরেই আমার নানা মুহাম্মাদ (সা.) - এর সাথে সাক্ষাৎ করবে। তার হাতের পেয়ালা এমনভাবে পান করবে যে, এরপর আর কখনও পিপাসার্ত হবে না।'

আলী ময়দানে ফিরে যান, জীবনের মায়া ত্যাগ করে শাহাদাতের জন্য প্রস্তুতি নেন। প্রচণ্ড হামলা শুরু করেন। হঠাৎ মুনকিজ বিন মুররা আবদী (আল্লাহর লানত তার উপর বর্ষিত হোক) আলী বিন হোসাইনের দিকে তীর নিক্ষেপ করেন। এ তীরের আঘাতে তিনি ধরাশায়ী হয়ে পড়েন। তিনি চিৎকার দিয়ে বলেন :

يا ابتاه عليك مني السلام هذا جدّى يقرئک السلام و يقول لک عجّل القدوم الينا

'বাবা! খোদা হাফেজ, আপনার প্রতি সালাম। আমার সামনেই নানা মুহাম্মাদ (সা.) আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন আর বলছেন : "হে হোসাইন ! তাড়াতাড়ি আমাদের সাথে মিলিত হও "। এরপরই একটি চিৎকার দিয়ে তিনি শাহাদাতের শরবত পান করেন।

ইমাম হোসাইন নিহত সন্তানের মাথার কাছে দাঁড়ালেন।

و وضع خدّه عَلي خدّه

তার গালে গাল লাগিয়ে চুমু খেলেন আর বললেন :

قتل الله قومًا قتلوك علي الدنيا بعدك العفا

হে বৎস! আল্লাহ সে সম্প্রদায়কে হত্যা করবে য তোমাকে হত্যা করেছে। এরা আল্লাহর কাছে কতই না অপরাধ করেছে, আল্লাহর রাসূলের সাম্মানে কতই না আঘাত হেনেছে!

বর্ণিত হয়েছে, যায়নাব তাবু থেকে বের হয়ে ময়দানের দিকে ছুটে চললেন এবং ভয়ানক চিৎকার দিয়ে বললেন :

يا حبيباه يا بن اخاه

'হে আদরের ধন! হে ভাতিজা!'

আপন ভাতিজার লাশের কাছে এসে তিনি গড়িয়ে গড়িয়ে কেঁদেছিলেন ছিলেন। ইমাম হোসাইন এসে তাকে নারীদের তাবুতে ফিরিয়ে নেন। এরপরই আহলে বাইতের যুবকরা একে একে ময়দানে অবতীর্ণ হন এবং অনেকেই ইবনে যিয়াদের বাহিনীর হাতে শহীদ হন। এ সময় ইমাম

হোসাইন ফরিয়াদ করে বললেন : 'হে আমার চাচাতো ভাইয়েরা! হে আমার বংশধরগণ! ধৈর্য ধারণ করো। আল্লাহর শপথ, আজকের দিনের পর কোনো দিন অপমানিত ও লাঞ্চিত হবে না।'

কবি বলেন :

'এসেছে নিশি, পূর্ণশশী তুমি তো আসোনি

জীবন ওষ্ঠাগত, আমার জীবন হে আলী আসোনি

খচার পাখি মরুর দিকে উড়ে গেলো

কিন্তু হে হোমা পাখি! তার কাছেও আসোনি

আমার শরৎ অন্তর তোমার দিদারে হতো বসন্ত

হে গোলাপ পুষ্প! কেনো তুমি আসোনি

ছড়ালাম অশ্রু, গেলাম সবার আগে তোমার গমন পথে

তোমার প্রতীক্ষায় হলাম পেরেশান তুমি তো আসোনি

অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় ছিলাম তুমি যদি আসো।

তোমার পায়ে জান করবো কুরবান, তুমি তো আসোনি।'

হযরত আবুল ফযল আব্বাস (আ.)- এর শাহাদাত

[সাইয়্যেদ ইবনে তাউস প্রণীত লোহুফ থেকে সংকলিত]

বর্ণনাকারী বলেন, ইমাম হোসাইন পিপাসায় কাতার হয়ে ফোরাতের তীরে উপস্থিত হলেন। সাথে রয়েছেন তার ভাই আব্বাস। ইবনে সা'দের বাহিনী ঝপিয়ে পড়ল দু'জনের ওপর। তাদের পথ বন্ধ করল। বনী দারাম গোত্রের এক দুরাচার আবুল ফযল আব্বাস- এর দিকে তীর নিক্ষেপ করলে তার পবিত্র মুখে বিদ্ধ হয়। ইমাম হোসাইনই তা টেনে বের করে নেন, তার হাত রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। তিনি সেই রক্ত ছুড়ে ফেলে বললেন : 'হে আল্লাহ ! এ জনগোষ্ঠী তোমার নবী নন্দিনীর সন্তানের ওপর এ যুলুম চালাচ্ছে, এদের বিরুদ্ধে তোমার দরবারে বিচার দিচ্ছি। ইবনে সা'দের বাহিনী মুহূর্তের মধ্যে ইমাম হোসাইনের নিকট থেকে হযরত আব্বাসকে ছিনিয়ে নেয়। চতুর্মুখী

আক্রমণ ও তারবারির সম্মিলিত আঘাতে হযরত আব্বাস শহীদ হন। তার শাহাদাতে ইমাম হোসাইন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। কবি তাই তো বলেছেন :

احق الناس ان یبکی علیه　　فتی ابکی الحسین بکربلاء

اخوه و ابن والده علی　　ابو الفضل المضرج بالدماء

و من واساه لا یثنیه شیء　　و جادله عل عطش بماء

''কতই না উত্তম ব্যক্তি –যার জন্য ইমাম হোসাইন কারবালার এ কঠিন মুসিবতের সময়ও কেঁদেছেন। তিনি ছিলেন ইমাম হোসাইনের ভাই, তার বাবা ছিলেন আলী, তিনি তা আর কেউ নন রক্তাক্ত বদন আবুল ফযল আব্বাস। তিনি ছিলেন ইমাম হোসাইনের সহমর্মী, কোনো কিছুই তাকে এপথ থেকে সরাতে পারেনি। প্রচণ্ড পিপাসা নিয়ে ফোরাতের তীরে পৌছেন, কিন্তু ইমাম হোসাইন যেহেতু পান করেননি তিনিও তাই পানি মুখে নেননি।'

অন্য কবি বলেন : 'মুষ্ঠির মাঝে পানি নিলেন, মনভরে পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করবেন কিন্তু যখনই ইমাম হোসাইনের পিপাসার কথা মনে পড়লো, হাতের মুঠোর পানিতে অশ্রু ফলে ফিরে আসলেন।'

হযরত আবুল ফযল আব্বাস- এর এ মহান আত্মত্যাগ সকল লখক, চিন্তাশীলের দৃষ্টিতেই গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লামা মাজলিশী তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিহারুল আনওয়ার'- এই মধ্যে লিখেছেন, 'হযরত আব্বাস ফোরাতের তীরে গেলেন। যখনই অঞ্জলী ভরে পানি পান করতে চাইলেন তখন হঠাৎ ইমাম হোসাইন ও তার আহলে বাইতের পানির পিপাসার যন্ত্রণার কথা মনে পড়ল। তাই তিনি পানি ফোরাতেই ফলে দিলেন, পান করলেন না।'

একজন আর বীকবিবলেন :

ذبلت یا عباس نفسا نفیسة　　لِنَصر حسین عز بالجد عن مثل

ابیت التذاذ الماء قبل التذاذ　　فحسن فعال المرء فرع من الاصل

فانت اخوه السبطین فی یوم مفخر　　وفی یوم بذل الماء انت ابو الفضل

'আবুল ফযল আব্বাস তার সবচেয়ে মূল্যবান প্রাণ ইমাম হোসাইন -এর জন্যই উৎসর্গ করেছেন। ইমাম হোসাইন পান করার পূর্বে তিনি নিজে পান করলেন না। মানুষের কর্মের সর্বোত্তম কর্ম ও মূল কাজই তিনি করলেন। আপনি তো গীরবের দিবসে রাসূলের দুই নাতির ভাই, আর আপনিই তো পানি পানের দিবসে করেছেন আত্মত্যাগ, হে আবুল ফযল!'

পানি টলটলায়মান, বাদশাহ্ তৃষ্ণায় ওষ্ঠাগত,

উদ্দম তার অন্তরে হাতে রয়েছে পানির মশক,

মুর্তাযার সিংহ শাবককে হামলা করলো এমনভাবে

এ যেন অগণিত নেকড়ের মাঝে এক বাঘ।

এমন একটি বদন কেউ দেখেনি যাতে কয়েক হাজার তীর,

এমন একটি ফুল কেউ দেখেনি যাতে রয়েছে কয়েক হাজার কাটা।

হযরত কাসেম বিন হাসান (আ.) - এর শাহাদাত

[আয়াতুল্লাহ মুর্তাযা মোতাহহারী প্রণীত হামাসায়ে হোসাইন থেকে সংকলিত]

হযরত আলী আকবরের শাহাদাতের পর এই তেরো বছরের কিশোর হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) - এর নিকট এগিয়ে এলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন নাবালেগ কিশোর, তার শরীরের বৃদ্ধি তখনো সম্পূর্ণ হয়নি, তাই তার শরীরে অস্ত্র ঠিকভাবে খাপ খাচ্ছিলো না; কামরে ঝুলানো তলোয়ার ভূমি স্পর্শ করে কাত হয়ে ছিলো। আর বর্মও ছিলো বড়, কারণ বর্ম পূর্ণ বয়স্কদের জন্য তৈরী করা হয়ে ছিলো, কিশোরদের জন্য নয়। লৌহ টুপি বড়দের মাথার উপযোগী, ছোট বাচ্চাদের উপযোগী নয়। কাসেম বললেন : 'চাচাজান! এবার আমার পালা। অনুমতি দিন আমি রণাঙ্গনে যাই।'

উল্লেখ্য যে, আশুরার দিনে ইমাম হোসাইন (আ.) - এর সঙ্গী- সাথীদের কেউই তার কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে রণাঙ্গনে যাননি। প্রত্যেকেই তার নিকট এসে তাকে সালাম করেন এবং এরপর অনুমতি চান ; বলেন : 'আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা আবদিল্লাহ। আমাকে অনুমতি দিন।'

ইমাম হোসাইন (আ.) সাথে সাথেই কাসেমকে অনুমতি দিলেন না। তিনি কাদতে শুরু করলেন। কাসেম ও তার চাচা পরস্পরকে বুকে চপে ধরে কাদতে লাগেলেন। ইতিহাসে লখা হয়েছে : অতঃপর কাসেম ইমাম হোসাইনের হাত ও পা চুম্বন করতে শুরু করলেন। 'মাক্বাতিল' গ্রন্থে এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে : .

فلم يزل الغلام يقبل يديه و رجليه حتى اذن له

'তাকে যতক্ষণ না অনুমতি দেয়া হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কিশোর তার (ইমাম হোসাইনের) হাত ও পা চুম্বন অব্যাহত রাখেন।' (বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃএবং মাকতা ৩৪ .লু খাওয়ারেযমী, ২য় খণ্ড, পৃ (২৭ .

এ ঘটনার অবতারণা কি এ উদ্দেশ্যে হয়নি যাতে ইতিহাস পুরো ঘটনাকে অধিকতর উত্তমরূপে বিচার করতে পারে? কাসেম অনুমতির জন্য পীড়াপীড়ি করেন আর ইমাম হোসাইন (আ.) অনুমতি দানে বিরত থাকেন। ইমাম মনে মনে চাচ্ছিলেন কাসেমকে অনুমতি দবেন এবং বলবেন, যদি যেতে চাও তো যাও। কিন্তু মুখে সাথে সাথেই অনুমতি দিলেন না।বরং সহসাই তিনি তার বাহুদ্বয় প্রসারিত করে দিলেন এবং বললেন: 'এসো ভাতিজা! এসো, তোমার সাথে খোদা হাফেযীকরি।'

কাসেম ইমাম হোসাইন (আ.) -এর কাধের ওপর তার হাত দু'টি রাখলেন এবং ইমামও কাসেমের কাধের ওপর স্বীয় হস্তদ্বয় রাখলেন। এর পর উভয়ে ক্রন্দন করলেন। ইমামের সঙ্গী-সাথী ও তার আহলে বাইতের সদস্যগণ এ হৃদয়বিদারক বিদায়ের দৃশ্য অবলোকন করলেন। ইতিহাসে লখা হয়েছে, উভয়ে এতই ক্রন্দন করলেন যে, উভয়ই সম্বিতহারা হয়ে পড়লেন। এরপর এক সময় তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন এবং কিশোর কাসেম সহসাই তার ঘোড়ায় আরোহণ করলেন।

ইয়াযীদ পক্ষের সেনাপতি ওমর ইবনে সা'দের সেনাবাহিনীর মধ্যে অবস্থানকারী বর্ণনাকারী বলে : 'সহসাই আমরা এক বালককে দেখলাম ঘোড়ায় চড়ে আমাদের দিকে আসছে যে তার মাথায় টুপির (ধাতব) পরিবর্তে এক পাগড়ি বেধেছে। আর তার পায়ে যোদ্ধার বুট জুতার পরিবর্তে

সাধারণ জুতা এবং তার এক পায়ের জুতার ফিতা খোলা ছিলো; আমার স্মৃতি থেকে এটা মুছে যাবে না যে, এটা ছিলো তার বাম পা।' তারপর বর্ণনাকারী বলে : 'সে যেন চাঁদের একটি টুকরা।'

(মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ১০৬ ., আলামুল ওয়ারা, . পৃ ২৪২; আললুহুফ- , পৃ৪৮ ., বিহারুল আনোয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ৩৫ .; ইরশাদশেখ মুফিদ- , পৃ২৩৯ .; , মাকতালু মুকাররাম, পৃ২৩১ .; তারীখে তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ (২৫৬ .

একই বর্ণনাকারী আরো বলে, 'কাসেম যখন আসছিলেন তখনো তার গণ্ডদেশে অশ্রুর ফোটা দেখা যাচ্ছিলো।'

সবাই অনুপম সুন্দর এ কিশোর যোদ্ধাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো এবং ভবে পাচ্ছিলনা যে, এ ছেলেটি ক! তৎকালে রীতি ছিলো এই যে, কোনো যোদ্ধা রণাঙ্গনে আসার পর প্রথমেই নিজের পরিচয় দিতো যে, 'আমি অমুক ব্যক্তি '। উক্ত রীতি অনুযায়ী কাসেম প্রতিপক্ষের সামনে এসে পৌছার পর উচ্চৈঃস্বরে বললেন :

'যদি না চেনো আমাকে, জেনো, আমি হাসান তনয়
সেই নবী মুস্তাফার নাতি যার ওপর ঈমান আনা হয়
ঋণে আবদ্ধ বন্দিসম এইযে হোসাইন
প্রিয়জনদের মাঝে, পানি দেয়া হয়নি যাদের উত্তম রীতি মেনে।'

(বিহারুল আনওয়ার : ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ৩৪)

কাসেম রণাঙ্গনে চলে গেলেন, আর হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) তার ঘোড়াকে প্রস্তুত করলেন এবং ঘোড়ার লাগাম হাতে নিলেন। মনে হচ্ছিলো যেন তিনি তার দায়িত্ব পালনের জন্য যথাসময়ের অপেক্ষা করছিলেন। জানি না তখন ইমামের মনের অবস্থা কেমন ছিলো! তিনি অপেক্ষমাণ; তিনি কাসেমের কণ্ঠ শোনার জন্য অপেক্ষমাণ। সহসাই কাসেমের কণ্ঠে 'চাচাজান!' ধ্বনি উচ্চকিত হলো। বর্ণনাকারী বলে : 'আমরা বুঝতে পারলাম না ইমাম হোসাইন কত দ্রুত গতিতে ঘোড়ায় আরোহণ করলেন এবং রণাঙ্গনের দিকে ছুটে এলেন।' তার এ কথা বলার অর্থ এই যে, ইমাম হোসাইন (আ.) এক শিকারী বায পাখির ন্যায় রণাঙ্গনে পৌছে যান।

ইতিহাসে লিখিত আছে, কাসেম যখন ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যান তখন শত্রুপক্ষের প্রায় দু'শ' যোদ্ধা তাকে ঘিরে ফেলে। তাদের একজন কাসেমের মাথা কেটে ফেলতে চাচ্ছিলো। কিন্তু তারা যখন দেখলো যে, ইমাম হোসাইন (আ.) আসছেন তখন তাদের সকলেই সেখান থেকে পালিয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি কাসেমের মাথা কাটতে চাচ্ছিলো সে তাদের ঘোড়ার পায়ের নিচে পিষ্ট হলো। যহে তারা খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলো সেহেতু তারা তাদের বন্ধুর ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে পালিয়ে যায়। অনেক লোক ঘোড়া চালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলো; কেউ কারো দিকে তাকাবার অবকাশ পাচ্ছিলো না। মহাকবি ফেরদৌসীর ভাষায় :

ز سم ستوران در آن پهن دشت

زمین شد شش و آسمان هشت

'সেই বিশাল প্রান্তরে কঠিন ক্ষুরের ঘায়ে

ধরণী হলো ছয়ভাগ আর আসমান আট।'

কেউ বুঝতে পারলো না যে, কী ঘটে গেলো! ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে সৃষ্ট ধুলার কুণ্ডলী যখন বসে গেলো এবং হাওয়া কিছুটা স্বচ্ছ হলো তখন সবাই দেখতে পেলো যে, ইমাম হোসাইন (আ.) কাসেমকে কোলে নিয়ে আছেন। আর কাসেম তার জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো অতিক্রম করছিলেন এবং যন্ত্রণার তীব্রতার কারণে মাটিতে পা আছড়াচ্ছিলেন। এ সময় শোনা গেলো, ইমাম হোসাইন (আ.) বলছেন : .

يعزّ و الله على عمّك أن تدعوه فلا ينفعك صوته

'আল্লাহর শপথ, এটা তোমার চাচার জন্য কতই না কষ্টকর যে, তুমি তাকে ডাকলে কিন্তু তার জবাব তোমার কোনো কাজে এলো না।' (মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ১০৭ .; আলামুল ওয়ারা, পৃ২৪৩ ., আললুহুফ- , পৃ৪৮ .; বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ৩৫ .; ইরশাদশেখ মুফিদ- , পৃ . ২৩৯; মাকতালু মুকাররাম, পৃ২৩২ .; তারীখে তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ।২৫ .)

হুর ইবনে ইয়াযীদ

বাংলায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে : 'শেষ ভালো যার সব ভালো তার।' আমরা মা'সুমগণের নিকট থেকে বর্ণিত দোয়ায় পাঠ করি, 'হে আল্লাহ! আমাদের কাজের পরিণাম শুভ করুন।' কিন্তু সে সৌভাগ্য হয় ক'জনের? হলফ করে বলা যায়, এদের সংখ্যা নিতান্তই কম। এদের কারো কথা ইতিহাস মনে রাখে, আর কেউ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়। যাদের কথা ইতিহাস কখনোই বিস্মৃত হতে পারে না নিঃসন্দেহে তাদের সাথে জড়িয়ে আছে কোনো অবিস্মরণীয় ঘটনা।

কারবালার বীরত্ব গাথায় আমরা যে ক'জন ত্যাগী বীরের কথা জানতে পারি তাদের মধ্যে হুর ইবনে ইয়াযীদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

হুর ইবনে ইয়াযীদ এক সম্ভ্রান্ত গোত্রে গ্রহণ করেন। তার বীরত্ব ও উদারতা তার পূর্বপুরুষেরই উত্তরাধিকার। ইসলামপূর্ব ও পরবর্তীকালে তারা উদারতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। হুর ইবনে ইয়াযীদ অত্যাচারীকে সাহায্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে এক সুন্দর- সৌভাগ্যময় পরিণতির মাধ্যমে ইহ ও পরকালীন কাল্যাণ লাভ করেছিলেন।

হুর ছিলেন কুফার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অন্যতম। আর এ কারণে ইবনে যিয়াদ তাকে সহস্রাধিক অশ্বারোহী সৈন্যের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করেছিল। সে কুফার উদ্দেশ্যে গমনরত ইমাম হোসাইন (আ.) - এর পথরোধ করার জন্য হুর ইবনে ইয়াযীদ কে আদেশ দিয়েছিল।

হুর ইবনে ইয়াযীদ বলেন : 'দারুল ইমারা থেকে যখন বাইরে আসছিলাম তখন তিনবার এ শব্দ শুনতে পেলাম যে, কেউ যেন বলছেন : "হে হুর! তোমাকে শাহাদাতের সংবাদ!" যতই এদিক ওদিক তাকালাম, কাউকে দেখতে পলাম না। আপন মনে বলতে লাগলাম : "তোমার মাতা শোকার্ত হোক; হোসাইনের বিরুদ্ধে, আর বেহেশতের সুসংবাদ শুনছো"! '

কিন্তু আশুরার দিনে হুর যখন ইমাম হোসাইনের সঙ্গীদের সাথে মিলিত হলেন তখন সেই গায়েবী আওয়াজের অর্থ বুঝতে পারলেন।

হুর 'যু হুসাম' নামক স্থানে হযরত ইমাম হোসাইনের সাথে সাক্ষাৎ করেন যখন তিনি ও তার সঙ্গীরা তৃষ্ণার্ত ছিলো। ইমাম হোসাইন (আ.) তাদের ও তাদেরকে বহনকারী পশুগুলোকে তৃপ্তিসহকারে পানি পান করানোর আদেশ দেন। অতঃপর হুর ইমাম হোসাইনকে স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করলেন। ইমাম হুরকে বললেন যে, তিনি কুফাবাসীর আমন্ত্রণে কুফায় যাচ্ছেন। কিন্তু হুর তাকে কুফায় যেতে দিল না। অতঃপর ইমাম সেখানেই তাবু ফেললেন।

বর্ণিত আছে যে, হুর আশুরার রাতে দেখেন যে, তার পিতা তাকে বলছেন : 'আজ তুমি কোথায় আছ?' হুর জবাব দিলেন : 'ইমাম হোসাইনের সম্মুখে, তাকে বাধা দেবো এবং ইবনে যিয়াদের বাহিনী আসা পর্যন্ত তাকে আটকে রাখব।' তার পিতা তার ওপর রাগান্বিত হলেন এবং বললেন : 'ধিক তোমাকে ! রাসূল (সা.) - এর সন্তানদের সাথে কী করছো? যদি নিজেকে অনন্তকাল দোযখের আগুনে দেখতে চাও তবেই ইমাম হোসাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। তুমি কি কিয়ামত দিবসে মহানবী (সা.), আমীরুল মু'মিনীন (আ.) ও ফাতেমা যাহরার ক্রোধে পতিত হতে চাও এবং তাদের শাফা'আত থেকে বঞ্চিত হতে চাও ?'

আশুরার দিন হুর ওমর ইবনে সা'দের সাথে সাক্ষাৎ করে তার কাছে জানতে চাইলেন : 'তুমি কি হোসাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফলেছো?' ওমর ইবনে সা'দ জবাবে বললো : 'হ্যাঁ। এমনভাবে যুদ্ধ করবো যাতে কমসংখ্যকের মাথা ও হাত কাটতে হয়।' হুর বললেন : 'এটা কি ভালো ছিলোনা যে, তাকে তার ওপর ছেড়ে দেবে, আর তিনি তার পরিবার- পরিজন নিয়ে দূরে যেখানে ইচ্ছা চলে যাবেন?' ওমর ইবনে সাদ বললো : 'যদি ব্যাপারটা আমার হাতে থাকতো তাহলে এমনটিই করতাম। কিন্তু আমীর ওবায়দুল্লাহ এমনটি করার অনুমতি দেননি।'

হুর ওমর ইবনে সা'দ থেকে দূরে সরে গিয়ে একাকী চিন্তায় মগ্ন হলেন। এমন সময় কোররাত ইবনে কাইস রিয়াহী কাছে এলে তাকে উদ্দেশ্য করে হুর বললেন : 'নিজের ঘোড়াকে পানি পান করিয়েছো?'

কোররাত বলে :বুঝতে পারলাম যে, তিনি চাচ্ছিলেন যে, আমি তার নিকটে অবস্থান করি। আর তাই বললাম : 'না, আমার ঘোড়াকে পানি দেইনি।' আমি তাকে রেখে অন্যত্র চলে গেলাম। হঠাৎ

দেখলাম হুর ধীরে ধীরে হোসাইনের দিকে যাচ্ছেন। মুহাজির ইবনে আউস তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল : ‘আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছো? ’হুর নীরব থাকলেন এবং কোনো জবাব দিলেন না। কিন্তু ভীষণ কাপছিলেন। হাজির ইবনে আউস হুরকে বলল : ‘ তোমার আচরণ তো সন্দেহ জনক; আমি তোমাকে কখনোই এমন দেখিনি। যদি আমাকে পূর্বে জিজ্ঞাসা করা হতো কুফার শ্রেষ্ঠ বীর কে ? তবে আমি তোমার নামটিই বলতাম। তাহলে তোমার মধ্যে যে উদ্বেগ আমি দেখতে পাচ্ছি তা কি জন্য ?’

হুর জবাবে বললেন : ‘আল্লাহর শপথ, আমি নিজেকে বেহেশত ও দোযখের মাঝে পরীক্ষা করছি। আল্লাহর শপথ, বেহেশত ব্যতীত অন্য কোনো পথ বেছে নেবো না, এমনকি টুকরা টুকরা হয়ে গেলেও।’ অতঃপর তিনি নিজের ঘোড়াকে দ্রূত ইমাম হোসাইনের দিকে পরিচালনা করলেন। ইমামের নিকটবর্তী হলে নিজের ঢালকে আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত হিসাবে উাল্টো করে ধরলেন এবং ইমাম হোসাইনের সামনে উপস্থিত হয়ে মুখমণ্ডল মাটিতে স্থাপন করলেন।

ইমাম হোসাইন (আ.) তাকে বললেন : ‘মাথা ওপরে তোলো, তুমি কে ? ’হুর বললেন : ‘হে রাসূলের সন্তান! আমি সেই ব্যক্তি যে আপনার পথে বাধ সেধেছিল। আমি আপনাকে নিরাপদ স্থানে যেতে দেই নি। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি যে, আপনার সাথে এরূপ আচরণ করা হবে। আমার ধারণা ছিলো আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করা হবে। এখন অনুতাপে দগ্ধ হয়ে আপনার দিকে ফিরে এসেছি; আমার তাওবা কি কবুল হয়েছে ? ’ইমাম জবাব দিলেন : ‘হে, মহান আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করেছেন। ’হুর তৃপ্ত হৃদয়ে ইমাম হোসাইনের নিকট প্রার্থনা করলেন : ‘আমাকে অনুমতি দিন যাতে আমি আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রথম ব্যক্তি হতে পারি।’

ইমাম হোসাইন (আ.) তার কাল্যাণার্থে দোয়া করলেন। অতঃপর হুর ইবনে যিয়াদের সৈন্যদের নিকট গিয়ে তাদেরকে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাতে তারা কর্ণপাত না করে তার দিকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। হুর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) হুরের রক্তাক্ত নিথর দেহের পাশে গিয়ে বললেন : ‘তুমি সত্যিই হুর

(মুক্ত) যেমনটি তোমার মাতা তোমার নামকরণ করেছেন। তুমি দুনিয়াতে, আর আখেরাতে সৌভাগ্যবান।'

এ মহান ত্যাগী বীরের সমাধিস্থল বর্তমান কারবালা থেকে পশ্চিমে সাত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তার সমাধির ওপর একটি স্থাপনা আছে যা সুন্দর কারুকার্য খচিত। কথিত আছে, হুরের আত্মীয়- স্বজনদের মধ্যে তামিম গোত্রের একদল ব্যক্তি আশুরার ঘটনার পর তার দেহ এ স্থানে এনে দাফন করেন।

শাহ ইসমাইল (আয়াতুল্লাহ হায়েরীর বর্ণনামতে শাহ আব্বাস) ইরাক দখল করার পর কারবালায় এসে ছিলেন। তিনি হুরের মর্যাদা ও মাযার সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। সত্য উদঘাটনের জন্য তিনি হুরের কবর খননের নির্দেশ দেন। কবর খননের পর তিনি হুরের দেহকে রক্তাক্ত পোশাকসহ দেখতে পান। তারা তার জখমগুলোকে তাজা দেখতে পান। তার মাথায় তরবারির আঘাতে সৃষ্ট জখম দেখতে পান যা এক টুকরা কাপর দিয়ে বাধা ছিল। শাহ এ কাপড় খুলে অন্য কাপড দিয়ে জখমটি বাধার নির্দেশ দিলে তা খোলা মাত্র ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। ফলে পুনরায় তা বেধে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয় এবং তাবাররুক হিসাবে শাহ সে কাপড়ের টুকরা থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ কেটে নেন। অতঃপর শাহ হুরের সমাধিকে পুনরায় আকর্ষণীয় রূপে তৈরী করার নির্দেশ দেন। দায়েরাতুল মা:সূত্র]'য়ারেফে তাশাইয়্যু, ৬ষ্ঠ খণ্ড [

সংকলনে : মোঃ মাঈন উদ্দিন

আরশে আযীম ছুয়ে যায়

(মুহররম উপলক্ষে মুহতাশিমের বারো স্তবক)

ভাষান্তর

মুহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

কাব্যরূপ ও সম্পাদনা

আবদুল মুকীত চৌধুরী

ভূমিকা

মার্সিয়া খানির জনক ইরানী সংগীত শিল্পী কামালুদ্দীন আলী মুহতাশিম কাশানী, যার উপাধি 'শামসুশ শোয়ারা (কবিদের সূর্য) কাশানী', দশম হিজরী শতাব্দীর সূচনালগ্নে পৃথিবীতে পদার্পণ করেছিলেন এবং ৯৯৬ হিজরীতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে ছিলেন। তিনি সাফাভীদের সমকালীন ছিলেন। মার্সিয়া গাওয়ার পূর্বে তিনি বাদশাহদের প্রশংসা- গীতি গাইতেন। কিন্তু শীয়া সাফাভী বাদশারা যেহেতু দ্বীনদারী ও দ্বীনের ইমামগণের স্মরণের প্রতি গুরুত্ব দিতেন, সেহেতু তারা চাইলেন বাদশাহদের গুণগান থেকে কবিদেরকে দূরে সরিয়ে শীয়াদের ইমামগণের ফযিলত ও মানাকিব বর্ণনায় আগ্রহী করতে। মুহতাশিম কাশানী ছিলেন সেই সব কবির একজন যারা সাফাভীদের এক দ্বীনদার বাদশাহ শাহ তাহামাসেবের পরামর্শে ধর্মীয় কবিতার দিকে ফিরে ছিলেন এবং শীয়া ইমামগণের কষ্ট- ক্লেশের কথা বর্ণনা করতেন। তার কবিতাগুলো সাফাভীদের জন্য আদর্শিক ছিল।

মুহতাশিম কিছুকাল পর সমসাময়িক বিখ্যাত কবিদের মধ্যে স্থান লাভ করেছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস ও শীয়ায়ী অনুভূতির কারণে সম্পূর্ণ নতুন ও অদ্বিতীয় ধর্মীয় কবিতা ও আহলে বাইতের মাসায়েব (আহলে বাইতের দুঃখ- কষ্ট সম্পর্কে আবেগময় বর্ণনা) বর্ণনায় মশগুল হলেন। মুহতাশিম পরে ধর্মীয় কবিতা ও পবিত্র ইমামগণের মাসায়েবের দিক থেকে ইরানের অন্যতম কবিতে পরিণত হয়েছিলেন এবং তার কবিতা সমস্ত ইরানে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। তাকে

মার্সিয়া খনির জনক বলা যেতে পারে, যিনি প্রথম বারের মতো ধর্মীয় কবিতার এক নতুন দিকের সূচনা করেছিলেন।

এ কারনেই মুহতাশিম কাশানী, শীয়া কবি ও ইমাম পরিবারের প্রশস্তি গানকারী কবিদের মধ্যে খ্যাতিমান 'আশুরায়ী কবি' বলে পরিগণিত। নিঃসন্দেহে মুহররম মুহতাশিম কাশানীর নামের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। তিনি 'দাওয়াযদাহ' (অর্থাৎ বারো স্তবক) নামে কারবালার শহীদগণের ওপর কবিতা রচনা করে মার্সিয়া খানিতে সুউচ্চ স্থান লাভ করেছিলেন। তার এ মহান কাব্যের প্রথম পংতিমালা ছিল :

'গোটা দুনিয়ার সৃষ্টিলোকে এ কোন ফরিয়াদ জাগেলো ফের

এ কোন শোক- মাতম ওঠে, হায় নওহার করুণ রবের!

শিলালিপিতে এ প্রশস্তি- গীতির পংতিগুলো এবং লাল- কালো পতাকাগুলো ইরান ও অন্যান্য দেশে মসজিদ ও হোসাইনিয়াসমূহকে আশুরার পরিবেশ দান করে।

এ মহান কবি আমাদের জন্য তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শনীমূলক কাব্যগ্রন্থ স্মৃতি হিসাবে রেখে গেছেন এবং কবিতার ভাষায় আশুরার সংস্কৃতিকে মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে আহলে বাইতের গুণগানকারীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এ প্রখ্যাত কবি ও স্বনামধন্য মার্সিয়া গায়কের ইমাম হোসাইন (আ.) ও কারবালার শহীদানের ওপর গাওয়া প্রশস্তিগুলো শীয়া ও বিশেষ করে ফার্সী ভাষাভাষিদের মুখে মুখে রয়েছে এবং অনেক কবির আকর্ষণ করেছে। মুহতাশিমের পরবর্তী অনেক কবিই তাদের নওহা ও কবিতায় তার থেকেই উপকৃত হয়েছেন।

বিষয়বস্তুর গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং কারবালার ঘটনার মর্মস্পর্শী বর্ণনাই গুরুত্বের কারণে ঢাকাস্থ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান কালচারাল সেন্টার আহলে বাইত ও ইমাম হোসাইন (আ.) - এর ভক্তদের জন্য মুহতাশিমের বারো স্তবক- এর অনুবাদ পেশ করছে।

এক.

গোটা দুনিয়ার সৃষ্টিলোকে এ কোন ফরিয়াদ জাগেলো ফের

এ কোন শোক- মাতম ওঠে, হায়, নওহার করুণ রবের!

জমীন ফুড়ে আবার এ কোন মহা কিয়ামত এলো, হায়!

সিঙ্গার ফুক ছাড়াই যে আরশে আযীম ছুয়ে যায়!

কোথা থেকে জাগলো আবার এ বিষণ্ন স্নান সকাল,

যার আলোকে জগতবাসী হলো রে সব ব্যাকুল হাল!

পশ্চিম আকাশ ভেদ করে ঐ ওঠে রাঙা অরুণ

আকাশ মাটির অণুতে বয় দীল বেকারার শোক- আগুন।

যদি বলি রোজ কিয়ামত পৃথিবীতে, নয় রঞ্জন

সর্বব্যাপী উত্থান পুন, এর নাম যে মুহররম।

পবিত্রতার দরবারে এ বিষাদের ঠাই নেই!

পবিত্র সে শিইসমূহ শোকাতুর ওরুতে সেই।

জীন ও ফেরেশতা পড়ে ঐ নওহা মানুষের তরে,

বনী আদম ভেসে চলে শোকের অশ্রু- সাগরে।

আকাশ –মাটির সূর্য তিনি, পূব ও পশ্চিমের আলো

রাসূলেরই কোল থেকে সেই হোসাইনী নূর ছড়ালো।

দুই.

কারবালার মরু ঝড়ে ভেঙ্গে গেছে তরী হায়!

ধুলো মাটি আর রক্তে মিশে পড়ে আছে কারবালায়।

কালের চোখ কেদে যদি সারা হয় জন্য তার

রক্ত স্রোত উপচে যেত সে অলিন্দে কারবালার।

গোলাপজল করেনি গ্রহণ কারবালার বাগিচায়

যা নিয়েছে কাল, সে তো অশ্রুঝরা, হায়!

পানিও দিতে হয়নি রাজি হায় রে কুফার জনগণ

কারবালার মেহমানদের এ কেমনে রে আপ্যায়ন!

শয়তান আর বুনো পশু- তাদেরও তা নেই বারণ,

বিদায় নেন শুধু শাহে কারবালা হোসাইন পানি বিহন।

পিপাসু সে কান্নার রোল ওঠে আকাশের দিকে

'বুক ফেটে যায় দাও পানি' রব মরু কারবালা থেকে।

হায় রে এ কোন দৃশ্য দেখি, শরম পায়নি এ দুশমন

হোসাইনের খীমা ধ্বংস করতে চালায় ঘৃণ্য আক্রমণ!

আকাশের বুক সেদিন ছিল ভারী বেদন- যন্ত্রণায়

দুশমন ভয়ে ওঠে ফরিয়াদ হেরেমে খীমায়।

তিন.

ইস ! যদি ভেঙে পড়তো আকাশ সে ক্ষণ

মূল খুটি পড়ে গলে হয় সে যেমন!

ইস! যদি পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে যত বয়ে

কালো বান্যার ঢলে মাটি আলকাতারা সম হয়ে !

ইস! আহলে বাইতের সে বুকফাটা কান্নার তপ্ত নিঃশ্বাস

যার আগুনে হতো জগতের সব শস্য বিনাশ!

ইস! সে মুহূর্তে যখন ঘটলো এ অঘটন

আকাশ মাটির'পর যেন স্থির পারদ তখন !

ইস! মুবারক দেহ তার যখন রাখা হয় মাটির ভেতরে

বের হয়ে যেতো শরীর ছিড়ে প্রাণগুলো বিশ্বচরাচরে!

ইস! যখন নবী- বংশের নীকাখানি ভেঙে যায়

ডুবে যেতো সৃষ্টিজগত রক্তের দরিয়ায়!

প্রতিশোধের কথা থাকতো না যদি রোজ হাশরে

এর বদলা দুনিয়া তখন নিত কমন করে ?

আলে নবী বিচারের ফরিয়াদ জানাবেন যখন

আরশের ভিত কেপে কেপে টলমল তখন।

চার.

শোক- মজলিসে দস্তরখানে যখন জগতবাসীকে আহ্বান জানায়

সর্বপ্রথম আম্বিয়াকুলের কাছে সে দাওয়াত পৌছায়।

ওলীর পালা আসে যখন আসমান হয় কম্পমান

শেরে খোদার মাথায় যখন আঘাত হানে ঐ কৃপাণ।

স্বয়ং জিবরীল আমীন ছিলেন খাদেম যে দরোজার

সে দরোজা দিয়ে জালিম ভাঙে পাজর খায়রুন্নেসার।

যে হেরেমে ছিল না ফেরেশতারও প্রবেশের অনুমতি,

উপড়ে তাদের মদীনা থেকে কারবালায় আনে দুর্মতি।

মরুর বুকে কুফাবাসীর কুঠার আঘাতে

কাটা পড়ে আলে কেসার খেজুর বক্ষ তাতে।

প্রচণ্ড আঘাত সে বিদীর্ণ করে কলিজা মুস্তফার।

নেমে আসে গলার ওপর বংশধরের মুর্তজার।

কাপড় ছিড়ে আর চুল ছড়িয়ে হেরেমের বিবিরা সব

মহন খোদার দরবারে জোর ফরিয়াদ তোলে, ইয়া রব!

ধিকিধিকি বহ্নমান তাদের দহন

সে আগুনে হাসান মুজতবা অঙ্গার হন।

শোকে মুহ্যমান হাটুতে মাথা গুজে মুখ আড়াল

আধার নামে সূর্যগ্রহণ দেখে এ দৃশ্য ভয়াল!

পাঁচ.

তার শুষ্ক কণ্ঠের রক্ত মাটিতে পড়ে যখন

ফুটন্ত বুদবুদ হয়ে আরশ পানে ধায় তখন।

হায় হায় ঈমানের ঘর এই বুঝি ধ্বংস হয়!

দীনের প্রাণ স্তম্ভসমূহ কতো আর আঘাত সয়?

দীঘল দহী বৃক্ষ করে ভূপাতিত কী পাষণ্ড তায়!

মাটির ধূলি ঊর্ধ্বমুখী ছাটে ঝড়ো হাওয়ায়,

বাতাসে মিশে সে ধূলি পৌছে নবীজীর মাযার

দেয় সাত আকাশে উড়াল মদীনা ঘুরে এবার।

ঊর্ধ্বলোকে ঈসার কাছে যখন শোকে র এ খবর পৌছায়ঁ

শোকের কালো পাশোক তিনি পরতে চান তার গায়।

শোক- মাতম আর রানাজারি চলে আসমানে সারা

বুক ফাটিয়ে কাঁদেন এবার জিবরীল ও ফেরেশতারা।

সে ধুলি এবার স্রষ্টা খোদার দামনে আযীম ছোয়

এসব কল্পনার কথা, ভ্রান্তি বৈ আর কিছু তো নয়।

যদিও পুত- পবিত্র খোদা সব আবেগের ঊর্ধ্বে শান

অন্তরে আসীন তিনি, বেদনার তো ছোয়া পান।

ছয়.

ভয়, যখন তার খুনীর আমলনামা তুলে ধরা হবে

রহমতের দরোজাখানি সবার পরে বন্ধ হবে তবে।

এমন পাপের পর হাশরের শাফীগণ, ভয়

সৃষ্টির ক্ষমার সুপারিশে তাদের লজ্জায় পড়তে হয়!

খোদায়ী শাস্তির হাত আস্তিন থেকে নমে যায়

যখন আহলে বাইত জালিমের বিরুদ্ধে নালিশ জানায়।

আহ! আলে আলীর রক্ত ঝরা কাফন যখন

উঠবে মাটি থেকে, অগ্নিশিখা পতাকা যেমন!

নবী- বংশের যুবাদের দেখে আকাশভেদী আর্তনাদ ওঠে

ফুলেল কাফনে ঘুরে বেড়ায় যখন রোজ হাশেরের মাঠে।

শাহাদাত প্রেমে ভেঙে পড়ে যাদের সারি কারবালায়

হাশেরের মাঠে অন্য সারি ভেঙ্গে সারিবদ্ধ তারা এগিয়ে যায়।

শিকার নিষিদ্ধ হেরেম শরীফে চালিয়েছে যাতর তলোয়ার

হেরেমের মালিকের কাছে থাকবে তাদের কি আশা আর ?

অতঃপর বর্শাগ্রে তুলে একটি শির, চুল থেকে জিবরীল যার

ধূলোমাটি সালসাবিলের পানিতে করেন পরিস্কার।

সাত.

যেদিন মহান ইমামের শির তোলা হলো বর্শার আগায়

পাহাড়ের পেছনে সূর্য বেরিয়ে এলো খোলা মাথায়।

মহা তরঙ্গ উছলে ওঠে পাহাড় সমান উচু হয়ে

মেঘমালা বৃষ্টি ঝরায় জারেজার কেদে বয়ে।

যেনো ভূমিকম্পে প্রকম্পিত স্থির ভূপৃষ্ঠ গোটা জমীন

যেনো ঘুর্ণায়মান চক্র হলো আবর্তনের গতি- বিহীন।

আরশপাক সে মুহূর্তে কেপে ওঠে, যখন

কালচক্র থেমে যায়, যেন প্রকাশ্য কিয়ামত তখন !

যে খীমাগুলো বাধা ছিল হুরের বেণী দ্বারা

এক মুহূর্তে ধসে পড়ে যেন ভাসমান বুদবুদ তারা।

প্রহরায় ছিলেন রুহুল আমীন জিবরীল যে হাওদার,

তারা আজ সওয়ার; নেই হাওদা ও লাগামধারী, কাফেলার।

হায়! শেষনবীর উম্মত তারা, যারা এ নৃশংসতা ঘটায়।

জিবরীল আমীন হায় রাসূল সকাশে লজ্জা পায়।

রওনা হয় সেনারা যখন কুফা থেকে শাম দেশে

কী নিদারুণ! মনে হয় রোজ কিয়ামত গেছে এসে!

আট.

যাত্রা পথে কাফেলা যখন ময়দান অতিক্রম করে

অবাক বিষাদের করুণ বেদনা সবাইকে ঘিরে ঘিরে।

নওহার করুণ সুরধ্বনি ষড় দিক পানে ছড়িয়ে যায়

সাত আকাশের ফেরেশতাকুল তাদের কাদনে সুর মেলায়।

বনের হরিণ চমকে ওঠে পথ চলা তার থমকে যায়

নীড় ছেড়ে ছিটকে পড়ে আকাশের যত পাখি, হায়!

আতঙ্কে স্তব্ধ সব, কিয়ামতের উৎকণ্ঠা হার মানায়

শহীদের লাশে নজর পড়ে যখন আলে নবীর, হায়!

শহীদানের লাশের উপর যতই ঘটে দৃষ্টিপাত

গভীর ক্ষত- বিক্ষত লাশে তলোয়ার ও বর্শার আঘাত।

হটাৎ দৃষ্টি পড়ে লাশের মাঝে ফাতেমা তনয়ার

শায়িত পবিত্র দেহের ওপর, ইমামে জামানার ;

চিৎকার করে বলে ওঠে, হায় হুসাইন! বুক ফাটায়,

ফরিয়াদ শুনে যেন আগুন লেগে যায় এ দুনিয়ায় !

সইতে না পেরে নালিশ করে রাসূলের টুকরো কলিজার

মদীনা পানে মুখ করে বলে, দেখো রাসূল, নানা আমার !

নয়.

মরুর বুকে পড়ে থাকা এ লাশ নানা, তোমারই হোসাইন,

হস্ত- পদ রক্তে রঙিন এ শিকার, তোমারই হোসাইন।

তাজা এ খেজুর বৃক্ষ পিপাসার আগুন জ্বালায়

ধোয়া তুলে মাটি থেকে আকাশ পানে, তোমারই হোসাইন।

লোহু দরিয়ায় ডুবে গেছে যে মাছ, কে সে বলো দেখি?

যার শরীরে ক্ষতসংখ্যা তারারও বেশি, তোমারই হোসাইন

শাহাদাতের পরিমণ্ডলে নিমজ্জিত এই যে, যার

রক্তে ঢলে মরু রঙিন, তোমারই হোসাইন

ফোরাতের কুল ছেড়ে দূরে পড়ে রয়েছে শুষ্ককণ্ঠী,

যার রক্তস্রোতে বইছে জইহুন নদী, তোমারই হোসাইন।

স্বল্প সেনার সেনাপতি, অজস্র অশ্রু আর আর্তনাদে

খীমা গেড়েছেন জগতের বাইরে, তোমারই হোসাইন

মাটির ওপর পড়ে যার বইছে হৃদ- স্পন্দন ধিকি- ধিকি,

শহীদ- নেতা যার হয়নি দাফন, তোমারই হোসাইন।

বাকী'র দিকে মুখ ফিরিয়ে ডেকে বলেন মা ফাতেময়

মাটির জন্তু ও আকাশের পাখির কলিজা কাবাব শুনে তায়।

দশ .

ভগ্ন হৃদয়ের সান্তনা চেয়ে দেখো মা গো আমাদের হাল

আমরা কতো ভিনদেশী আর পরিচয়হীন দেখো একবার!

তোমার আওলাদ, যার শাফায়াতকারী ময়দানে হাশর

বিচারের ভার নিয়েছে দেখো জালিম বর্বর।

চির জগতের বাসিন্দা হে! দ্বি- জাগতিক পর্দা সরাও

বিপদ ভরা জগতে আমরা কী বিপন্ন ফিরে তাকাও।

না না, এ যেনো ক্ষিপ্র বর্ষণশীল মেঘ আকাশে কারবালার

দেখো সে ফেতনার বান, বিধ্বংসী বিপদের তরঙ্গ আর।

রক্ত মাটিতে শহীদানের লাশ হয়েছে একাকার
শির সব দেখো বর্শার ওপর- যারা ছিলো সরওয়ার।
যার মাথা থাকতো সারাক্ষণ রাসূলে কাধে, হায়!
তাকে দেখে বিচ্ছিন্ন কেমন শক্রুর বর্শার ডগায়!
যার দেহ পালিত হয় স্নেহের আচলে তোমার
ধুলো মাটিতে মলিন হলো দেখো ময়দানে কারবালার।
হে রাসূলের দেহের টুকরো! ইবনে যিয়াদের চাও বিচার
আহলে বাইতের রেসালাতের যে করেছে ধ্বংস- সার।

এগারো.

নীরব থাকো হে মুহতাশিম! পানি হলো পাথরের অন্তর
ধৈর্যের বাধ আর শক্তির ভিত আজ যে গেছে ধসে ওর
নীরব থাকো হে মুহতাশিম! এসব মর্মবিদারী কথায়
শূন্যের পাখি ও সাগরের মাছ, কলিজা কাবাব, এ ব্যথায়।
নীরব থাকো হে মুহতাশিম! শোক- গাথা কত শোনাবে আর
শ্রোতাদের চোখ ফেটে দেখো বইছে কত রক্তধার
নীরব থাকো হে মুহতাশিম!কান্না- ছন্দ বেধো না আর
জমিনের বুক রক্তধারায় জ্বলে পুড়ে হয় ছার- খার!
নীরব থাকো হে মুহতাশিম! রক্তধারায় কাঁদে আকাশ !
সাগর বুকে হাজারো বুদ্বুদ সে রক্তলাল, দীর্ঘশ্বাস
নীরব থাকো হে মুহতাশিম! সূর্য তোমার দুখ জ্বালায়
চাঁদের মতো শীতল হলো মাতমিয়াদের শোক- ব্যথায়!
নীরব থাকো হে মুহতাশিম! হুসাইন ব্যথা বলো না আর
রাসূলের সামনে জিবরীলের মুখ নেই যে দেখাবার

নীচ দুনিয়া আয়ুষ্কালে করেনি এমন অবিচার
এরূপ জুলুম করেনি কখনো কোনো সৃষ্টির ওপরে আর !

বার.

হে দুনিয়া! তুই জানিস না করেছিস কী অবিচার
আর হিংসা থেকে জন্ম দিয়েছিস অন্যায় কতো অত্যাচার !
তাকে ভর্ৎসনায় যথেষ্ট এই :আলে রাসূলের ওপর
করলো জুলুম দুশমন, তুই হয়েছিস তার দোসর ;
নমরুদও যা করেনি কোনোদিন হায় রে ইবনে যিয়াদ!
তুই করেছিস তারো বেশি, পাষণ্ড তুইরে শাদ্দাদ।
ইয়াযীদের মন তুষ্ট করলি হোসাইনের প্রাণ কেড়ে
ভাবিস একবার কাকে খুশি করলি কাকে খুন করে ?
তোর এ পাপ বৃক্ষের ফল শুধু দুর্ভোগ- দুর্দশার
দীনের পবিত্র ফুল ও ফলে হানলি তুই কী ধ্বংস- সার!
দীনের চরম দুশমনদের প্রতিও করা হয় না যা
মুস্তফা, হায়দার ও বংশের প্রতি তুই করলি তা
স্বয়ং নবী লাল ঠোঁটে করতেন চুম্বন যে গলায়
জালেম, তুই চালিয়ে দিলি নির্দয় খঞ্জর তায়!
ভয়ে মরি যখন তাকে হাজির করা হবে ময়দানে হাশর
অন্ধকারে ডুবে যাবে তা আগুনের ধোয়ায় তোর।

‘প্রতিটি দিন আশুরা প্রতিটি ময়দানই কারবালা।’
ইমাম জাফর সাদেক (আ.)

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আন্দোলন পর্যালোচনা

হোসাইনী আন্দোলনের প্রচার পদ্ধতিসমূহ

আয়াতুল্লাহ শহীদ মুর্তাজা মোতাহারী

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কালজয়ী বিপ্লবে যে প্রচার পদ্ধতি অনুসরণ করেন তার গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য প্রথমে ভূমিকা স্বরূপ কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

ইসলামের ইতিহাসে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)- এর ওফাত ও হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)- এর শাহাদাতের মধ্যে কালগত ব্যবধান পাঁচ দশকের। এ সময়ের মধ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বরং অসাধারণ ঘটনা সংঘটিত হয়। বর্তমান যুগের সমাজতত্ত্বের মূলনীতি সম্পর্কে সচেতন গবেষকগণ এসব ঘটনার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (point) লক্ষ্য করেছেন। বিশেষ করে আব্দুল্লাহ 'আলায়েলী আহলে সুন্নাতের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়টির প্রতি অন্য সকলের চেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আব্দুল্লাহ 'আলায়েলী বলেনঃ সকল আরব গোত্রের (কুরাইশ ও অ- কুরাইশ নির্বিশেষে) বিপরীতে বনি উমাইয়্যা কেবল এক বংশ ভিত্তিক জনগোষ্ঠিমাত্র ছিলো না। বরং তারা ছিলো এমন এক বংশ ভিত্তিক জনগোষ্ঠি যাদের কর্মপদ্ধতি ও কর্মতৎপরতা ছিলো এক রাজনৈতিক দলের কর্মপদ্ধতি ও কর্ম তৎপরতার অনুরূপ। অর্থাৎ তারা এক বিশেষ ধরনের সামাজিক চিন্তাধারা পোষণ করতো যা প্রায় আমাদের যুগের ইয়াহুদীদের অনুরূপ- যারা তাদের গোটা ইতিহাস জুড়ে এমন একটি বংশ ভিত্তিক জনগোষ্ঠি যারা একটি বিশেষ চিন্তা ও বিশেষ মতাদর্শের অধিকারী এবং সে মতাদর্শ ভিত্তিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে যে জনগোষ্ঠির সকল সদস্যের মধ্যে সমন্বয় রয়েছে শুধু তা- ই নয়, বরং এ জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও রয়েছে। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ বনি উমাইয়্যাকে একটি ধুর্ত ও শয়তানী বৈীমষ্ট্যের অধিকারী বংশ ভিত্তিক জনগোষ্ঠি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর বর্তমানে তাদের সম্পর্কে এভাবে উল্লেখ করা হয় যে, বনি উমাইয়্যা হচ্ছে সেই জনগোষ্ঠি, ইসলামের অভ্যুদ্যয়ের কারণে অন্য যে কোনো জনগোষ্ঠির তুলনায় যারা অনেক বেশী বিপদ অনুভব করে এবং ইসলামকে নিজেদের জন্য বিরাট মুছিবত বলে গণ্য করে। এ কারণে

তারা সর্বশক্তিতে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করে। অতঃপর হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) কর্তৃক মক্কা বিজয়ের সময় তারা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও সংগ্রামে আর কোনোই লাভ হবে না। এ কারণে তারা বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করে। 'আম্মার ইয়াসিরের ভাষায়ঃ .

..مَا اَسْلَمُوا وَ لَكِنْ

"তারা ইসলাম গ্রহণ করে নি, তবে........।

আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ও তাদের সাথে "মুআল্লাফাতু কুলুবিহিম " (অর্থাৎ যাদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে যাকাত থেকে প্রদান করার নিয়ম রয়েছে) নীতি অনুযায়ী আচরণ করতেন। অর্থাৎ তারা এমন লোক যারা বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করেছিলো কিন্তু ইসলাম তাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে নি।

হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) (বনি উমাইয়্যার ইসলাম গ্রহণের পর) যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন বনি উমাইয়্যার ওপর কোনো মৌলিক কাজের দায়িত্বই অর্পণ করেন নি। কিন্তু তার ওফাতের পর ক্রমান্বয়ে বনি উমাইয়্যা ইসলামী প্রশাসনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ও এতে প্রবেশলাভ করে। আর হযরত ওমর বিন খাত্তাবের শাসনামলে যে সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক ও রাজনৈতি ভুল করা হয় তা হচ্ছে, আবু সুফিয়ানের পুত্রদের অন্যতম ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ানকে শামের প্রশাসক (গভর্ণর) নিয়োগ করা হয় এবং তার পরে মু'আবিয়া শামের প্রশাসক হন ও হযরত ওসমানের শাসনামলের শেষ পর্যন্ত বিশবছর যাবত সেখানে রাজত্ব করেন। ফলে সেখানে বনি উমাইয়্যার পা রাখার জন্য একটি জায়গা তৈরী হয়ে যায় এবং তা ছিলো কতই না বড় একটি 'পা রাখার জায়গা'!

এরপর হযরত ওসমান খলীফা হলেন। মনে হচ্ছে, মন- মানসিকতার দিক থেকে বনি উমাইয়্যার অন্যান্য লোকের সাথে তার পার্থক্য ছিলো। তিনি ছিলেন একজন ব্যতিক্রম; আবু সুফিয়ানের মতো ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও উমাইয়্যা বংশের লোক বৈ ছিলেন না। হ্যাঁ, তার যুগে ইসলামী প্রশাসনে বনি উমাইয়্যার ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী পদ, যেমনঃ মিসর, কুফা ও বসরার মতো বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গার প্রাদেশিক হুকুমত বনি উমাইয়্যার

কুক্ষিগত হলো। এমনকি স্বয়ং খলীফা ওসমানের মন্ত্রীর পদও মারওয়ান ইবনে হাকামের হাতে পড়লো। বনি উমাইয়্যার লক্ষ্য হাসিলের পথে এটা ছিলো এক বিরাট পদক্ষেপ। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিশেষ করে শামের আমীর মু'আবিয়া দিনের পর দিন স্বীয় অবস্থা সুদৃঢ় ও সুসংহত করতে লাগলেন।

হযরত ওসমানের শাসনামল পর্যন্ত বনি উমাইয়্যা শুধু দু'টি শক্তির অধিকারী ছিলো। এক ছিলো রাজনৈতিক পদ ও রাজনৈতিক শক্তি, অপর ছিলো বায়তুল মাল তথা আর্থিক শক্তি। হযরত ওসমানের নিহত হওয়ার পর মু'আবিয়া আরো এক শক্তি হস্তগত করলেন। তা হচ্ছে, তিনি নিহত খলীফার মযলুম অবস্থার বিষয়টিকে কাজে লাগাতে লাগলেন। খলীফা ওসমানের মযলুম অবস্থায় নিহত হবার কাহিনী প্রচার করে তিনি বহু জনগোষ্ঠির (অন্ততঃ শামে) ধর্মীয় অনুভূতিকে নিজের পক্ষে টেনে নিতে সক্ষম হন। তিনি বলতেনঃ খলীফাতুল মুসিলমীন, খলীফাতুল ইসলাম মযলুম অবস্থায় নিহত হয়েছেন। আর

(مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً)

"(আল্লাহ বলেনঃ) যে ব্যক্তি মযলুম অবস্থায় নিহত হয় আমরা তার উত্তরাধিকারীকে (প্রতিশোধ গ্রহণের) অধিকার দান করেছি।" অতএব, খলীফার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করা ফরয; এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতেই হবে।"

মু'আবিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের অনুকূলে এভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের- হয়তো বা নিযুত নিযুত সংখ্যক লোকের- সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। আল্লাহই ভালো জানেন মু'আবিয়ার এ প্রচারের ফলে লোকেরা হযরত ওসমানের কবরের ওপর কী পরিমাণ অশ্রুপাত করেছিলো। আর এসব ঘটানো হয় আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (আঃ)- এর খেলাফত কালে।

হযরত আলী (আঃ)- এর শাহাদাতের পর মু'আবিয়া মুসলমানদের ওপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী খলীফা হলেন। ফলে সকল ক্ষমতাই তার হস্তগত হলো। এখানে তার পক্ষে চতুর্থ আরেকটি শক্তিকেও নিজের অনুকূলে কাজে লাগানো সম্ভব হয়। তা হচ্ছে, তিনি দীনী ব্যক্তিবর্গকে (এ যুগের পরিভাষায়, সমকালীন ওলামায়ে কেরামকে) ভাড়া করেন। তখন থেকে

হঠাৎ করেই হযরত ওসমানের প্রশংসায়, এমন কি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের প্রশংসায়ও, মিথ্যা হাদীছ রচনা শুরু হলো। কারণ, মু'আবিয়া তাদের মর্যাদাকে অনেক বেশী উচ্চে তুলে ধরাকে তার নিজের জন্য লাভজনক ও হযরত আলী (আঃ)- এর জন্য ক্ষতিকর মনে করতেন। আর এ কাজের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (আঃ) তার বিভিন্ন উক্তিতে বনি উমাইয়্যা যে ইসলামের জন্য এক বিরাট বিপদ সে কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তার এক ভাষণের শুরুর দিকে খারেজীদের ওপর আলোকপাত করেন এবং তাদের শেষ পরিণতির কথাও উল্লেখ করেন। এরপর তিনি বলেনঃ

فَاَنَا فَقَّأْتُ عَيْنَ الْفِتْنَةِ-

"অতঃপর আমি ফিৎনার চোখ উৎপাটন করলাম।" (নাহজুল বালাগা, ফয়জুল ইসলাম, খোতবাঃ ৯২, পৃষ্ঠাঃ ২৭৩(এরপর সহসাই তিনি তার কথার মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং বলেনঃ .

اَلَا وَ اِنَّ اَخْوَفَ الْفِتَنِ عِنْدِى عَلَيْكُمْ، فِتْنَةُ بَنِى اُمَيَّةَ فَاِنَّهَا فِتْنَةٌ عَمْيَاءٌ مُظْلِمَةٌ

"সাবধান! আমি আমার সামনে তোমাদের জন্য একটি ফিৎনার আগমনের ভয় করছি, তা হচ্ছে বনি উমাইয়্যার ফিৎনা। নিঃসন্দেহে তা হবে ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন সর্বগ্রাসী ফিৎনা।" (প্রাগুক্ত(অর্থাৎ বনি উমাইয়্যার ফিৎনা হবে খারেজীদের ফিৎনার চেয়েও অধিকতর ভয়াবহ।

বনি উমাইয়্যার ফিৎনা সম্পর্কে হযরত আলী (আঃ)- এর অনেক উক্তি রয়েছে। তিনি বনি উমাইয়্যার যে সব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ইসলামের সাম্যনীতি তাদের দ্বারা পুরোপুরি পদদলিত হবে এবং ইসলাম যে সকল মানুষকে মানুষ হিসাবে সমান গণ্য করেছে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে তার আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। তখন লোকেরা কর্তা ও গোলাম- এই দুই ভাগে বিভক্ত হবে এবং তোমরা (জনগণ) কার্যতঃ তাদের গোলামে পরিণত হবে। তার এ ধরনের একটি উক্তিতে তিনি বলেনঃ .

حَتَّى لَا يَكُونَ انْتِصَارُ اَحَدِكُمْ مِنْهُمْ اِلَّا كَانْتِصَارِ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ

"এমনকি তাদের সাথে তোমাদের কারো আচরণই স্বীয় মনিবের সাথে দাসের আচরণের ন্যায় বৈ হবে না।" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ২৭৪(মোদ্দা কথা, তাদের সকলেই হবে মালিক আর তোমরা হবে

তাদের সকলেরই দাস সমতুল্য। এ ব্যাপারে হযরত আলী (আঃ)- এর আরো অনেক উক্তি রয়েছে।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (আঃ)- এর উক্তিতে দ্বিতীয় একটি বিষয় এসেছে ভবিষ্যদ্বাণী আকারে এবং পরে তা বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, তার যুগের পরে সমাজের চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিচিত মহল বিনষ্ট হয়ে যাবে। তিনি বলেনঃ

عَمَّتْ خُطَّتُهَا وَ خُصَّتْ بَلِيَّتُهَا .

"এর মুছিবত হবে সর্বজনীন, তবে এর প্রতি আপতিত হবে শ্রেণী বিশেষের ওপর।" (প্রাগুক্ত(তিনি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেনঃ

وَ اَصَابَ الْبَلَاءُ مَنْ اَبْصَرَ فِيهَا وَ اَخْطَأَ الْبَلَاءُ مَنْ عَمِيَ عَنْهَا

"এই মুছিবত চক্ষুষ্মানদের ওপর আপতিত হবে এবং এ মুছিবতের দ্বারা তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে যারা এ ব্যাপারে অন্ধ।" (প্রাগুক্ত(অর্থাৎ যে কেউই দৃষ্টিশক্তি তথা দূরদৃষ্টির অধিকারী হবে, আজকের পরিভাষায় বলা যায়, যে কেউই চিন্তাশীল বা বুদ্ধিজীবী হবে এ ফিৎনা তাকেই গ্রাস করবে। কারণ, ওরা চায় না সমাজে তীক্ষ্ণদৃষ্টি লোকের অস্তিত্ব থাকুক। আর ইতিহাস সাক্ষ দেয় যে, বনি উমাইয়া দ্বারা ঐ যুগের বুদ্ধিজীবি ও দূরদর্শীদেরকে ঠিক পাখী যেমন খাদ্যদানা গুলোকে এক এক করে জমা করে, তেমনি করে তাদেরকে জমা করতো এবং গর্দান দিত। আর এভাবে তারা কি নৃশংসতাই না চালিয়েছে!

তৃতীয় বিষয়টি হলো ঐশ্বরিক মর্যাদা সমূহকে ক্ষুন্ন করা।

لَا يَدْعُوا لِلّٰهِ مُحَرَّماً اِلَّا اسْتَحْلُوهُ وَلَا عَقْداً اِلَّا حَلُّوهُ

অর্থাৎ, আর কোনো হারাম বাকী থাকবে না যা তারা করবে না আর ইসলামের আর কোনো বন্ধন বাকী থাকবে না যা তারা তুলে ফেলবে না। নাহজুল বালাগা), ফয়জুল ইসলাম, খোতবা নং ৯৭, পৃষ্ঠা নং ২৯০(চতুর্থ কথাটি হলো ঘটনার এখানেই শেষ নয়। বরং প্রকাশ্যে কার্যত : তারা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে। আর যাতে জনগণকে উল্টিয়ে ফলতে পারে এজন্য ইসলামকেই উল্টিয়ে দেয়।

لُبِسَ الْاِسْلَامُ لُبْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوباً

অর্থাৎ, ইসলামকে জনগণের শরীরে এমন ভাবে পরিয়ে দিল যেভাবে পশমী পোশাককে উল্টিয়ে পরানো হয়। নাহজুল বালাগা), ফয়জুল ইসলাম, খোতবা নং ১০৭ পৃষ্ঠা নং ৩২৪(

পশমী কাপড়ের বৈশিষ্ট্য হলো এটা গরম করে এবং এর পশমের মধ্যে সৌন্দর্যময় বৈচিত্র বাহার থাকে। আর সেটা তখনই প্রকাশ পায় যখন সেটা ঠিকভাবে পরিধান করা হবে। কিন্তু এটাকে যদি উল্টিয়ে পরা হয় তাহলে এতে তো কোনো গরম উৎপাদন হবেই না; উপরন্তু এমন এক ভয়াল আতঙ্কজনক দৃশ্যের অবতারণা করবে যা ঠাট্টা বিদ্রুপেরও খোরাক যোগাবে বটে। আলী (আঃ) যখন শহীদ হয়ে গেলেন তখন মুআবিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী যে নিহত হওয়ার মাধ্যমে আলীর সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যাবে এর বিপরীতে বরং তিনি একটি প্রতীক হিসাবে সমাজে জীবিত হলেন। যদিও একজন ব্যক্তি হিসাবে তিনি নিহত হয়েছেন। অর্থাৎ আলীর চিন্তাধারা তার মৃত্যুর পরে আরো বেশী বিস্তার লাভ করে। এরপরে শিয়ারা উমাইয়্যা দলের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হলো। ফলে চিন্তা চেতনায় ঐক্যতান সৃষ্টি হলো এবং মূলতঃ তখন থেকেই আলী (আঃ) এর শিয়ারা একটি সম্প্রদায় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

মুআবিয়া নিজ শাসনামলে আলীর চিন্তার সাথে বহু লড়াই চালিয়ে যান। মেম্বারের উপরে বসে আলী (আঃ) এর বিরুদ্ধে গালিগালাজ ও অভিশাপ বর্ষণ করা হতো। রাষ্ট্রীয় ভাবে অধ্যাদেশ জারী করা হয়েছিল যেন ইসলামী সম্রাজ্যের সর্বত্র মসজিদে মসজিদে জুমআর নামাজের মধ্যে আলীকে অভিসম্পাত করা হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে আলী (আঃ) একটি শক্তি ও প্রতীক হিসাবে মানুষের আত্মার মধ্যে চিন্তা ও বিশ্বাস হিসাবে জীবিত ছিলেন। একারণে, মুআবিয়া এর বিরুদ্ধে নানা অপরাধ সংঘটিত করে, কাউকে বিষক্রিয়ায় হত্যা করে, কারো শিরোচ্ছেদ করে কাটা শির বর্শার মাথায় তোলে ইত্যাদি। এগুলো তো ছিলই উপরুন্তু মুআবিয়া জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্য বাহ্যিক বেশভূষায় কিছুটা মেনে চলতো। কিন্তু ইয়াযীদের সময় আসার সাথে সাথে সম্পূর্ণ রূপে মুখোশ খুলে পড়ে যায়। তাছাড়া অদক্ষ ইয়াযীদ এতদিনের উমাইয়া রাজনীতিকেও বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। বরং সে এমন কিছু করে যাতে উমাইয়াদের গোপনীয়তার পর্দা বিদীর্ণ হয়ে যায়। আর এমনই পরিস্থিতিতে ইমাম হোসাইন (আঃ) স্বীয় আন্দোলনের সূচনা করেন।

এবার ইমামের এ আন্দোলন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। পবিত্র কোরআনের আয়াত মালার এক বৈশিষ্ট্য হলো বিচিত্র ধরনের সুর ধারণের ক্ষমতা। ভাষাগত বিশুদ্ধতা ও প্রঞ্জলতা ছাড়াও সূর ধারণ করার এই অভাবনীয় ক্ষমতার কারণে কোরআনের আয়াতসমুহ অনায়াসে অন্তরে অন্তরে জায়গা করে নেয়ার একটি অন্যতম কারণ হয়েছে। তদ্রুপ মানুষ যখন আশুরার ঘটনার ইতিহাসকে দেখে তখন তার দ্বারা 'শাবিহ' তৈরী করার উপযোগীতা খুজে পায়। কোরআন যেমন সূর ধারণের জন্যে তৈরী হয়নি কিন্তু এরূপ আছে তেমনি কারবালার ঘটনাও শাবিহ তৈরীর জন্য সংঘটিত হয়নি, তবে এরূপ আছে।

জানি না, হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) হয়তো এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। অব বিষয়টা আমরা সঠিক বলেও রায় দিচ্ছি না, আবার প্রত্যাখ্যানও করছি না। কারবালার কাহিনী এখন থেকে বারোশ' বছর আগে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এমন এক সময় তা লিপিবদ্ধ করা হয় যখন কারো পক্ষে ধারণা করা সম্ভব ছিলো না যে, এ কাহিনী এত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবে। এ ঘটনার ইতিহাস মূলতঃ এক নাটক আকারে লিখিত হয়েছিলো বলে মনে হয়; নাটকের সাথে এর খুবই মিল লক্ষ্য করা যায়। মনে হচ্ছে যেন কেউ তা মঞ্চায়নের উপযোগী করে লেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমরা ইতিহাসে অনেক মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনা লক্ষ্য করি, কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এ ঘটনা যে ধরনের তা কি ঘটনাক্রমে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হওয়া সম্ভব? হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) কি বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেন নি? জানি না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমনটাই ঘটলো এবং বিশ্বাস করতে পারছি না যে, তা ইচ্ছাকৃত নয়।

হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)- এর নিকট ইয়াযীদের অনুকূলে বাই'আত দাবী করা হয়। এর তিনদিন পর তিনি মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হন, তথা পারিভাষিক দৃষ্টিতে, হিজরত করেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার হারামে- আল্লাহ যাকে নিরাপদ ঘোষণা করেছেন, সেখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং স্বীয় তৎপরতা শুরু করেন। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তিনি মক্কা গেলেন? তিনি কি এ কারণে মক্কা গিয়েছিলেন যে, মক্কা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিরাপদ ঘোষিত হেরেম শরীফ? তিনি কি বিশ্বাস করতেন যে, বনি উমাইয়্যা মক্কার প্রতি সম্মান দেখাবে? অর্থাৎ তিনি

কি বনি উমাইয়্যা সম্বন্ধে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, তাদের রাজনীতির দাবী যদি এই হয় যে, তারা তাকে হত্যা করবে তথাপি তারা মক্কার সম্মানার্থে এ কাজ থেকে বিরত থাকবে? নাকি অন্য কিছু ?

প্রকৃতপক্ষে হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)- এর মদীনা থেকে মক্কায় হিজরতের পিছনে প্রথমতঃ উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, স্বয়ং এই হিজরতই ছিলো বনি উমাইয়্যার সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তিনি যদি মদীনায় থেকে যেতেন এবং বলতেন যে, আমি বাই'আত হবো না, তাহলে তার এ প্রতিবাদী কণ্ঠ ইসলামী বিশ্বে অতখানি পৌঁছতো না। এ কারণে তিনি একদিকে যেমন ঘোষণা করেন যে, আমি বাই'আত হবো না, অন্য দিকে প্রতিবাদ স্বরূপ আহলে বাইতকে নিয়ে মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং মক্কায় চলে আসেন। এর ফলে তার কণ্ঠ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সবাই বুঝতে পারে যে, হোসাইন বিন আলী (আঃ) বাই'আত হতে রাযী হননি এবং এ কারণে তিনি মদীনা থেকে মক্কায় চলে গেছেন। আমাদের এ ধারণা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে তার এ পদক্ষেপ ছিলো জনগণের নিকট স্বীয় লক্ষ্য ও বাণীকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে এক ধরনের প্রচারমূলক পদক্ষেপ।

এর চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) ৩রা শা'বান মক্কা শরীফে প্রবেশ করেন। এরপর তিনি পুরো শা'বান, রামাযান, শাওয়াল ও যিলক্বাদ মাস এবং যিলহজ্ব মাসের আট তারিখ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। অর্থাৎ যে দিনগুলোতে ওমরা করা মুস্তাহাব এবং যখন চারদিক থেকে লোকেরা মক্কায় ছুটে আসে তখন তিনি সেখানেই অবস্থান করলেন। এরপর হজ্বের দিনগুলো এসে গেলো এবং শুধু চারদিক ও আশপাশ থেকেই নয়, এমনকি খোরাসানের মতো তৎকালীন ইসলামী জাহানের দূরতম প্রান্তবর্তী ভূখণ্ড থেকেও লোকেরা মক্কায় ছুটে এলো। এরপর এলো ৮ যিলহজ্ব- যেদিন লোকেরা হজ্বের উদ্দেশ্যে নতুন ইহরাম পরিধান করে অর্থাৎ আরাফাত ও মিনায় যাবার জন্য তথা হজ্ব সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হয়। তখন সহসাই ইমাম হোসাইন (আঃ) ঘোষণা করেনঃ আমি ইরাকের দিকে যাবো, আমি কুফার দিকে যাবো। অর্থাৎ এমনি এক সময় ও পরিস্থিতিতে তিনি কা'বার দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন

করেন, হজ্বের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। অর্থাৎ এভাবে তিনি প্রতিবাদ জানান। তিনি এভাবেই, এ পন্থায়ই প্রতিবাদ, সমালোচনা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, কা'বা তো এখন বনি উমাইয়্যার কুক্ষিগত; যে হজ্ব পরিচালিত হবে ইয়াযীদের দ্বারা মুসলমানদের জন্য সে হজ্ব অর্থহীন।

এমন একটি দিনে কা'বা ও হজ্বের অনুষ্ঠানাদির প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন এবং ঘোষণা দান যে, আমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জিহাদের দিকে মুখ ফিরাচ্ছি ও হজ্বের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছি, আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি 'আনিল মুনকার (ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ)- এর দিকে অগ্রসর হচ্ছি ও হজ্বের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছি- এর তাৎপর্য সীমাহীন; এটা কোনো ছোটোখাটো ব্যাপার ছিলো না। এখানে এসে তার পদক্ষেপের প্রচারমূলক গুরুত্ব এবং কাজের পদ্ধতি তুঙ্গে উপনীত হয়।

এ পর্যায়ে এসে ইমাম হোসাইন (আঃ) এমন এক সফরের সিদ্ধান্ত নেন যাকে ' বুদ্ধিমান' লোকেরা (অর্থাৎ যারা সব কিছুকেই পার্থিব স্বার্থের মানদণ্ডে বিচার করেন) হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)- এর জন্য ব্যর্থতা ডেকে আনবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। অর্থাৎ তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তিনি এ সফরে নিহত হবেন। আর হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাদের এ ভবিষ্যদ্বাণীকে সঠিক বলে স্বীকার করেন। তিনি বলেনঃ আমি নিজেও এটা জানি।

তার এ কথার পরে তারা বলেনঃ তাহলে নারী ও শিশুদেরকে কেন সাথে নিয়ে যাচ্ছেন ?

তিনি বললেনঃ তাদেরকেও সাথে নিয়ে যেতে হবে।

বস্তুতঃ ইমাম হোসাইন (আঃ)- এর আহলে বাইত কারবালার মঞ্চে উপস্থিত থাকায় সে মঞ্চ হয়ে ওঠে অধিকতর উত্তপ্ত, অধিকতর মর্মান্তিক। প্রকৃতপক্ষে ইমাম হোসাইন (আঃ) এমন একদল মুবাল্লিগ (প্রচারক)কে সাথে নিয়ে যান তার শাহাদাতের পরে যাদেরকে দুশমনের হুকুমতের হৃদপিণ্ডে অর্থাৎ শামে পৌঁছে দেয়া হয়। আসলে এটা ছিলো এক বিস্ময়কর কৌশল ও একটি অসাধারণ কাজ। এর উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, কণ্ঠস্বর যেন যত বেশী সম্ভব বিশ্বের বিভিন্ন পৌঁছে যায়, বিশেষ করে যেন তৎকালীন ইসলামী জাহানের সর্বত্র পৌঁছে যায় এবং ইতিহাসের অনেক

বেশী দিককে ও কালের অনেক দিককে উন্মুক্ত করে দেয়, আর এর পথে যেন কোনোরূপ বাধাবিঘ্ন না থাকে।

হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) পথিমধ্যে যে সব কাজ সম্পাদন করেন তাতেও ইসলামের প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হয়। এতে ইসলামের মহানুভবতা ও মানবতা এবং ইসলামের চেতনা ও সত্যতা প্রকাশিত হয়। এর প্রতিটিরই নিজস্ব গুণ রয়েছে। এটা কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। চলার পথে একটি মনযিলে উপনীত হবার পর তিনি বেশী করে পানি নেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি বলেনঃ যত মশক আছে তার সবগুলোই পূর্ণ করে নাও এবং লাগাম হাতে ধরে পায়ে হেটে তোমাদের বাহনগুলোকে এগিয়ে নাও এবং তাদের পিঠে পানি তুলে নাও। বস্তুতঃ এ ছিলো এক ভবিষ্যদ্বাণী। চলার পথে হঠাৎ ইমামের জনৈক অনুসারী চীৎকার দিয়ে বললেনঃ "লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।" অথবা বললেনঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" অথবা "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন।" মনে হলো তিনি যেন উচ্চৈঃস্বরে যিকর করছেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কী? তিনি বললেন, আমি এ ভূখণ্ডের সাথে ভালোভাবে পরিচিত। এটা এমন একটি ভূখণ্ড যেখানে কোনো খেজুর বাগান নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন দূরে খেজুর বাগান দেখা যাচ্ছে ; খেজুর গাছের ডাগরের মতো চোখে পড়ছে। লোকেরা বললো, খুব ভালো করে দেখো।" যাদের দৃষ্টি শক্তি অনেক বেশী প্রখর তারা ভালো করে দেখে বললো, না জনাব! খেজুর বাগান নয়; ওগুলো পতাকা। দূর থেকে মানুষ আসছে, ঘোড়া আসছে। অন্যরা বললো, হয়তো ভুল দেখছো। তখন স্বয়ং ইমাম হোসাইন (আঃ) দেখলেন এবং বললেন, ঠিক বলেছো। তারপর তিনি সঙ্গীসাথীদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমাদের বামবিক একটি পাহাড় আছে; তোমরা ঐ পাহাড়কে তোমাদের পিছনে প্রতিরক্ষা দেয়াল স্বরূপ গ্রহণ করো।

হুর এসে হাযির হলেন, সাথে এক হাজার সৈন্য। বস্তুতঃ এখানে ইমাম হোসাইন (আঃ) সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন এবং প্রতিপক্ষকে বিপর্যস্ত করার জন্য তার হাতে সুযোগ ছিলো। কিন্তু তিনি কাপুরুষতার আশ্রয় নেন নি; এ সুযোগ কাজে লাগান নি, ঠিক যেভাবে তার মহানুভব পিতা হযরত আলী (আঃ) শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সুযোগকে কাজে না লাগিয়ে মহানুভবতার পরিচয়

দিয়েছিলেন। বরং তার দৃষ্টিতে, এরূপ পরিস্থিতিতে ইসলামী মহানুভবতা প্রদর্শন করা অপরিহার্য। তাই হুর ও তার লোকজন এসে পৌঁছার সাথে সাথেই ইমাম হোসাইন (আঃ) বললেন, ঐখান থেকে পানি নিয়ে এসো এবং তাদের ঘোড়াগুলোকে পানি পান করাও, লোকদেরকেও পানি পান করাও। স্বয়ং তিনি নিজেই দেখাশোনা করেন যে, তাদের ঘোড়াগুলোর পুরোপুরি পিপাসা নিবৃত্তি হয়েছে কিনা। এক ব্যক্তি বলেন, আমার কাছে একটি মশক দেয়া হলো, কিন্তু আমি মশকটির মুখ খুলতে পারলাম না। তখন হযরত এসে নিজের হাতে মশকটির মুখ খুলে আমার কাছে দিলেন। এমনকি ঘোড়াগুলো যখন পানি পান করছিলো তখন তিনি বলেন, এগুলো যদি ক্ষুধার্ত থেকে থাকে তাহলে এক বারে পিপাসা নিবৃত্তি করে পানি পান করবে না। তাই এগুলোকে দুই বার বা তিন বার পানি পান করতে দাও। তেমনি তিনি কারবালাতেও যুদ্ধ শুরু না করার ব্যাপারে সতর্ক থাকেন।

অন্য একটি বিষয় এমন যে ব্যাপারে আমি সম্মানিত লেখক শহীদ জাভীদের সাথে একমত হতে পারি নি। আমি তাকে বলেছিলাম, ইমাম হোসাইন (আঃ) যখন কুফার লোকদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেলেন এবং যখন পরিস্কার হয়ে গেলো যে, কুফা পুরোপুরি ইবনে যিয়াদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে, আর মুসলিমও নিহত হয়েছেন, এর পর কেন তার ভাষণগুলো অধিকতর কড়া হয়েছিলো? কেউ হয়তো বলতে পারে যে, ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর সামনে তো আর ফিরে যাওয়ার পথ খোলা ছিলো না!

মানলাম, তার জন্য ফিরে যাওয়ার পথ খোলা ছিলো না। কিন্তু আশূরার রাতে তিনি যখন তার সঙ্গী- সাথীদেরকে বললেন যে, আমি তোমাদের ওপর থেকে আমার বাই'আত তুলে নিলাম, আর তারা বললেন, না, আমরা আপনাকে ছেড়ে যাবো না, তখন তিনি বলেন নি যে, এখানে থাকা তোমাদের জন্য হারাম; কারণ, তারা আমাকে হত্যা করতে চায়; তোমাদের সাথে তাদের কোনো সমস্যা নেই। তোমরা যদি এখানে থেকে যাও তাহলে অযথাই তোমাদের রক্তপাত হবে, আর তা হারাম হবে। কেন তিনি তা বলেন নি? কেন তিনি বলেন নি যে, এখান থেকে চলে যাওয়া তোমাদের জন্য ফরয? বরং তারা যখন তাদের দৃঢ়তা ও অবিচলতার ঘোষণা দিলেন তখন

ইমাম হোসাইন (আঃ) তাদের এ অবস্থানকে পুরোপুরি মেনে নেন এবং এর পরই তাদের নিকট সেই সব রহস্য তুলে ধরেন যা এর আগে কখনো প্রকাশ করেন নি।

আশূরার রাতে অর্থাৎ নয়ই মহররমের সূর্যাস্তের পর এটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো যে, পরিদন কী হতে যাচ্ছে। এ সত্ত্বেও ইমাম হোসাইন (আঃ) হাবীব বিন মাযাহারকে বনি আসাদ গোত্রের লোকদের কাছে পাঠান যাতে সম্ভব হলে তিনি তাদের মধ্যে থেকে কতক লোককে নিয়ে আসেন। বুঝাই যাচ্ছিলো যে, তিনি নিহতদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাচ্ছিলেন। কারণ, শহীদদের রক্ত যত বেশী পরিমাণে প্রবাহিত হবে তার এ আহবান তত বেশী বিশ্বের ও বিশ্ব বাসীর কাছে পৌঁছে যাবে।

আশূরার দিন হুর তওবা করলেন এবং এরপর ইমাম হোসাইন (আঃ)- এর নিকট চলে এলেন। ইমাম (আঃ) বললেন, ঘোড়া থেকে নেমে এসো। হুর বললেন, না, হুজুর, অনুমতি দিন, আমি আপনার পথে আমার রক্ত ঢেলে দেবো। তখন ইমাম হোসাইন (আঃ) বললেন না যে, আমার পথে তোমার রক্ত ঢেলে দেবে এ কথার মানে কী? এর মানে কি এই যে, তুমি নিহত হলে আমি মুক্তি পেয়ে যাবো? এর ফলে আমি তো মুক্তি পাবো না। তিনি এ জাতীয় কোনো কথাই বললেন না।

এসব বিষয় এটাই প্রমাণ করে যে, ইমাম হোসাইন (আঃ) চাচ্ছিলেন কারবালার ময়দান যত বেশী পরিমাণে সম্ভব রক্তাক্ত হোক। বরং বলা চলে যে, তিনি নিজেই এ রণাঙ্গনকে রঞ্জিত করেন। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, আশূরার আগে এক বিস্ময়কর দৃশ্যপটের অবতারণা হয়। মনে হয় যেন, তিনি স্বেচ্ছায় ও পরিকল্পিতভাবে তার অবতারণা করেছিলেন যাতে তিনি যা বলতে ও বুঝাতে চাচ্ছেন তা অধিকতর সুস্পষ্ট হয়, তার অধিকতর প্রদশর্নী ঘটে। এ কারণেই এ ঘটনা অনুরূপ ঘটনার জন্য প্রেরণায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী পরিমাণে বেড়ে যায়।

মরহুম আয়াতী তার "বার্রাসিয়ে তারীখে আশূরা" (আশূরার ইতিহাস পর্যালোচনা) গ্রন্থে একটি বিষয়ের ওপরে খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেনঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে রক্তের রং হচ্ছে সর্বাধিক স্থায়িত্বের অধিকারী রং। ইতিহাসে ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে যে রং কখনোই মুছে যায় না তা হচ্ছে লাল রং, রক্তের রং। আর হোসাইন বিন আলী (আঃ) এ উদ্দেশ্য পোষণ

করতেন যে, স্বীয় ইতিহাসকে এ স্থায়ী ও অমোচনীয় রং দ্বারা লিপিবদ্ধ করবেন; স্বীয় বাণীকে তার নিজের খুন দ্বারা লিখে যাবেন।

শোনা যায়, এমন কতক লোক ছিলো যারা তার আগে নিজের রক্তের দ্বারা স্বীয় বক্তব্য লিখে গেছে, বাণী লিখে গেছে। বুঝাই যায়, কেউ যখন নিজের রক্ত দ্বারা কোনো কথা বা কোনো বাণী লিখে তার এক বিশেষ প্রভাব থাকে। জাহেলিয়্যাতের যুগে একটি নিয়ম ছিলো এবং কখনো কখনো এমন ঘটতো যে, দু'টি গোত্র এমন মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করতে চাইতো যা কখনো ছিন্ন হবে না। তখন তারা একটি পাত্রে রক্ত নিয়ে আসতো (অবশ্য তাদের নিজেদের রক্ত নয়) এবং তার মধ্যে হাত ডুবাতো। তারা বলতো, এ চুক্তি আর কখনো ভঙ্গ করার নয়; এটা রক্তের চুক্তি, আর রক্তের চুক্তি ভঙ্গ করার মতো নয়।

মনে হচ্ছে, ইমাম হোসাইন (আঃ) যেন আশূরার দিনকে রং দিয়ে রঞ্জিত করতে চাচ্ছিলেন, তবে তা ছিলো রক্তের রং। কারণ, ইতিহাসে যে রং সবচেয়ে বেশী স্থায়ী তা হচ্ছে এই রক্তের রং। তাই তিনি তার ইতিহাসকে রক্তের দ্বারা লিপিবদ্ধ করেন।

অনেক ক্ষেত্রে আমরা শুনতে পাই বা ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে দেখতে পাই, অনেক রাজা- বাদুশা এবং এ ধরনের পদবীর অধিকারীরা নিজেদের নাম ইতিহাসের বুকে অমর করে রাখার লক্ষ্যে এখন থেকে শত শত বছর পূর্বে ধাতব বা পাথরের ফলকে খোদাই করে লিখিয়ে রেখে গেছেনঃ 'আমি অমুক, অমুকের পুত্র, অমুক দেবতাদের বংশধর'; 'আমি হচ্ছি ঐ ব্যক্তি যার সামনে অমুক ব্যক্তি যার সামনে এসে হাটু গেড়ে বসেছিলো'. . . । প্রশ্ন হচ্ছে, তারা ধাতব বা প্রস্তর ফলকে তাদের নাম খোদাই করাতেন কেন? কারণ, তা যেন বিনষ্ট হয়ে না যায়, তা যেন টিকে থাকে। আমরা যে সব নিদর্শন পাচ্ছি তাতে যেমন দেখতে পাচ্ছি, ইতিহাস তাদেরকে মাটির স্তূপের নীচে চাপা দিয়েছে; কেউই তাদের খবর রাখতো না। অতঃপর হাজার হাজার বছর পরে ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ব বিশারদগণ এলেন এবং মাটি খনন করে সেগুলোকে উদ্ধার করে আনলেন। হ্যাঁ, সেগুলোকে মাটির নীচ থেকে বের করে আনা হয়েছে ঠিকই, তবে তাতে কিছু আসে- যায় না। এটা কোনো ব্যাপারই নয়। কারণ, তাদেরকে কেউ তেমন একটা গুরুত্ব দেয় না।

কারণ, তারা তাদের কথাগুলো পাথরের ওপর লিখে রেখে গেছেন; মানুষের হৃদয় পটে লিখে রেখে যেতে পারেন নি।

ইমাম হোসাইন (আঃ) স্বীয় বাণীকে না পাথরের ওপর রং- কালি দিয়ে লিখেছেন, না খোদাই করে রেখে গেছেন। তিনি যা কিছু বলেন তা বাতাসে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং লোকদের কানে ঝঙ্কৃত হয়। তবে তা লোকদের হৃদয়ে এমনভাবে রেকর্ড হয়ে যায় যে, কখনোই তা হৃদয়পট থেকে মুছে যায় নি। আর তিনি এ সত্যের ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। তিনি তার সম্মুখস্থ ভবিষ্যতকে সঠিকভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন। তা হচ্ছে, অতঃপর আর কেউ হোসাইনকে হত্যা করতে পারবে না এবং তিনি আর কখনোই নিহত হবেন না।

আপনারা লক্ষ্য করুন, এসব কী? এসব কি ঘটনাক্রমে ঘটে থাকতে পারে? ইমাম হোসাইন (আঃ) আশূরার দিন ঐ সময়, ঐ শেষ মুহূর্তগুলোতে আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্যয্যের জন্য দো'আ করেন। অর্থাৎ এই বলে দো'আ করেন যে, তার জন্য এমন সাহায্যকারীরা আসুক যারা নিহত হবে; এই বলে দো'আ করেন নি যে, সাহায্যকারীরা আসুক এবং তাকে নিহত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করুক। এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, ইমাম হোসাইন (আঃ) চান নি তার নিহত হওয়ার পর তার সঙ্গী- সাথীরা, তার ভাইয়েরা ও তার পুত্র- ভ্রাতুস্পুত্ররা বেঁচে থাকুক। তা সত্ত্বেও তিনি সাহায্য ও সাহায্যকারী চাচ্ছিলেন; চাচ্ছিলেন যে, সাহায্যকারীরা আসুক ও নিহত হোক। ইমাম হোসাইন (আঃ) যে বলছিলেনঃ

هَلْ مِنْ نَاصِرٍ يَنْصُرُنِى

"এমন কোনো সাহায্যকারী আছে কি যে আমাকে সাহায্য করবে?"

এটাই ছিলো তার এ আবেদনের প্রকৃত তাৎপর্য।

ইমাম হোসাইন (আঃ) এর এ আবেদন তাঁবুগুলোতে পৌঁছে গিয়েছিলো, আর নারীরা বিলাপ করছিলেন; তাদের বিলাপের শব্দ উচ্চকিত হচ্ছিলো। ইমাম হোসাইন (আঃ) তার ভাই আব্বাস ও অন্য এক ব্যক্তিকে পাঠালেন, বললেন, যাও, নারীদেরকে নীরব হতে বলো। তারা গেলেন এবং

নারীদেরকে নীরব হতে বললেন; নারীরা নীরব হলো। এরপর তারা দু'জন ইমামের তাঁবুতে ফিরে এলেন।

এ সময় হযরত ইমামের (আঃ) দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এনে তার কোলে দেয়া হলো। ইমাম হোসাইনের (আঃ) বোন হযরত যায়নাব (আঃ) শিশুটিকে কোলে করে নিয়ে এসে তার ভাইয়ের কোলে দিলেন। তিনি শিশুটিকে কোলে নিলেন। তিনি বললেন না, প্রিয় বোন! এ মুছিবতের মধ্যে- যেখানে কোনোরূপ নিরাপত্তা নেই এবং অপর পক্ষ থেকে তীর নিক্ষেপ করা হচ্ছে, আর দুশমন ওৎ পেতে আছে, এহেন পরিবেশে এ শিশুকে নিয়ে এলে কেন? বরং তিনি তার শিশুটিকে কোলে তুলে নেন। আর ঠিক তখনই দুশমনদের দিক থেকে তীর ছুটে এলো এবং নিস্পাপ শিশুর পবিত্র গলদেশে বিদ্ধ হলো। ইমাম হোসাইন (আঃ) তখন কী করলেন? দেখুন রং করার কাজ কী ধরনের। এভাবে শিশু শহীদ হলে তিনি তার হাতে শিশুর রক্ত নিয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। যেন তিনি বলছেনঃ হে আসমান! দেখো এবং সাক্ষী থাকো।

ইমাম হোসাইন (আঃ) এর জীবনের শেষ সময়; আঘাতে আঘাতে তার পবিত্র শরীর জর্জরিত। তিনি আর দাড়িয়ে থাকতে পরলেন না; মাটিতে পড়ে গেলেন। ঐ অবস্থায় তিনি হাঁটুতে ভর দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেলেন, তারপর পড়ে গেলেন। তিনি আবার উঠে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা করলেন; এ সময় তীর এসে তার গলায় বিদ্ধ হলো। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, তিনি পুনরায় তার হাতে রক্ত নিলেন এবং তার চেহারায় ও মাথায় মাখালেন এবং বললেনঃ আমি আমার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি।

এগুলো হচ্ছে কারবালার হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য। এগুলো হচ্ছে এমন ঘটনা যা হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)- এর বাণীকে দুনিয়ার বুকে চিরদিনের জন্য স্থায়ী ও টেকসই করে দিয়েছে।

নয়ই মহররমের বিকালে যখন দুশমনরা হামলা করে তখন হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) তার ভাই আব্বাসকে দুশমনদের কাছে পাঠান এবং তাকে বলেন, আমি আজ রাতে আমার প্রতিপালকের সাথে একান্ত আলাপন করবো, নফল নামায আদায় করবো, দো'আ ও ইস্তেগফার করবো। তুমি যেভাবেই পারো এদেরকে বুঝিয়ে আজ রাতের জন্য- কাল সকাল পর্যন্ত তাদেরকে

হামলা থেকে বিরত রাখো। আমি কাল এদের সাথে যুদ্ধ করবো। শেষ পর্যন্ত শত্রুরা ঐ রাতের জন্য হামলা থেকে বিরত থাকে।

ইমাম হোসাইন (আঃ) নয়ই মহররম দিবাগত রাতে অর্থাৎ আশূরার রাতে কয়েকটি কাজ আঞ্জাম দেন যা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। সে রাতে তিনি যে সব কাজ আঞ্জাম দেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, তিনি তার সঙ্গী সাথীদেরকে (বিশেষ করে যারা এ কাজে সুদক্ষ ছিলেন) নির্দেশ দেনঃ "তোমরা আজ রাতের মধ্যেই তোমাদের তলোয়ার ও বর্শাগুলোকে (যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুত করো।" আর তিনি নিজেই তাদের কাজ তদারক করতে লাগলেন। জুন নামে এক ব্যক্তি অস্ত্র মেরামত ও ধারালো করার কাজে সুদক্ষ ছিলেন; হযরত ইমাম (আঃ) নিজে গিয়ে তার কাজ তদারক করেন।

ইমাম হোসাইন (আঃ) সে রাতে অপর যে কাজ করেন তা হচ্ছে, ঐ রাতের মধ্যেই তাঁবুগুলোকে খুব কাছাকাছি এনে খাটানোর নির্দেশ দেন- এতই কাছাকাছি যাতে এক তাঁবুর রশি বাধার খুটা অন্য তাঁবুর রশির আওতায় পোঁতা হয় এবং দুই তাঁবুর মাঝখান দিয়ে যেন একজন লোক অতিক্রম করার মতোও ফাঁক না থাকে। এছাড়া তিনি তাঁবুগুলোকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে স্থাপনের এবং সে রাতের মধ্যেই তাঁবুগুলোর পিছনে সুগভীর পরীখা খনসনের নির্দেশ দেন- এমন আয়তন ও গভীরতা বিশিষ্ট্য পরীখা যাতে ঘোড়ার পক্ষে তা লাফ দিয়ে ডিঙ্গানো সম্ভব না হয় এবং শত্রু যাতে পিছন দিক থেকে হামলা করতে না পারে। এছাড়া তিনি মরুভূমি থেকে শুকনো আগাছা এনে তার পিছন দিকে স্তুপীকৃত করে রাখার ও আশূরার দিন সকালে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন যাতে যতক্ষণ আগুন জ্বলতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুশমনরা তাঁবুগুলোর পিছন দিক থেকে হামলা করতে না পারে। তিনি ডান, বাম ও সামনের দিক থেকে দুশমনদের সাথে মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এভাবে তিনি পিছন দিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) ঐ রাতে অপর যে কাজ করেন তা হচ্ছে, তিনি তার সকল সঙ্গীসাথীকে এক তাঁবুতে সমবেত করেন এবং শেষ বারের মতো হুজ্জাত (হুজ্জাত মানে অকাট্য সুস্পষ্ট প্রমাণ।হুজ্জাত পুর্ণ করার মানে হচ্ছে কোনো বিষয়কে প্রমাণ করার জন্য এমনভাবে তুলে

ধরা যাতে শ্রোতার কাছে তার সত্যতার প্রশ্নে বিন্দুমাত্র ও সংশয়ের অবকাশ না থাকে, তা বাহ্যতঃ শ্রোতা তা স্বীকার করুক বা না- ই করুক এবং মানুক বা না- ই মানুক। এখানে হযরত ইমাম হোসেন (আঃ) কর্তৃক হুজ্জাত পূর্ণ করার মানে হচ্ছে তার সঙ্গী সাথীদের শহীদ হওয়ার বিষয়টির পুরোপুরি স্বতঃস্ফূর্ততা নিশ্চিত করা। অর্থাৎ কেউ যেন এভাবে জীবন দেয়াকে অর্থহীন মনে করেও কেবল ইমামের প্রতি বাই'আতের খাতিরে জীবন না দেন) পরিপূর্ণ করেন। তিনি প্রথমে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান যার ভাষা ছিলো অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও যার তাৎপর্য ছিলো খুবই সুগভীর। তিনি যেমন তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি, তেমনি তার সঙ্গী- সাথীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এরপর বলেন, আমি আমার আহলে বাইতের চেয়ে উত্তম কোনো আহলে বাইতের এবং আমার সঙ্গী সাথীদের তুলনায় অধিকতর আনুগত শীল সঙ্গী সাথীর কথা জানি না। এতদসত্ত্বেও তিনি বলেন, তোমরা সকলেই জানো যে, ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ছাড়া আর কারো ব্যাপারে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তাদের লক্ষ্য কেবল আমি। তারা আমাকে হাতে পেলে তোমাদের কাউকে নিয়েই মাথা ঘামাবে না। তোমরা চাইলে রাতের আধারকে কাজে লাগিয়ে সকলেই চলে যেতে পারো।

এরপর তিনি বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই এই শিশুদের ও আমার পরিবারের একেক জন সদস্যকে সাথে নিয়ে চলে যেতে পারো। তিনি এ কথা বলার সাথে সাথেই চারদিক থেকে সকলেই বলতে শুরু করলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ ! আমরা তা করবো না। সকলের আগে যিনি একথা বললেন তিনি হলেন হযরত ইমামের (আঃ) মহান ভ্রাতা আবুল ফজল আব্বাস। বিহারুল) আনোয়ার, খণ্ডঃ ৪৪, পৃষ্ঠাঃ ৩৯৩, ইরশাদশেখ মুফীদ- , পৃষ্ঠঃ ২৩১, এ'লামুল ওয়ারা, পৃষ্ঠাঃ ২৩৫(

এ পর্যায়ে এসে বাস্তবিকই আমরা ঐতিহাসিক ও নাট্যসুলভ কথাবার্তা শুনতে পাই। প্রত্যেকেই তার মতো করে কথা বলেন। একজন বলেন, আমাকে যদি হত্যা করা হয় এবং আমার শরীরকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়, আর তার ভস্ম বাতাসে ছড়িয়ে দেয়া হয়, তারপর আবার আমাকে জীবন্ত করা হয় এবং এভাবে সত্তর বার এর পুনরাবৃত্তি করা হয়, তাহলেও আমি আপনাকে ছেড়ে যাবো না। আমার এ তুচ্ছ জীবন তো আপনার জন্য উপযুক্ত কুরবানীও নয়। আরেক জন

বলেন, আমাকে যদি হাজার বার হত্যা করা ও জীবন্ত করা হয় তথাপি আপনাকে ছেড়ে যাবো না। কেবল পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও ইখলাছের অধিকারী লোকেরাই যাতে তার সাথে থেকে যান সে জন্য যা কিছু করা দরকার হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) তার সব কিছুই করলেন।

হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)- এর সঙ্গী সাথীদের মধ্যে এক ব্যক্তির কাছে আশূরার সে দিনগুলোতেই খবর এলো যে, তার পুত্র অমুক কাফেরদের হাতে বন্দী হয়েছে। বন্দী একটি যুবক ছেলে বৈ নয়; তার ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছিলো তা নিশ্চিত করে বলার উপায় ছিলো না। ছেলের খবর শুনে তিনি বললেন, আমি চাই নি যে, আমি বেঁচে থাকতে আমার ছেলের ভাগ্যে এমনটা ঘটবে।

ইমাম হোসাইন (আঃ)- এর নিকট সংবাদ পৌঁছলো যে, আপনার অমুক সঙ্গীর ছেলে কাফেরদের হাতে বন্দী হয়ে আছে। ইমাম (আঃ) তাকে ডাকালেন এবং তিনি এলে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন ও তার অতীতের ত্যাগ- তিতিক্ষার কথা স্মরণ করলেন, তারপর বললেন, তোমার পুত্র বন্দী হয়ে আছে। কারো না কারো টাকা- পয়সা ও উপঢৌকনাদি নিয়ে সেখানে যাওয়া দরকার যাতে তাদেরকে তা দিয়ে বন্দীকে মুক্ত করতে পারে। সেখানে কিছু মালামাল ও পোশাক- পরিচ্ছদ ছিলো যা বিক্রি করে টাকা- পয়সার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিলো। ইমাম হোসাইন (আঃ) তাকে বললেন, তুমি এগুলো নিয়ে অমুক জায়গায় গিয়ে বিক্রি করো, তারপর প্রাপ্ত অর্থ নিয়ে যাও তোমার ছেলেকে মুক্ত করো। ইমাম হোসাইন (আঃ) এ কথা বলার সাথে সাথে ঐ ব্যক্তি বললেনঃ

اَکَلَتْنِی السِّبَاعُ حَیّاً اِنْ فَارَقْتُک

অর্থাৎ হিংস্র পশুরা আমাকে জীবন্ত ভক্ষণ করুক যদি আমি আপনাকে ছেড়ে যাই। বিহারুল) আনোয়ার, খণ্ডঃ ৪৪, পৃষ্ঠাঃ ৩৯৪(তার কথা হলো, আমার পুত্র বন্দী হয়ে আছে; থাকুক না। আমার পুত্র কি আমার কাছে আপনার তুলনায় অধিকতর প্রিয়?

ইমাম হোসাইন (আঃ) কর্তৃক হুজ্জাত পূর্ণ করার পর যখন সকলেই এক জায়গায় ও এক বাক্যে সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের নিষ্ঠা ও আনুগত্যের ঘোষণা দিলেন এবং বললেন যে, আমরা কখনো আপনাকে ছেড়ে চলে যাবো না, তখন সহসাই পট পরিবর্তিত হয়ে গেলো। ইমাম (আঃ)

বললেন, ব্যাপার যখন এই, তখন সকলেই জেনে রাখো যে, আমরা নিহত হতে যাচ্ছি। তখন সকলে বললো, আল- হামদুলিল্লাহ- আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করছি যে, তিনি আমাদেরকে এ ধরনের তাওফীক দান করেছেন। এটা আমাদের জন্য এক সুসংবাদ, একটি আনন্দের ব্যাপার। ইমাম হোসাইন (আঃ) এর মজলিসের এক কোণে একজন কিশোর বসে ছিলেন; বয়স বড় জোর তেরো বছর হবে। এ কিশোরের মনে সংশয়ের উদয় হলোঃ আমিও কি এ নিহতদের অন্তর্ভুক্ত হবো? যদিও ইমাম বলেছেন 'তোমরা এখানে যারা আছা তাদের সকলে', কিন্তু আমি যেহেতু কিশোর ও নাবালেগ, সেহেতু আমার কথা হয়তো বলা হয় নি। কিশোর ইমাম হোসাইন (আঃ)- এর দিকে ফিরে বললেনঃ

يَا عَمَّاه وَ اَنَا فِى مَنْ قُتِلَ؟

অর্থাৎ, চাচাজান! আমিও কি নিহতদের অন্তর্ভুক্ত হবো? এ কিশোর ছিলেন হযরত ইমাম হাসান (আঃ)- এর পুত্র কাসেম। ইতিহাস লিখেছে, এ সময় হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) স্নেহশীলতার পরিচয় দেন। তিনি প্রথমে জবাব দানে বিরত থাকেন, এরপর কিশোরকে জিজ্ঞেস করেন, ভাতিজা! প্রথমে তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও, এরপর আমি তোমার প্রশ্নের জবাব দেবো। তুমি বলো, তোমার কাছে মৃত্যু কেমন; মৃত্যুর স্বাদ কী রকম? কিশোর জবাব দিলেন, আমার কাছে মধুর চেয়েও অধিকতর সুমিষ্ট। আপনি যদি বলেন যে, আমি আগামী কাল শহীদ হবো তাহলে আপনি আমাকে সুসংবাদ দিলেন। তখন ইমাম হোসাইন (আঃ) জবাব দিলেন, হ্যাঁ, ভাতিজা! কিন্তু তুমি অত্যন্ত কঠিন কষ্ট ভোগ করার পর শহীদ হবে। কাসেম বললেনঃ আল্লাহর শুকরিয়া, আল- হামদুলিল্লাহ- আল্লাহর প্রশংসা যে, এ ধরনের ঘটনা ঘটবে।

এবার আপনারা ইমাম হোসাইন (আঃ) এর এ ভূমিকা নিয়ে চিন্তা করে দেখুন যে, পরদিন কী বিস্ময়কর এক বাস্তব নাটকের দৃশ্যের অবতারণা হওয়া সম্ভব!

ইমামগণের শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত শোক অনুষ্ঠানগুলোর প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করবেন না, বিশেষ করে সাইয়্যেদুশ শুহাদা ও মজলুমদের নেতা হযরত আবু আবদিল্লাহ (আ.)-

এর শোক অনুষ্ঠানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন। (মহান আল্লাহ, তার ফেরেশতাকুল, নূরনবী এবং সকল সালেহ বান্দার পূর্ণ দরুদ ও সালাম তার পবিত্র ও নির্ভীক রুহের ওপর বর্ষিত হোক)। কারবালার প্রেরণাদায়ক ঐতিহাসিক মহাঘটনাই স্মৃতিচারণের জন্য ইমামদের নির্দেশনাবলী জনগণের স্মরণ রাখা উচিত। নবী (সা.) - এর আহলে বাইতের দুশমনদের ওপর যেসব ধিক্কার ও অভিশাপ আপতিত হয়েছে তা আসলে যুগ যুগ ধরে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জাতিসমূহের বীরত্বপূর্ণ প্রতিবাদ। আপনাদের জানা উচিত উমাইয়্যাদের (তাদের ওপর আল্লাহর লা'নত) অত্যাচার আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধিক্কার, নিন্দাবাদ ও অভিশাপের কথা। যদিও তারা এখন পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে জাহান্নামের অতল গহবরে নিমজ্জিত, তথাপি এই ফরিয়াদ ইংগিত বহন করে বর্তমান দুনিয়ার জালেমদের বিরুদ্ধে মজলুম জনতার আর্ত চিৎকার। এ জুলুম বিধ্বংসী ফরিয়াদকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। ইমাম (আ.) - দের স্মরণে শোকগাথা ও প্রশংসাসূচক কাব্যগুলোতে প্রতিটি যুগের জালেমদের দ্বারা সংগঠিত অত্যাচার ও দুঃখজনক ঘটনাগুলো জারালোভাবে আলোচিত হওয়া উচিত। আরব বর্তমান যুগ হচ্ছে আমেরিকা, রাশিয়া ও তাদের দোসরদের, বিশেষ করে আল্লাহ পাকের পবিত্র হারামের প্রতি বিশ্বাসঘাতক সৌদী রাজবংশের (তাদের ওপর আল্লাহ ও তার ফেরেশতা ও রাসূলগণের লা'নত বর্ষিত হোক) হাতে মুসলিম বিশ্বের নির্যাতিত হওয়ার যুগ। আহলে বাইতের স্মরণে রচিত শোকগাথা ও প্রশংসাসূচক কাব্যগুলোতে বর্তমানকালের এ সকল অত্যাচারীর অত্যাচার ও দুঃখজনক ঘটনাগুলোও জারালোভাবে স্মরণ করা এবং (তাদের প্রতি) অভিশাপ ও ধিক্কার দেয়া উচিত।'

[হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.)- এই অসিয়তনামা (অন্তিম বাণী) থেকে সংকলিত]

ইমাম হোসাইন (আ.) - এর আন্দোলনের বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা ও বাণী

মো. মুনীর হোসেন খান *

(ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)

'যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিদর্শনাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে তাহলে তা তো হবে তার হৃদয়ের তাকওয়া প্রসূত।' (সূরা হজ্ব: ৩২)

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ)

'নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম।' (সূরা বাকারা(১৫৮ :

(وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ)

'এবং কাবার জন্য উৎসর্গীকৃত উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন করেছি। এতে তোমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে।' (সূরা হজ্ব : ৩৬)

নিঃসন্দেহে মহানবী (সা.) ও তার পবিত্র আহলে বাইত মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তার প্রমাণ প্রগুক্ত আয়াতসমূহ। যেখানে সাফা- মারওয়াহ পাহাড় দ্বয় এবং হজ্বের কুরবানির উটকে মহান আল্লাহর নিদর্শন বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মহান আম্বিয়া ও আউলিয়ায়ে কেরাম বিশেষ করে নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও তার পবিত্র আহলে বাইত মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন (شَعَائِرِ)। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইমাম হোসাইন (আ.) মহান আল্লাহ পাকের নিদর্শনাদির অন্যতম। আর তাকে সম্মান করা পবিত্র কুরআনের ভাষায় অন্তরের তাকওয়া স্বরূপ। তার শাহাদাতের মাসে তাকে স্মরণ করা, তার মহান ত্যাগ ও কমকাণ্ড আলোচনা করে তা থেকে শিক্ষা নেয়া, অনুপ্রাণিত হওয়া, কারবালার মরুপ্রান্তরে পাপিষ্ঠ ইয়াযীদ, ইবনে যিয়াদের বাহিনীর হাতে তার ও তার সংগী- সাথীদের হৃদয় বিদারক শাহাদাতবরণ ও নির্যাতনের কথা স্মরণ, তাদের পুণ্য স্মৃতিকে চিরজাগরুক ও অম্লান রাখার জন্য শোকানুষ্ঠান পালন, কান্না- কাটি ও অশ্রুপাত করা আসলে তাকে অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনাদি প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তা অন্তরের তাকওয়া প্রসূত। আর তার শোকে শোকাভিভূত না হয়ে হাসি-

আনন্দ প্রকাশ করাই যে শয়তান, ইয়াযীদ ও ইয়াযীদীনের অনুসরণ এবং তাকওয়া বিরোধী তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

ইমাম হোসাইন (আ.) - এর কালজয়ী বিপ্লব ও আন্দোলন সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে তার কতিপয় ফযিলত বা গুণ আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ, এর ফলে আমরা তার সুমহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা লাভ করতে পারব। আর এটা তার আন্দোলনের স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং তাৎপর্য অনুধাবনে সহায়ক হবে।

ইমাম হোসাইন (আ.) মহানবীর আহলে বাইতের অন্যতম সদস্য। অগণিত হাদীস বিশেষ করে প্রসিদ্ধ হাদীসে কিসার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, স্বয়ং মহানবী (সা.), হযরত ফাতেমা, হযরত আলী, হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন কে নিয়ে মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইত বা নবী পরিবার- যাদেরকে মহান আল্লাহ সুরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে মাসূম বা সকল প্রকার পাপ- পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র (নিষ্পাপ) বলে ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

‘হে (নবীর) আহলে বাইত ! নিশ্চয় মহান আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে সকল অপবিত্রতা ও পাপ- পঙ্কিলতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে।’ (সূরা আহযাব : ৩৩)

অতএব,প্রমাণিত হয় যে,ইমাম হোসাইন (আ.) আহলে বাইতের অন্যতম সদস্য হওয়ার কারণে সকল প্রকার পাপ- পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র (মাসূম)।

এ কারনেই মহানবী (সা.) ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন সম্পর্কে বলেছেন :

الحسن و الحس ين سيدا شباب اهل الجنّة

‘হাসান ও হোসাইন উভয়েই বেহেশতের যুবকদের নেতা।’ (জামে আত- তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫০)

সহীহ তিরমিযীতে ইয়ালা ইবনে মুয়রা থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন :

حسين منى و انا من حسين احب الله من احب حسينا، حسين سبط من الاسباط

‘হোসাইন আমার থেকে এবং আমি হোসাইন থেকে। যে ব্যক্তি হোসাইনকে ভালোবাসে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। নাতিদের মধ্যে একজন হলো হোসাইন।’ (৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ (৩৫৪.

সালমান ফার্সী (রা.) –এর নিকট থেকে বর্ণিত : মহানবী (সা.) বলেছেন:

الحسن و الحسين ابناى من احبهما احبنى و من احبنى احبه الله و من احبه الله ادخله الله الجنة و من ابغضهما ابغضنى و من ابغضنى ابغضه الله و من ابغضه الله ادخله النار على وجهه

'হাসান ও হোসাইন আমার দুই পুত্র (নাতি)।যে তাদেরকে ভালোবাসে সে আমাকেই ভালোবাসে, আর যে আমাকে ভালোবাসে মহান আল্লাহ্ তাকে ভালোবাসেন। আর যাকে মহান আল্লাহ্ ভালোবাসেন তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে তাদেরকে ঘৃণা করে সে আমাকেই ঘৃণা করে, আর যে আমাকে ঘৃণা করে মহান আল্লাহ্ তাকে ঘৃণা করেন। আর যাকে মহান আল্লাহ্ ঘৃণা করেন তাকে তিনি জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।' (আলামুল ওয়ারা, ২১৯(

৪র্থ হিজরীর ৩রা শা'বান ইমাম হোসাইনের জন্মগ্রহণ করার সংবাদ মহানবীকে দেয়া হলে তিনি দ্রুত হযরত আলী ও হযরত ফাতেমার ঘরে চলে যান এবং আসমা বিনতে উমাইসকে বলেন : 'হে আসমা! আমার সন্তানকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' আসমা বিনতে উমাইস সদ্য ভূমিষ্ঠ হোসাইনকে একটি সাদা কাপড়ে জড়িয়ে মহানবীর কাছে আনলেন। মহানবী (সা.) হোসাইন কে নিজের কাছে টনে নিলেন, তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামাত দিলেন। তার পর তিনি হোসাইনকে কোলে নিয়ে কাদতে লাগলেন। তখন আসমা বিনতে উমাইস জিজ্ঞাসা করলেন : 'আমার পিতা- মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি কোনো কাদছেন ?'

মহানবী (সা.) বললেন : 'আমি আমার এ পুত্রকে দেখে কাদছি।'

আসমা জিজ্ঞাসা করলেন : 'এতো এই মাত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে।'

মহানবী (সা.) তখন আসমাকে বললেন : 'হে আসমা! আমার পর একদল খোদাদ্রোহী তাকে হত্যা করবে। আমি তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহর কাছে শাফায়াত করব না।' এর পর তিনি বললেন: 'হে আসমা! তুমি ফাতেমাকে এব্যাপারে কিছু বলোনা। কারণ, সে সবেমাত্র সন্তান প্রসব করেছে।'

তার পর আল্লাহ্ মহানবী (সা.) - কে তার নাতির নাম রাখার জন্য নির্দেশ দিলে তিনি আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন : 'এর নাম রাখ হোসাইন।' (আল্লামা তাবারসী প্রণীত আলামুল ওয়ারা বি আ'লামিল হুদা, পৃ. ২১৭)

হাদীসে সাকালাইন

যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রখে গেলাম যা তোমরা মজবুতভাবে ধারণ (অনুসরণ) করলে আমার পর কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তার একটি অপরটির চাইতে অধিক মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ: আল্লাহর কিতাব যা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত প্রসারিত এবং আমার ইতরাৎ (বংশধর ও সন্তান) আমার আহলে বাইত। এ দু'টি কখনও বিছিন্ন হবে না হাউযে কাওসারে আমার কাছে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত। অতএব, তোমরা লক্ষ্য কর আমার পরে এতদুভয়ের সাথে তোমরা কীরূপ আচরণ কর।' (জামে আত- তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৬০, হাদীস নং ৩৭২৬)

যেহেতু ইমাম হোসাইন (আ.) মহানবীর ইতরাৎ অর্থাৎ সন্তান এবং আহলে বাইত তাই তার সাথে পবিত্র কুরআনের সম্পর্ক যে অবিচ্ছেদ্য তা এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়।

মুবাহিলার আয়াত

(فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ)

'অতঃপর তোমার নিকট সত্য জ্ঞান এসে যাওয়ার পর যদি এ ব্যাপারে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে,তাহলে বল : এসো,আমরা ডাকি আমাদের পুত্রদের এবং (তোমরা) তোমাদের পুত্রদেরকে (ডাক),(আমরা ডাকি) আমাদের নারীদেরকে (তোমরা ডাক) তোমাদের নারীদেরকে,এবং (আমরা ডাকি) আমাদের নিজ সাত্তাদেরকে (আমাদের একান্ত আপন লোকদেরকে) তোমরা (ডাক) তোমাদের নিজ সাত্তাদেরকে (তোমাদের একান্ত আপন ব্যক্তিদেরকে)। আর তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত (লা'নত) করি।' (সূরা আলে ইমরান : ৬১)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মহানবী (সা.) নাজরানের খ্রীস্টান প্রতিনিধিদলকে মুবাহালার আহবান জানান যারা হযরত ঈসা (আ.)- কে উপাস্য প্রতিপন্ন করার জন্য মহানবীর সাথে বাদানুবাদ করছিল। মহানবী (সা.) হযরত ফাতেমা, হযরত আলী, ইমাম হাসান এবং ইমাম

হোসাইনকে সাথে নিয়ে মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন। এ আত্মবিশ্বাস দেখে নাজরানের খ্রিস্টান পাদ্রী সাথীদেরকে বলতে থাকেন : ‘তোমরা জান যে, তিনি আল্লাহর নবী। আল্লাহর নবীর সাথে মুবাহালা করলে তোমাদে ধ্বংস অনিবার্য। তাই মুক্তির কোনো পথ খোজ।’ সংগীরা বলল : ‘আপনার মতে মুক্তির উপায় কী?’ তিনি বললেন : ‘আমার মতে নবীর শর্তানুযায়ী সন্ধি করাই উত্তম উপায়।’ এরপর এ ব্যাপারে প্রতিনিধি দল সম্মত হয় এবং মহানবী (সা.) তাদের ওপর জিযিয়া কর ধার্য করে মীমাংসায় উপনীত হন। (ইবনে কাসীরের তাফসীর, ১ম খণ্ড)

মহানবী (সা.) হাসান, হোসাইন, ফাতেমা ও আলীকে নিয়ে মুবাহালার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় ‘হে (নবীর) আহলে বাইত ! নিশ্চয় মহান আল্লাহ চান তোমাদের থেকে সকল পাপ- পঙ্কিলতা ও অপবিত্র দূর করতে এবং তোমাদের পূর্ণরূপে পবিত্র করতে ’-এ আয়াত পাঠ করে বললেন, ‘এরাই আমার আহলে বাইত।’ আর মুবাহালা করতে যাওয়ার সময় মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে মুবাহালার স্থান থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মুবাহালার ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মহানবীর নবুওয়াতের সত্যতার অন্যতম সাক্ষ্যদাতা হযরত ইমাম হোসাইন (আ.)। মহান আল্লাহ যাকে বেহেশতের যুবকদের নেতা করেছেন তাকেই তিনি তার নবীর নবুওয়াতের সত্যতার সাক্ষী করেছেন।

সমগ্র মুসলিম উম্মাহ মহানবীর যুগ থেকে নামাযে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও তার বংশধরদের ওপরই কেবল দরূদ পড়ে আসছে; আর এরই অন্তর্ভূক্ত হচ্ছেন আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন। এ দুর্লভ মর্যাদা ও সম্মান আর কেউ পাননি। দরূদটি নিম্নরূপ :

اللّٰهُمَّ صَلِّ علی مُحَمَّدٍ و علی الِ محمّدٍ کما صَلَّیتَ علی ابراهیمَ و علی الِ ابراهیمَ انَّکَ حَمیدٌ مَجیدٌ اللّٰهُمَّ بارِک علی مُحَمَّدٍ و علی الِ محمّدٍ کما بارِکتَ علی ابراهیمَ و علی الِ ابراهیمَ انَّکَ حَمیدٌ مَجیدٌ"

আয়াতুল মাওয়াদ্দাহ :

(قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ)

‘বলুন,আমি আমার রিসালাতের দায়িত্ব পালন ও দাওয়াতের জন্য তোমাদের কাছে একমাত্র আমার নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভক্তি- ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য (মাওয়াদ্দাহ) ব্যতীত আর কোনো পারিশ্রমিক চাইনা।’ (সূরা- শূরা : ২৩)

অগণিত রেওয়ায়েত অনুসারে এবং অনেক মুফাস্সিরের মতে উপরিউক্ত আয়াতটি আলী,ফাতেমা,হাসান ও হোসাইনের শানে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ‘ফাযায়েলুস সাহাবা’ গ্রন্থে আমেরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন,‘উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবাগণ মহানবী (সা.) - কে বললেন : ‘আপনার নিকটাত্মীয় কারা যাদের প্রতি ভিক্তি ও ভালোবাসা আমাদের ওপর ওয়াজিব করা হয়েছে ?’ মহানবী (সা.) তাদেরকে বললেন : ‘আলী,ফাতেমা এবং তাদের দু’পুত্র। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। ইমাম শাফেয়ী যথার্থ বলেছেন :

يَا آلَ بَيـــــــتِ رَســـــــولِ الله حُـــــــبُّكُمُ فَـــرضٌ مِـــنَ الله فـــى القُـــرآنِ أنزَلَـــهُ
كَفـــاكُم مِـــن عظـــيمِ القَـــدرِ أنّكُـــم مَـــن لَمَ يُصـــلِّ عَلَـــيكُم لَا صَـــلَاةَ لَـــهُ

‘হে রাসুলুল্লাহর আহলে বাইত ! তোমাদের ভালোবাসা
মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয এবং তা তিনি পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন
তোমাদের গর্বের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে,
যে ব্যক্তি তোমাদের ওপর দরুদ পড়বে না তার নামাযই হবে না।’

ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে,ইমাম হোসাইন (আ.) ছিলেন পূত- পবিত্র চরিত্র ও বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক অসাধারণ মহাপুরুষ যিনি মহানবীর আহলে বাইতের অন্যতম সদস্য,মহানবীর নবুওয়াতের সাক্ষ্যদাতা,বেহেশতের যুবকদের নেতা। মহান আল্লাহ তাকে এ সুমহান মর্যাদার অধিকারী করেছেন। তার রয়েছে পবিত্র কুরআনের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তিনি সত্যের মূর্ত প্রতীক। তিনি মহানবী থেকে এবং মহানবীও তার থেকে। কুরআনের নির্দেশে তাকে ভালোবাসা মুসলিম উম্মাহর ওপর ফরয। ইমাম হোসাইন (আ.) সংক্রান্ত এ সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদেরকে তার সুমহান আন্দোলন,চরম আত্মত্যাগ এবং তার শাহাদাতের সঠিক মূল্যায়ন করতে সাহায্য করবে। তবে এখানে একটি প্রশ্নের উত্তর খোজা খুবই প্রয়োজন। আর তা হলো : মহানবী (সা.) - এর ওফাতের মাত্র ৫০ বছর পর উমাইয়্যা বংশের

লম্পট,পথভ্রষ্ট শাসক ইয়াযীদ ও তার সহযোগী বনী উমাইয়্যা (উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ও তার অনুচরগণ) কীভাবে মুসলিম উম্মাহর চোখের সামনে মহানবী প্রাণ প্রিয় দৌহিত্র বেহেশতের যুবকদের নেতা আহলে বাইতের অন্যতম সদস্য ইমাম হোসাইনকে কারবালার মরুপ্রান্তরে সপরিবারে অত্যন্ত নিমর্মভাবে হত্যা করে যা বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা হিসাবে স্থান করে নিয়েছে? উম্মত কীভাবে এ রকম বিচ্যুতির শিকার হলো ? কী ভয়ানক ও জঘন্য অপরাধ ও বিদআতের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে গেল মুসলিম উম্মাহ ? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে হলে কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সন্ধান করতে হবে।

বনী হাশেম ও বনী উমাইয়্যার মধ্যকার দ্বন্দ্ব সুপ্রাচীন এবং তার উদ্ভব মহামতি হাশেম ও তদীয়া ভ্রাতুস্পুত্র উমাইয়্যা ইবনে আবদে শামসের মধ্যকার দ্বন্দ্ব থেকে। হাশেম ছিলেন মহানবীর প্রপিতামহ। তিনি উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং জ্ঞানী- গুণী হওয়ার কারণে মাক্কার ধর্মীয় কর্তৃত্ব,পবিত্র কাবাঘর দেখাশোনা ও বাৎসরিক হজ্ব উদযাপন ও এর সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব লাভ করেন। এর ফলে হাশেমের সুখ্যাতি ও প্রভাব মাক্কা ও তার আশে-পাশে,এমনকি সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়ে যা উমাইয়্যা ইবনে আবদে শামসের তীব্র মর্মজ্বালা,হিংসা ও বিদ্বেষের কারণ হয়ে দড়ায়। পরশ্রীকাতর উমাইয়্যা চাচার সুখ্যাতি ও প্রভাব সহ্য করতে না পেরে চাচার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। স্মর্তব্য যে,উমাইয়্যা কেবল ধনাঢ্য পুজিপতিই ছিল তবে তার কোনো নৈতিক চরিত্র ছিল না। তার চিন্তাধারা ছিল সে সময়ে প্রচলিত সংকীর্ণ জাহেলী চিন্তাধারা থেকেই উৎসারিত। কালক্রমে এ দ্বন্দ্ব বনী উমাইয়্যা ও বনী হাশেমের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এ দিকে হাশেমের পর হাশেমের পুত্র আবদুল মুত্তালিব এবং তার পর তার পুত্র আবু তালিব পবিত্র মক্কা নগরীর সার্বিক ধর্মীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করেন তাদের উন্নত চরিত্র ও মহানুভবতার কারণেই। কিন্তু বনী উমাইয়্যা বিস্তর বিত্ত- বৈভবের অধিকারী হয়েও আরবের বুকে নেতৃত্ব ও দুর্লভ সম্মান লাভ করতে পারেনি তাদের হীনমন্যতা,দুর্নীতি,অনৈতিকতা,অসৎ চরিত্র এবং লাম্পট্যেরই কারণে। হযরত আবু তালিবের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্য সত্য ধর্ম ইসলাম নিয়ে আবির্ভূত হন। সাথে সাথে তিনি পিতৃব্য আবু

তালিব স্বীয় গোত্র বনী হাশেমের অকুণ্ঠ নৈতিক সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। আর মক্কার মুশরিক কুরাইশদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন। হাশেমী হওয়ার কারণে মহানবী (সা.) ও বনী হাশেমের প্রতি বনী উমাইয়্যার ক্ষোভ,হিংসা- বিদ্বেষ ও শত্রুতা চরম আকার ধারণ করে। আমরা দেখতে পাই মহানবী (সা.) - এর নবুওয়াতা প্রাপ্তির পর ১৩ বছর ধরে বনী উমাইয়্যা মক্কার অন্যান্য কুরাইশ শাখা ও উপগোত্রের সাথে সম্মিলিতভাবে মহানবী (সা.) ও তার অনুসারীদের ওপর অবর্ণনীয় দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়েছে। মহানবী (সা.) ও বনী হাশেমকে তিন বছর সামাজিকভাবে পূর্ণ বয়কট ও শো'ব আবু তালিবে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল। এ সব জুলুম ও অপকর্ক আঞ্জাম দেয়ার প্রথম সারিতেই ছিল বনী উমাইয়্যার অবস্থান। অপর দিকে দেখতে পাই বনী হাশেম,বিশেষ করে আবু তালিব নিজের জীবনের ঝুকি নিয়ে কুরাইশদের ষড়যন্ত্র ও নাশকতামূলক কাজ থেকে মহানবীকে রক্ষা করেছেন। মৃত্যু কালে আবু তালিব নিজদের ও বনী হাশেমকে মহানবীর প্রতি সমর্থন ও তাকে কুরাইশদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি নেন এবং তাদেরকে বুঝিয়ে দেন যে,তাদের সার্বিক সাফল্য নিহিত রয়েছে মহানবী ও তার আনীত ধর্মে। হযরত আবু তালিব ও হযরত খাদিজার মৃত্যুর পর মহানবী (সা.) ও মুসলমানদের ওপর মাক্কার কুরাইশদের অত্যাচার তীব্র আকার ধারণ করে। তারা এমনকি মহানবীর প্রাণ নাশ করার সিদ্ধান্ত নিলে মহান আল্লাহর নির্দেশে তিনি আলীকে তার গৃহে রেখে মদীনায় হিজরত করেন। হিজরতের রাতে হযরত আলীর অপার আত্মত্যাগ ও চরম ঝুকি নেয়ার কারণে মহানবী (সা.) নিরাপদে মক্কানগরী ত্যাগ করেন। মদীনায় আগমনের পর মহানবী (সা.) সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করলেন। তার পর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর মক্কার কুরাইশ বহুবার মহানবী ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আর এসব যুদ্ধে বনী উমাইয়্যা সক্রিয় অংশগ্রহণ তো করেছেই;বরং মক্কা বিজয়ের পূর্বে শেষের চার- পাঁচ বছরে যতগুলো সংঘত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে আবু সুফিয়ান বিন হার্ব উমাইয়্যা মহানবী ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐ সব যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে। মক্কা বিজয়ের পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত মক্কার কুরাইশ ও বনী উমাইয়্যা সর্বাত্মকভাবে ইসলাম ও মহানবীর বিরুদ্ধাচারণ ও শত্রুতা করেছে।

অবশেষে মক্কা বিজয়ের দিবসে যখন প্রতিরোধের সব পথ মুশরিক কুরাইশ ও বনী উমাইয়্যার সামনে রুদ্ধ হয়ে যায় তখনই তারা নিরুপায় হয়ে মহানবী (সা.) কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা লাভ করে জীবন বাচানোর তাগিদে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আম্মার ইবনে ইয়াসিরের ভাষায়-

اِسْتَسْلَمُوْولم يسلموا

'তারা (ইসলাম গ্রহণের ভান করে) আত্মসমর্পণ করেছে মাত্র তবে ইসলাম কবুল করেনি।' এরা তুলাকা (طلقاء) ও মুয়াল্লাফাতুল কুলুব অর্থাৎ সাধারণ ক্ষমাপ্রাপ্ত ও বৈষয়িক সুবিধা ও সাহায্য প্রাপ্তির কারণে ইসলাম গ্রহণ কারীবলে ইতিহাসে খ্যাত হয়েছে। উল্লেখ্য যে,আবু সুফিয়ান ইবনে হার্ব ও তার পুত্র মু'আবিয়া মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করে। মহানবী (সা.) ছিলেন দয়ার নবী- রহমতের নবী। তিনি চাইতেন তার চরম শত্রুও ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় নিয়ে মুক্তি পাক। তাই মক্কা বিজয়ের পর তিনি বিগত বছরগুলোর শত্রুতা,অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রতিশোধ না নিয়ে বরং তাদের ক্ষমা করে ইসলামের কল্যাণ লাভ করার সুবর্ণ সুযোগ দেন। তবে তিনি তাদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হয়েও তাদের ওপর সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের পূর্ববর্তী কার্যকলাপের জন্য ন্যায়সঙ্গত কারণেই তাদেরকে কোনো প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদ দেননি। কিন্তু আফসোস! এসব তুলাকা ও মুয়াল্লাফাতুল কুলুব এবং বনী উমাইয়্যা মহানবীর এ ধরনের আচরণ থেকে আত্মিক,আধ্যাত্মিক ও ঈমানীভাবে যে বিন্দুমাত্র উপকৃত হয়নি তার যথার্থ প্রমাণ মলে মহানবী (সা.) - এর ওফাতের ২৫ বছর পর সিফফীনে সুপথ প্রাপ্ত খলিফা হযরত আলীর বিরুদ্ধে সিরিয়ার বিদ্রোহী আমীর মু'আবিয়া কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধে। এ যুদ্ধে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির বিদ্রোহী আমীর মু'আবিয়া ও তার দলের হাতে শাহাদাত বরণ করেন যার সংবাদ দিয়ে ছিলেন মহানবী (সা.) বহু বছর আগেই। মহানবী (সা.) আম্মারকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন : 'হায় আম্মার ! বিদ্রোহী দল তাকে হত্যা করবে;তাদেরকে সে জান্নাতের দিকে আহবান করবে,আর তারা তাকে জাহান্নামের দিকে আহবান করবে।' [সহীহ বুখারী, আবু সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত মসজিদে নববীর নির্মাণ সম্পর্কিত হাদীস।]

উম্মত যাতে তার অবর্তমানে ভবিষ্যতে বিভ্রান্ত না হয় সেজন্য মহানবী (সা.) উপযুক্ত বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ভবিষ্যতে উম্মতের হেদায়াত,ঐকের কেন্দ্রবিন্দু এবং বিভক্তির হাত থেকে রক্ষা কবচ স্বরূপ তিনি তার মহান আহলে বাইতকে তার ওফাতের বহু আগেই বিভিন্ন উপলক্ষে উম্মতের কাছে পরিচিত করিয়েছেন। যেমন আয়াতুত তাতহীরের শানে নুযুল সংক্রান্ত অগণিত হাদীস,হাদীসে কিসা,হাদীসে সাকালাইন ইত্যাদি।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের মধ্যে মহানবীর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিগুলো বাস্তবসম্মত না হওয়ার কারণে মহানবীর ওফাতের ৩০ বছরের মধ্যেই মুসলিম উম্মাহ শাসন কর্তৃত্ব ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব বনী উমাইয়্যার হাতে চলে যায় এবং ইসলামে প্রথম রাজতন্ত্রের গাড়াপত্তন হয় স্বয়ং মু'আবিয়া ও বনী উমাইয়্যার হাতে।

মহানবীর ওফাতের পরে প্রথম খলিফার আমলের ইসলাম ও মহানবীর বিরুদ্ধাচারী আবু সুফিয়ান পরিবার শামের (সিরিয়ার) শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে। আল্লামা সূয়ূতী তার 'তারীখুল খুলাফা' (খলিফাদের ইতিহাস) গ্রন্থে লিখেছেন :

ولما بعث ابوبكر الجيوش الى الشام سار معاوية مع اخيه يزيد بن ابى سفيان فلما مات يزيد استخلفه على دمشق فأقره عمر ثم اقره عثمان وجمع له الشام كله فاقام أميرا عشرين سنة وخليفة عشرين سنة

'যখন খলিফা আবু বকর শামে সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন তখন মু'আবিয়া তার ভ্রাতা ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানের সাথে শাম গমন করেন। অতঃপর ইয়াযীদের মৃত্যু হলে খলিফা আবু বকর মু'আবিয়াকে শামের শাসক (গভর্নর) নিযুক্ত করেন। এরপর দ্বিতীয় খলিফা উমর এবং তারপর তৃতীয় খলিফা উসমান তাকে শামের গভর্নর পদে বহাল রাখেন। সমগ্র শাম তার শাসনাধীনে দেয়া হয়। মু'আবিয়া ২০ বৎসর আমীর (গভর্নর) এবং ২০ বছর খলিফা ছিলেন।'' (তারীখুল খুলাফা পৃ. ১৯৪,দারুল কালাম আল আরাবী,সিরিয়া কর্তৃক মুদ্রিত)

খলিফা হওয়ার আগে আমীর মু'আবিয়া ২০ বছর শামের গভর্নর ছিলেন। এ ২০ বছর নেহায়েৎ কম সময় নয়। হযরত উত্তমরের আমলে আমীর মু'আবিয়া শামের রাজধানী দামেস্কে এক বিরাট জমকালো প্রসাদ নির্মাণ করেন যা ইতিহাসে 'সবুজ প্রাসাদ' (القصر الاخضر) বলে খ্যাতি লাভ

করেছে। তার রাজকীয় চালآسرى العرب চলনের কারণে খলিফা উমর তাকে- বা 'আরবের খসরু' বলে অভিহিত করতেন। হযরত উসমানের শাসনামল থেকেই এক রকম স্বাধীনভাবে শামের শাসন পরিচালনা করতে থাকেন আমীর মু'আবিয়া।

তৃতীয় খলিফার আমলে বনী উমাইয়্যা শাসনের বিভিন্ন পদে ও বিভিন্ন দেশের গভর্নরের পদে নিযুক্ত হওয়ার ফলে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারী হয়ে যায়। তারা তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্রশাসন যন্ত্র, খেলাফত ও বায়তুল মাল অন্যায়ভাবে ব্যবহার করতে থাকে। তাদের দুঃশাসন, অপকীর্তি ও দুর্নীতির কারণে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে চরম বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, বিদ্রোহ এবং অসান্তোষ দেখা দেয় যা সরলমতি তৃতীয় খলিফা সমাধান করতে এবং জ্ঞাতি উমাইয়্যা বংশীয়দের দমন ও অপকর্ম করা থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হন। যে মারওয়ান ও তার পিতা হাকাম মহানবী (সা.) কর্তৃক মদীনা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল এবং পরবর্তী দুই খলিফার আমলেও মদীনায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতি পায়নি হযরত উসমান খলিফা হয়েই তাদেরকে মদীনায় পুনর্বাসিত করেন। শুধু তাই- নয়, লম্পট মারওয়ান খলিফার ব্যক্তিগত সচিবের পদও লাভ করে। এ পদ লাভ করেই মারওয়ান তৃতীয় খলিফার সিলমোহর জাল করে কত যে অপকর্ম সংঘটিত করেছে তার হিসাব নেই। অবশেষে বনী উমাইয়্যার দুর্নীতি এবং মারওয়ানের অপকর্মের ফলে তৃতীয় খলিফা নিহত হন। হযরত উসমানের খিলাফত লাভ করার পর বনী উমাইয়্যা, বিশেষ করে আমীর মু'আবিয়া খলিফা হওয়া এবং বংশানুক্রমিক ও রাজতান্ত্রিক উপায়ে খেলাফত কুক্ষিগত করার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। তৃতীয় খলিফার হত্যাকাণ্ড মু'আবিয়ার কাছে লালিত আশা পূরণ করার দুর্লভ সুযোগ এনে দেয়। খলিফা উসমান হত্যার বদৌলতে বনী উমাইয়্যা, বিশেষ করে মু'আবিয়া রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির পাশাপাশি নিজেদের গায়ে ধর্মের লেবেল এটে ধার্মিক সাজারও মোক্ষম সুযোগ লাভ করে। আমীর মু'আবিয়া উদ্ভূত এ পরিস্থিতি সুকৌশলে ব্যবহার করে রাতারাতি খলিফা উসমানের ওপর নির্যাতনের (মাযলূমীয়াত) ও তার রক্তের প্রতিশোধের দাবিদার হয়ে যান এবং শাম ও

অন্যান্য এলাকার জনমনে ব্যাপক প্রভাব ফেলার চেষ্টা করেন। হযরত আলী এ ধরনের এক ক্রান্তিকালে মুসলিম জাহানের খলিফা হন।

পাক্ষান্তরে মহানবীর আহলে বাইতের সদস্যগণ এবং বনী হাশেম বরাবরই সবদিক থেকে উপেক্ষিত থাকেন।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মক্কা বিজয়ের দিনে কৌশলগত কারণে ইসলাম গ্রহণকারী কুরাইশ ও বনী উমাইয়্যা মহানবীর ওফাতের পরপরই ক্ষমতা ও শক্তির কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হওয়ায় বনী হাশেম, বিশেষ করে নবীর আহলে বাইতের ওপর যুগ যুগ ধরে লালিত শক্রতা, হিংসা- দ্বেষ এবং প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবণতার ললিহান শিখা তাদের অন্তরে আবার প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে এবং মরণ আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। খলিফা উসমানের হত্যাকাণ্ডের পর প্রহেলিকাময় পরিস্থিতিতে হযরত আলী খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলে বনী উমাইয়্যার ধৈর্যের বাধ যেন ভেঙে যায়। আমীর মু'আবিয়ার দুষ্কর্মের জন্য হযরত আলী খলিফা হয়েই তাকে বরখাস্ত করলে তিনি বিদ্রোহ করেন। ইতোমধ্যে মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ 'জঙ্গে জামাল'- এর কারণে আমীর মু'আবিয়া হযরত আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উৎসাহী ও সাহসী হন। হযরত আলীর বিরুদ্ধে আমীর মু'আবিয়া সিফফীনে নাহক যুদ্ধে লিপ্ত হন। এ যুদ্ধে আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) হযরত আলীর পক্ষে যুদ্ধ করে শহীদ হন। তার শাহাদাতের মাধ্যমে মহানবী (সা.)- এর ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবায়িত হয় এবং প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আমীর মু'আবিয়া ও তার দলবল ছিল সেই 'বিদ্রোহী গোষ্ঠি' এবং হযরত আলী সত্যপন্থী। অথচ আফসোস সেদিনের জনগণ মোটেও এ সত্য উপলদ্ধি করতে পারেনি। যুদ্ধের পরাজয়ের হাত থেকে বাচার জন্য আমর ইবনুল আস ও মু'আবিয়া যে ছল- চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিলো তার ফলে সিফফীনের ময়দানে আরেকটি নতুন ফিতনার জন্ম হয় যা 'খারেজী ফিতনা' নামে পরিচিত।

যা হোক খারেজী ফিতনার কারণে ইসলামের ৪র্থ খলিফা হযরত আলীকে শাহাদাত বরণ করতে হলো। তার শাহাদাত বরণের মাধ্যমে আমীর মু'আবিয়া খিলাফত হস্তগত করার অপূর্ব সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি হযরত আলী কর্তৃক মনোনীত খলিফা ইমাম হাসানের বিরুদ্ধে ব্যাপক শক্তি

নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হন। দীর্ঘদিন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সুবাদে আমীর মু'আবিয়া এবং বনী উমাইয়্যা শাসন ক্ষমতা, অর্থবল ও লোকবলের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর এক বিরাট অংশের ওপর ব্যাপক ভাব বিস্তার করেছিল আর খলিফা উসমানের হত্যাকাণ্ড, সিফফীনের যুদ্ধ এবং দাওমাতুল জন্দুলের সালিশীর ফলাফল, খারেজী ফিতনার উদ্ভব, হযরত আলীর শাহাদাত ইত্যাদি কারণে আমীর মু'আবিয়া প্রভাব- প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি পায়। এদিকে দীর্ঘদিন উপেক্ষিত ও প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে দূরে থাকার কারণে আহলে বাইত ও বনী হাশেম কার্যত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। তখনকার মুসলিম উম্মাহও প্রকৃতপক্ষে নিঃসঙ্গ আহলে বাইতের পাশে এসে দাড়ায়নি, তাদের নীতি অবস্থানকে সমর্থন করেনি। ফলে ইমাম হাসান খিলাফতের পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন এবং আমীর মু'আবিয়ার অনেক দিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল। তিনি ইসলামী বিশ্বের খলিফা হয়ে গেলো। তার খিলাফত কালদীর্ঘ ২০ বছরা স্থায়ী হয়। যুগের পর যুগ ধরে বনী উমাইয়্যা যে হিংসা- দ্বেষ বনী হাশেমের প্রতি পোষণ করে আসছিল এবং মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে যার আপতত সমাপ্তি ঘটেছিল তা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং আমীর মু'আবিয়ার খিলাফত কালে তা ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং মু'আবিয়া পাপিষ্ট ইয়াযীদের খলিফা হওয়ার মধ্য দিয়ে যার বিকাশ সংঘটিত হয় এবং এ পাপিষ্ঠের আমলে কারবালায় ইমাম হোসাইনের নির্মম শাহাদাতের মাধ্যমে এর চুড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বস্তুত বনী হাশেম ও বনী উমাইয়্যার মধ্যকার দ্বন্দ্ব সত্য, ন্যায়পরায়ণ, সততা ও সাধুতার সাথে মিথ্যা, দুরাচার, অন্যায়, জুলুম ও দুর্নীতির দ্বন্দ্ব। আর এ দ্বন্দ্বেরই চুড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনায়।

ইমাম হোসাইন (আ.) - এর সুমহান - মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব এবং কারবালার ঘটনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ইমাম হোসাইনের কিয়াম ও আন্দোলনের স্বরূপ যথার্থভাবে উপলদ্ধি করতে সাহায্য করবে। ইমাম হোসাইনের আন্দোলন ও শাহাদহত কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। বরং তা ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত একটি বিপ্লব যার রূপ রেখা প্রণয়ন করেছেন স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও

তার পুণ্যবান আহলে বাইত। তাই এটাকে নিছক বিদ্রোহ এবং অপরিকল্পিত আন্দোলন যা ব্যর্থ হয়েছে বা মুসলিম উম্মাহ বা রাষ্ট্র যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলা মোটেও সমীচীন হবে না।

ইমাম হোসাইনের আন্দোলন ছিল এক ঐশী আধ্যাত্মিক আন্দোলন- ইসলাম ধর্মকে বিকৃতির হাত থেকে মুসলিম উম্মাহকে ও পথভ্রষ্টতার হাত থেকে রক্ষা করা এবং মযলূমকে যালিমের হাত থেকে উদ্ধার করার আন্দোলন। ইমাম হোসাইনের আন্দোলন ছিল সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার মূলোৎপাটনের আন্দোলন। মোট কথা এটি একটি পূর্ণ আন্দোলন। একটি সফল আদর্শ আন্দোলনের সমুদয় দিক- নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক এবং সর্বোৎকৃষ্ট পর্যায়ের আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক দিকও এ আন্দোলনে রয়েছে। মানবীয় সুকুমার চরিত্রের পূর্ণমাত্রার বিকাশও পরিলক্ষিত হয় এ আন্দোলনে। আর তা হতেই হবে। কারণ, এ আন্দোলনের রূপকার মহান আল্লাহর রাসূল নিজে এবং এর নেতৃত্বে ছিলেন বেহেশতের যুবকদের নেতা ইমাম হোসাইন। মহানবী (সা.) বিভিন্ন সময় তার উম্মতকে এ আন্দোলন সম্পর্কে- কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা সম্পর্কে বহুবার অবহিত করেছেন। সাবধান করেছেন যাতে তারা সত্য পক্ষ অবলম্বন করতে পারে- প্রহেলিকাময় প্রচার- প্রপাগান্ডার ধ্রুমজালে আবদ্ধ হয়ে সত্য চিনতে ভূল না করে। তারা যেন সে সময় তারা প্রাণ প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসাইনের সাথে থেকে বিচ্যুতির হাত থেকে রেহাই পায়। [আল্লামা ইবনে হাজার আসাকালানী প্রণীত তাহযীবুত তাহযীব : আল হোসাইনের ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব সংক্রান্ত বিবরণ (পৃ. ৩৪৫- ৩৪৯)]

ইমাম হোসাইনের আন্দোলনের উপাদানসমূহ

ক.বাইআত প্রসঙ্গ ;

খ.কুফা বাসীর দাওয়াত প্রসঙ্গ এবং

গ.সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ।

বাইআত প্রসঙ্গ

নিঃসন্দেহে দুশ্চরিত্র পুত্র ইয়াযীদকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করার মাধ্যমে ইসলামী খিলাফতকে বংশীয় রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করেন আমীর মু'আবিয়া। আর এটা ছিল ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ওপর আপতিত অন্যতম বড় মুসিবত। ইমাম হোসাইন (আ.) এ জঘণ্য বিদআতকে মূলোৎপাটন করার জন্য নিজসঙ্গী- সাথীসহ কারবালায় অত্যন্ত নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। ইয়াযীদের প্রতি বাইআত প্রত্যাখ্যান করে ইমাম হোসাইন (আ.) মদীনার গভর্নর ওয়ালীদ বিন উবার কাছে ইয়াযীদের জঘণ্য চরিত্র উম্মোচিত করে বলেছিলেন : 'নিঃসন্দেহে ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়া একজন ফাসেক মদ্যপ ব্যক্তি সে সম্মানিত প্রাণের হত্যাকারী, প্রকাশ্যে কুকর্মও ব্যভিচারে লিপ্ত ও লম্পট। আমার মতো কোনো ব্যক্তি ইয়াযীদের মতো ব্যক্তির বাইআত করবেনা। (হায়াতুল ইমাম আল- হোসাইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫)

মুন্যির ইবনে যুবাইর বলেছেন : 'খোদার শপথ, ইয়াযীদ মদপানকারী। খোদার শপথ, নামায তরক করা পর্যন্ত সে মাতাল থাকে। (আল- বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খণ্ড, পৃ.২১৬ এবং ইবনে আসীর প্রণীত আল- কামেল ফীত তারীখ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৫)

ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত কুফরী কবিতার পংক্তি :

'আহমদের ধর্মে যদি নিষিদ্ধ হয়

তাহলে ঈসা মসী'র ধর্মের ভিত্তিতে মদপান কর।'

(তাতিম্মাতুল মুন্তাহা, পৃ. ১৩)

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াযীদ ছিল দুশ্চরিত্র ও লম্পট এবং ইসলামী খিলাফতের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

ইয়াযীদের খলিফা হওয়ার সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহর জীবন থেকে ইসলাম ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ ও এর নাম- নিশানা মিটিয়ে ফেলার অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রয় চরমাকার ধারণ করে। যাতে এ ষড়যন্ত্র সফল হয় সে জন্য ইয়াযীদ খিলাফতের মসনদে বসেই মদীনার গভর্নরকে বল প্রয়োগ করে ইমাম হোসাইনের বাইআত গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়। ইয়াযীদকে মেনে নেয়া ও তার হাতে বাইআত করার অর্থই হলো বনী উমাইয়্যার, দুষ্কর্ম, কুকর্ম ও ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের

অনুমোদেন এবং ইসলাম, পবিত্র কুরান ও মহানবীর পবিত্র সুন্নাহকে জলাঞ্জলি দেয়া। তাই ইমাম হোসাইন পূর্ণ সাহসিকতার সাথে ইয়াযীদের আনুগত্য ও বাইআতকে প্রত্যাখ্যান করে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পথ বেছে নেন। ইমাম বলে ছিলেন : 'যখন উম্মাহ ইয়াযীদের মতো কোনো শাসকের খপ্পড়ে পড়বে তখন ইসলামকে বিদায় সাম্ভাষণসূচক সালাম জানাতে হবে।'

কুফাবাসীর দাওয়াত প্রসঙ্গ

বাইআত প্রত্যাখ্যান করার তিন দিন পরে ইমাম হোসাইন (আ.) সপরিবারে মহান বিপ্লবকে সফল করার জন্য মদীনা ত্যাগ করে পবিত্র মক্কায় চলে আসেন। মক্কায় তিনি তার বৈপ্লবিক আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ইয়াযীদ ও বনী উমাইয়্যার প্রকৃত চেহারা তুলে ধরেন মক্কাবাসী ও সেখানে আগত মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা ও জনপদের অধিবাসীদের কাছে। এ সময় তিনি কুফাবাসীর দাওয়াত পান। কুফা ছিল তখন জনবহুল এবং সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী শহর। এ শহর দ্বিতীয় খলিফার আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় কেবল কুফাই পারতো বনী উমাইয়্যা প্রভাবিত শাম ও দামেস্কের মোকাবিলা করতে। এক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের আর কোনো নগর, জনপদ কুফা নগরীর সমকক্ষ ছিল না।

হযরত আলী ও হযরত হাসানের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতামূলক আচরণের ফলে যখন উমাইয়্যা শাসন কুফাবাসীর ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসল তখন তাদের বোধোদেয় হল। তারা এ অবস্থার অবসান ঘটাতে চাইল। যখন তারা শুনল যে, ইমাম হোসাইন (আ.) ইয়াযীদের হাতে বাইআত না করে মক্কায় চলে এসেছেন তখন তারা আরো উৎসাহী হল। তারা পত্রের পর পত্র পাঠিয়ে ইমাম হোসাইনকে কুফায় আসার দাওয়াত দিল এবং জানাল যে, তারা তার নেতৃত্বে ইয়াযিদী শাসনের নাগপাশ থেকে কুফা করে আবার সেখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবে। পরবর্তী পর্যায়ে তারা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে ইয়াযীদ ও বনী উমাইয়্যার শাসন থেকে মুক্ত করে প্রকৃত ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করবে। ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে : কুফাবাসীর পক্ষ থেকে ১৮০০০- এর অধিক পত্র ইমামের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এটা ছিল এক মহা

আহবান যা কোনো সত্যাশ্রয়ী নেতার পক্ষে উপেক্ষা করা অশোভন এবং অনুচিত। তার ইমাম তাদের আহবানে ইতিবাচক সাড়া দিলেন তবে যথাযথ সতর্কতাও অবলম্বন করলেন। কারণ, তিনি কুফাবাসীর অস্থিরচিত্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে বেশ ভালোভাবে জানতেন। সে জন্য তিনি তার পিতৃব্যপুত্র মুসলিম ইবনে আকীলকে তার প্রতিনিধি হিসাবে কুফায় প্রেরণ করলেন। মুসলিম ইবনে আকীল যখন কুফার সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ইমামের কাছে ইতিবাচক বিবরণ পাঠিয়ে তাকে কুফায় আসার আমন্ত্রণ জানালেন তখনই ইমাম হোসাইন কুফায় যাওয়া ও সেখানকার অধিবাসীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে সেখান থেকে তার আন্দোলন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এদিকে ইয়াযীদের গুপ্তঘাতকদের আনাগোনা ও মক্কায় হজ্ব চলাকালীন তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের কথা যখন ইমাম হোসাইন জানতে পারলেন তখন তিনি হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা ত্যাগ করে কুফা অভিমুখে সপরিবারে যাত্রা করলেন। কারণ, তিনি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইয়াযীদের হাতে বাইআত না করে যেখানেই তিনি যান না কেনো ইয়াযীদের ঘাতকবাহিনী তার পিছু ছাড়বে না এবং তাকে হত্যা করবেই। তিনি যদি ইয়াযীদের ঘাতকদের হাতে প্রাণ হারান তাহলে এভাবে নিহত হওয়ায় বনী উমাইয়্যা ও ইয়াযীদের কোনো ক্ষতি হবে না বরং তারা এ থেকে লাভবান এবং মুসলিম উম্মাহও ইমাম হোসাইনের শহীদ হওয়ার লক্ষ্য- উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না। ফলে ইমাম হোসাইন যে বিপ্লব ও আন্দোলনের দিকে সবাইকে আহবান জানাচ্ছেন তা ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং এর ফলে দীন ইসলাম হুমকির সম্মুখীন হবে। তাই তিনি কুফায় যাওয়ার প্রাক্কালে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীর কুফায় না যাওয়ার উপদেশ, মক্কায় থাকা বা মাক্কা ছেড়ে অন্য কোনো সুরক্ষিত নিরাপদ এলাকা, যেমন ইয়েমেনে আশ্রয় নেয়া বা কুফায় যেতে হলে সপরিবারে না গিয়ে একাকী যাওয়ার পরামর্শ বিনম্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইমাম হোসাইন এ ব্যাপারে সত্যিকার দূরদর্শী নেতার দায়িত্ব পালনকরেছেন। তিনি যদি কুফাবাসীর আহবানে সাড়া না দিয়ে মক্কায় থেকে যেতেন বা অন্যত্র চলে যেতেন তাহলে পরবর্তীকালে যে সব ঐতিহাসিক তার কুফা গমনকে অদূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন তারই তাকে দোষী সাব্যস্ত

করে বলতো তিনি কুফাবাসীর আহবানে কেনো সাড়া দিলেন না? যদি ও কুফাবাসী বিশ্বাস ঘাতক ও চঞ্চলমতি তবুও যদি তিনি তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে কুফায় যেতেন তাহলে হয়তোবা কুফাবাসী এ দফায় তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করতনা এবং তার নেতৃত্বে বিপ্লবে অংশ নিয়ে স্বৈরাচারী ইয়াযিদী- উমাইয়্যা শাসনকে উৎখাত করে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারত। অথচ ইমাম এ সাম্ভাবনাময় গণজাগরণের প্রতি বিন্দু মাত্র ভ্রুক্ষেপ করলেন না।' এভাবে তাকে দোষারোপ এবং তার আন্দোলন ও নীতি- অবস্থানের সমালোচনা ও অবমূল্যায়ন করা হতো। যদি কুফাবাসীর এ আহবান বা দাওয়াত না থাকত তাহলে তিনি হয়তো অন্য জায়গায় চলে যেতেন যেখান থেকে তিনি তার আন্দোলন চালিয়ে যেতেন। কুফাবাসীর আহবানের কারণে তিনি কুফাকে তার আন্দোলন পরিচালনা করার কেন্দ্র হিসাবে বছে নিলেন মাত্র। কুফার ষ্ট্রাট্রেজিক গুরুত্ব এবং দামেস্ককে মোকাবিলা করার ক্ষমতা সম্পর্কে ইমাম পূর্ব হতেই জ্ঞাত ছিলেন। তাই ইমামের সপরিবারে কুফা গমন আসলে সম্পূর্ণ সময়োপযোগী পদক্ষেপই ছিল - কোনো রাজনৈতিক ভুল বা অদূরদর্শিতা ছিল না।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

তবে তাৎক্ষণিক ও খণ্ডকালীন গুরুত্ব ও প্রভাব থাকলেও ইয়াযীদের বাইআতের (সামরিক), চাপ ও কুফাবাসীর দাওয়াতের কোনোটি হোসাইনী আন্দোলনের মূল উপাদান বা কারণ ছিল না। বরং এ আন্দোলনের মূল উপাদান ও কারণ ছিল আলআমর বিল মা- 'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ।

ইসলামে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের প্রকৃত তাৎপর্য, গুরুত্ব ও স্থান যদি পরিস্কার হয়ে যায় তাহলে হোসাইনী আন্দোলন যা হচ্ছে খটি তৌহিদী ইসলামেরই বহিঃপ্রকাশ তাতে এই মৌলিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রতিভাত হবে।

নিঃসন্দেহে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ইসলাম ও ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রাণ শক্তি। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য (যা সর্বশ্রেষ্ঠ সৎ কাজ) রক্ষা, বিচ্যুতির হাত থেকে উম্মাহ, ইসলাম

এবং ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রকে সংরক্ষণ, ইসলামী বিধি- বিধানের সফল ও সঠিক প্রয়োগের নিশ্চয়তা, শিরক, কুফর ও সকল প্রকার অন্যায়- অত্যাচার, অবিচার, দুষ্কর্ম ও দুর্নীতির উচ্ছেদ এবং মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের উত্তরোত্তর উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি কখনোই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই সত্যিকার ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের এ বিষয় সব সময় সজীব ও প্রাণবন্ত থাকবে। আসলের এর কোনো বিকল্প নেই। কোনো মুমিন ব্যক্তিই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ যথাযথ আমল করা ব্যতীত ঈমান, নৈতিকতা, মারেফত (খোদা- পরিচিতি) ও আধ্যাত্মিকতার শীর্ষে কখনোই পৌছতে পারবে না। পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে সর্ব শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়ার পূর্ব শর্তই হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ। বলা হচ্ছে :

(كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)

‘হে মুসলমানগণ! তোমরাই হলে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বা উম্মাহ তোমাদের কে সমগ্র মানব জাতির জন্য সৃষ্টি হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে।’ (আলে- ইমরান : ১১০)

পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে :

(وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

‘তোমাদের মধ্যে এমন এক গোষ্ঠি থাকবে যারা কাল্যাণের দিকে আহবান জানাবে। সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং তারাই হবে সফলকাম।’ (সূরা আলে- ইমরান : ১০৪)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। আয়াতটিতে যে গোষ্ঠির কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে যাবতীয় পূর্বশর্ত পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং সর্বোত্তম উপায়ে তারা সমাজে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করেন। আর পরিণামে এরাই হবে সফলকাম। তারা যেমন নিজেদেরকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যান তেমনিভাবে গোটা

সমাজকেও সাফল্যের পথে নিয়ে যাবেন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ- মূলনীতি পালন করার মাধ্যমে। এর পূর্বশর্তসমূহ সূরা তওবার ১১২ নং আয়াতে বিধৃত হয়েছে :

(التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)

'তারা তওবা কারী,ইবাদাতকারী,আল্লাহর প্রশংসাকারী,সিয়াম পালনকারী,ও সিজদাকারী,সৎ কাজের আদেশদাতা ও অসৎ কাজের বাধাদানকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষণকারী;এই মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।' (সূরা তওবা : ১১২)

অর্থাৎ,'যারা তওবাকারী,ইবাদাতকারী,আল্লাহর প্রশংসাকারী,সিয়াম পালনকারী,ও সিজদাকারী,সৎ কাজের আদেশ দাতা ও অসৎ কাজের বাধা দানকারী,তারা আলোকোজ্বল চিন্তা,ঈমান,আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের মাধ্যমে নিজেকে সংশোধন করেছেন এবং এরপর তিনি সমাজের সংস্কার ও সংশোধনের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। অর্থাৎ এক কথায় তিনি (সৎ কাজের আদেশ দাতা ও অসৎ কাজের বাধাদানকারী) একজন সমাজ সংস্কারক ও সংশোধক। (আয়াতুল্লাহ মোতাহহারী প্রণীত হামাসায়ে হোসাইনী।)

এ আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে,ইসলাম ও ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব,অগ্রগতি ও বিকাশ আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের মধ্যেই নিহিত। অতএব,নিঃসন্দেহে বলা যায় যে,হোসাইনী আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি এবং মূল উপাদানই হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে,এ আন্দোলনের অপর দু'টি কারণ (বাইআত ও দাওয়াত) গৌণ। তার এ দু'টি কারণ যদি বিদ্যমান নাও থাকত তার পরও ইমাম হোসাইন (আ.) সৎ কাজের আদেশ দানকারী ও অসৎ কাজে বাধাদানকারী অর্থাৎ একজন সংস্কারক ও সংশোধক হিসাবে আপাদমস্তক পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত সমাজকে সংশোধন করার জন্য অনৈসলামী ইয়াযিদী শাসনের বিরুদ্ধে অবশ্যই বিদ্রোহ করতেন। ইমাম হোসাইন নিজেই নবীর সুন্নাহ অবমাননা ও বিদআতের প্রচলন সম্পর্কে বসরার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন :

‘আমি আপনাদেরকে আল- কুরআন ও মহানবীর সুন্নাতের দিকে ফিরে আসার আহবান জানাচ্ছি। কারণ,নবীর পবিত্র সুন্নাহ ধ্বংস সাধন করা হয়েছে এবং বিদআতের পুনরুজ্জীবন,প্রচার ও প্রচলন করা হয়েছে।’

মুসলিম ইবনে আকীলকে কুফায় পাঠানোর সময় কুফাবাসীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রে ইমাম হোসাইন উল্লেখ করেছিলেন :

‘আমার জীবনের কসম,ইমাম কে? ইমাম হচ্ছে সেই যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমল করে,সত- ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে,সত্য ধর্মাবলম্বী ও মহান আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিজকে বচিয়ে রাখে।’

ইমাম হোসাইন মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার কাছে লিখিত অসিয়তে মক্কা থেকে কুফাপানে যাওয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন :

إِنّى لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلا بَطَرًا وَلا مُفْسِدًا وَلا ظالِمًا وَإِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاِصْلاحِ فى أُمَّةِ جَدّى، أُريدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسيرَ بِسيرَةِجَدّى وَأَبى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِب فمن قلبى بقبول الحق فالله اولى بالحق و من ردّ على هذا اصبر

‘আমি প্রবৃত্তির তাড়নার বশবর্তী হয়ে বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বা যালিম হিসাবে (মক্কা থেকে) বের হইনি। আমি তা বের হয়েছি আমার নানার উম্মতকে সংশোধন করার জন্য। আমি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে চাই এবং আমি আমার নানা ও পিতা আলী ইবনে আ তালিবের জীবন পদ্ধতির ওপর চলতে চাই। অতএব,যে কেউ সত্য গ্রহণ করার মতো আমাকে গ্রহণ করবে মহান আল্লাহই হচ্ছেন সত্যিকারভাবে আমার ও তার জন্য সবচেয়ে উত্তম। আর যদি কেউ এ ব্যাপারে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব (ধৈর্যের সাথে আমি একাই আমার দায়িত্ব পালন করব)।’

কুফার পথে হুর ইবনে ইয়াজিদ রিয়াহীর সেনা বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার সময় এক ভাষণে ইমাম হোসাইন বলে ছিলেন : ‘হে লোকসকল! মহানবী (সা.) বলেছেন : “যে ব্যক্তি কোনো অত্যাচারী,আল্লাহর হারামকে হালাল (বৈধ) কারী,প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী এবং রাসূলের সুন্নাত বিরোধী কোনো শাসককে প্রত্যক্ষ করবে যে আল্লাহর বান্দাদের মাঝে পাপাচার এবং আল্লাহর সাথে

শত্রুতামূলক মনোবৃত্তি পোষণ করে,সে যদি কথা বা কাজের দ্বারা ঐ শাসককে বাধা না দেয় তাহলে এ ব্যক্তিকে জাহান্নামে ঐ শাসকের ঠিকানায় প্রবেশ করানো মহান আল্লাহর জন্য হক বা অধিকার হয়ে যাবে।"

সাবধান সাবধান,এরা শয়তানের আনুগত্য ওয়াজিব করে নিয়েছে। মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে,প্রকাশ্যে ফ্যাসাদ ও দুর্নীতিতে লিপ্ত,মহান আল্লাহর দণ্ডবিধি বাতিল করেছে। ফাই বা খোদার সম্পদ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। আল্লাহর হারামকে হালাল এবং তার হালালকে হারাম করেছে। আর আমি রাসূলের সাথে আমার নিকটাত্মীয়তার কারণে এ খিলাফতের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত (হকদার)।'

তিনি হুর ইবনে ইয়াজিদ রিয়াহীর সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অপর এক বক্তৃতায় বলে ছিলেন : 'হে লোকসকল! তোমরা যদি মহান আল্লাহকে ভয় কর এবং হক বা অধিকারের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের হক বা অধিকার চিনতে পার তাহলে তা হবে তোমাদের জন্য মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায়। আমরা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) - এর আহলে বাইত। এ খিলাফতের জন্য সকলের চেয়ে বেশি হকদার। খিলাফতের এ সকল মিথ্যা দাবিদার থেকে তোমাদের উচিত পৃথক হয়ে যাওয়া। তাদের কোনো অধিকারই নেই। তারা তোমাদের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত।'

ইমাম হোসাইন এসব বক্তব্যে তার কিয়াম বা বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং অন্তর্নিহিত বাণী সমূহকে চমৎকারভাবে জনগণকে অবহিত করেছেন।

উম্মতের ইসলাহ বা সংস্কার এতই গুরুত্বপূর্ণ যে,ইমাম হোসাইন নিজের ও সঙ্গী- সাথীদের জীবন এর জন্য উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বাধা দান করতে গিয়ে হোসাইন ও তার সঙ্গী- সাথীদের জীবনও যদি উৎসর্গ করতে হয় এবং এর ফলে যদি ইসলাম ধর্ম বিকৃতি ও বিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা পায় তাহলে সেটাই হবে ফরয (অবশ্য পালনীয়)। তাই ইমাম হোসাইন (আ.) পাপিষ্ঠ ইয়াযিদী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লব করে নিজ ও সঙ্গী- সাথীদের জীবন উৎসর্গ করে ইসলামকে রক্ষা করে গেছেন।

হুর ইবনে ইয়াযীদের সেনাদলের সামনে সমসাময়িক পরিস্থিতি,সরকার ও জনগণের অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেছেন :

'তোমরা কি দেখতে পাও না যে,সত্যানুযায়ী কাজ করা হচ্ছেনা এবং অসত্যকে বাধা দেয়া হচ্ছে না যাতে মুমিন তার প্রভুর সাথে সত্যি-সত্যি সাক্ষাৎ করতে উদ্বুদ্ধ না হয়। অতএব,এ পরিস্থিতিতে আমি মৃত্যুকে সৌভাগ্য ছাড়া আর কিছুই ভাবিনা এবং অত্যাচারীদের সাথে জীবন যাপনকে অবমাননাকর গ্লানিময় মনে করি।'

হাদীস ও রেওয়ায়েতভিত্তিকি অগণিত ঐতিহাসিক দলিল বিদ্যমান যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে,ইমাম হোসাইনের শাহাদাত তার আন্দোলনের তো কোনো ক্ষতি করে নি বরং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সর্বোত্তমভাবে সংরক্ষণ করেছে। তার শাহাদাতের কারণে তদানীন্তন মুসলিম উম্মাহর বোধোদয় হয়েছে। তারা জাগ্রত হয়েছে এবং বুঝতে পরেছে যে,তারা কোন সরকারের অধীনে বসবাস করছে,তাদের ওপর কোন শ্রেণীর শাসক শাসন কর্তৃত্ব চালাচ্ছে যারা নিজেদের হীনাস্বার্থ চরিতার্ত করার জন্য যে কোনো ধরনের পাপাচার করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এতটুকু জাগরণই ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটিয়েছে। আর সমকালীন বিশ্বে এর সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন ইমাম খামেইনী (রহ.) –এর নেতৃত্বে ইরানে সফল ইসলামী বিপ্লব। এ বিপ্লব সম্পূর্ণ ভাবে হোসাইনী আদর্শ ও চিন্তাধারা থেকে উৎসারিত। এ বিপ্লবের নেতা হযরত ইমাম খামেইনী যথাথ বলেছেন : 'আমরা যা কিছু পেয়েছি তা মুহররম ও সফর মাস থেকে পেয়েছি। মুহররম ও সফরই ইসলামকে জীবিত ও প্রাণবন্ত রেখেছে। 'ভারতের স্বাধীনতা ও ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গান্ধি নিজেই স্বীকার করেছেন যে,তিনি তার আন্দোলনের অনুপ্রেরণা ইমাম হোসাইনের অপার আত্মত্যাগ থেকেই পেয়েছেন।

আহলে বাইতের অগণিত রেওয়ায়েতে এ কারণেই শহীদ সাম্রাট ইমাম হোসাইনের জন্য আযাদারী ও শোকানুষ্ঠান পালনের এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ,এর মাধ্যমে যুগে যুগে সত্যাশ্রয়ী মানুষের সামনে ইমাম হোসাইনের আন্দোলন চিরভাস্বর হয়ে থাকবে এবং তাদেরকে পথ দেখাবে।

এটা সত্য যে,যদি ইমাম হোসাইন (আ.) আন্দোলন না করতেন এবং মযলুমভাবে শহীদ না হতেন তাহলে বনী উমাইয়্যা এবং ইয়াযীদ ইসলামের নাম- নিশানা মিটিয়ে দিত। ইসলামের আর কিছুই বিদ্যমান থাকতনা। তার তা মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর বলেছেন : 'কাতলে হোসাইন আস্ল মার্গে ইয়াযীদ হ্যায়
ইসলাম যিন্দা হোতা হায় হার কারবালা কে বা'দ।'
অর্থাৎ হোসাইনের হত্যাকাণ্ডের মধ্যেই ইয়াযীদের মৃত্যু
(আর) প্রতিটি কারবালার পরই ইসলাম জীবিত হয়।
ইমাম হোসাইনের শাহাদাত ছিল বস্তুত লম্পট ইয়াযীদ ও বনী উমাইয়্যা প্রশাসনের ওপর রক্তের বিজয়। এখানে তরবারির ওপর রক্ত বিজয়ী হয়েছে। ইমাম হোসাইনের আন্দোলন না ছিল নিছক হুকুমত বা শাসন কর্তৃত্ব লাভের জন্য,না ছিল তা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। বরং এটা ছিল ইসলামে বনী উমাইয়্যা কর্তৃক যে বিচ্যুতির ধারা সৃষ্টি হয়েছিল সেটার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম।
ইমাম হোসাইন (আ.) - এর বক্তব্যে 'ইয়াযীদের মতো','আমার মতো' এসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে,আমার ব্যক্তিগত লাভ- লোকসন অথবা ইয়াযীদের ব্যক্তিগত লাভ- লোকসন আলোচ্য বিষয় নয়। বরং আলোচ্য বিষয় হচ্ছে,যে কেউ আমার মতো হবে সে যখনই ইয়াযীদের সরকারের মতো কোনো সরকারের সম্মুখীন হবে তখন সে এ সরকারের বাইআত করবেনা। (আর এ কাজটাই করেছেন বর্তমান শতাব্দীতে হযরত ইমাম খামেইনী)। আর যখন ইয়াযীদের মতো শাসক জনগণের ওপর হুকুমত করবে তখন অবশ্যই ইসলামকে বিদায় জানাতে হবে।
কোনো কোনো ঐতিহাসিক ইমাম হোসাইন (আ.) - এর আন্দোলনের আরো অনেক কারণ বর্ণনা করেছেন। এসব কারণ আসলে তৃতীয় কারণের অন্তর্গত হওয়ায় কেবল সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :

১. ইয়াযীদ ও উমাইয়্যাদের হাতে বিপন্ন হওয়া থেকে ইসলাম ও ইসলামী খেলাফতকে রক্ষা করা;

২. জনগণকে চিন্তাগত স্বাধীনতা প্রদান;

৩.বনী উমাইয়্যার হাত থেকে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং মুসলিম উম্মাহ বায়তুলমাল লুণ্ঠন রোধ করা;

৪. মহানবীর পবিত্র আহলে বাইতের নাম- নিশানা মুছে দেয়ার অশুভ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়া;

৫. বনী উমাইয়্যা কর্তৃক প্রবর্তিত বিদআতসমূহের মূলোৎপাটন ও নবী সুন্নাতসশূহ পুনরুজ্জীবিত করা;

৬.সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং

৭. ইসলামী বিধি- বিধান সর্বক্ষেত্রে প্রবর্তন করা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম হোসাইন (আ.) - এর বিপ্লব একটি পূর্ণাঙ্গ সফল ইসলামী বিপ্লব। এ বিপ্লবে রয়েছে ইসলামের যাবতীয় নীতি এবং সুউচ্চ মানবিক গুণ, যেমন চরম আত্মত্যাগ, সাহস ও সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে অবিচল থাকা ইত্যাদি। তাই এ বিপ্লব একই সাথে আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক।

*গবেষক, ধর্মতত্ত্ব কেন্দ্র, কোম

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান

ইমাম হোসাইন (আ.) কপটতার স্বরূপ উম্মোচন করেছেন

প্রফেসর টি বানো কাযিম (যুক্তরাজ্য)

'নিফাক' বা কপটতা সম্পর্কে কোনো কিছু লিখতে যাওয়ার আগে ইসলামের শরীয়তী নীতির আলোচনা করা প্রয়োজন। বিশেষ করে শরীয়তী মূলনীতির উৎস কোথায় এবং তা মানুষের মাঝে কী ধরনের গুণ সাঞ্চার করতে চায় তা আলোচনা হওয়া আবশ্যক যাতে মানবতার ওপর 'নিফাক' বা কপটতার মারাত্মক পরিণতি এবং তা দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করা যায়।

মানুষের জন্য তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত জীবন বিধান মানুষের কাছে পৌছে দেয়া হয়েছে তার নবী- রাসূলদের মাধ্যমে। আর নবী- রাসূলদের তিনি সৃষ্টি করেছেন বিশেষ গুণ ও ক্ষমতা দিয়ে। তারা ছিলেন আল্লাহ তা'আলার 'মনোনীত' বা 'বাছাইকৃত' মানুষ এবং পরে আরো পরীক্ষা- নিরীক্ষার মাধ্যমে তাদের অবস্থান, মর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (সা.)- এর ওপর এ শরীয়তী বিধানের চূড়ান্তরূপ নাযিল করার পর, কিয়ামত পর্যন্ত মানব সমাজের দিকনির্দেশনার জন্য তা মূল আকারে সংরক্ষণ করা আবশ্যক ছিল। প্রকাশ্য শত্রুতার মাধ্যমে এ বিধান ধ্বংস করার শত্রুও সব সময় ছিল। কিন্তু শত্রুদের এ আশা যখন ভঙ্গ হয়, তখন কপটতা বা 'মুনাফেকি'র মাধ্যমে এর অঙ্গ হানির চেষ্টা শুরু হয়। দুশমনরা ইসলামের নিজস্ব সমাজে প্রবেশ করে তার সারবস্তু পরিবর্তনের চেষ্টা করে।

শরীয়তের এ বিধান সংরক্ষণের জন্য আবার 'বাছাই করা' বা মনোনীত মানুষ - ইমামদের সেবার প্রয়োজন ছিল, যারা এ উদ্দেশ্যে যে কোনো কিছু বা সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা নবীদের মতোই বিশেষ গুণ দিয়ে ইমামদের সৃষ্টি করেন এবং পরীক্ষার মাধ্যমে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শরীয়ত সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। অতএব, এ পৃথিবী থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) - এর বিদায় পরবর্তী মুনাফিকদের কমকাণ্ড ঐতিহাসিকভাবে চিহ্নিত করার আগে ঐসব মানুষের বিশেষ গুণাবলী খুজে বের করা দরকার যারা আল্লাহ তা'আলার বাণী বয়ে এনেছেন, তা মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছেন এবং

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেই বিধান সংরক্ষণ করে গেছেন। আমরা এখানে ইসলামের প্রাথমিক যুগের সে সব ব্যক্তির ইতিহাসের ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করব যারা আনুগত্য, সাহস ও ত্যাগী চেতনার মাধ্যমে নিজেদেরকে শরীয়ত হেফাজতকারীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন।

ইমামের রক্ত কপটদের মুখোশ উন্মোচন করে

মহান আল্লাহ আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দান ও সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য তার বাণী বাহক নবী ও ইমামগণকে প্রেরণ করেছেন এবং এ সংবাদ দিয়েছেন যে, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী।' (সূরা আল-হুজুরাত : ১৩) এজন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে শুকরিয়া আদায় করার কোনো ভাষা খুজে পাওয়া যাবে না। এসব মানুষের ন্যায়পরায়ণতা এবং আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা ও নিষ্ঠা পরীক্ষিত। আল্লাহ তা'আলার প্রতি সংশয়হীন ঈমান এবং তার ইচ্ছার প্রতি তাদের আনুগত্য তার দৃষ্টিতে তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। 'যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেগুলো সে পূর্ণ করেছিল; আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করছি।' সে বলল, 'আমার বংশধরগণের মধ্য থেকেও ?' আল্লাহ বললেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি জালেমদের প্রতি প্রযোজ্য নয়'।' (সূরা আল- বাকারা: ১২৪)

এ মর্যাদা থেকে পাপকর্মকারীদের বাদ দিয়ে নবী ইবরাহীম (আ.) - এর পথপ্রদর্শন প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়েছে : 'এবং তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব ও এদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম; তার পূর্বেও নূহকে পথ প্রদর্শন করেছিলাম এবং তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকেও ; আর এভাবেই আমি সৎ কর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি।' (সূরা আল- আন'আম : ৮৪)

কুরআন মজীদে সুস্পষ্টভাবে আরো ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে কাউকে কাউকে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকেন : 'আল্লাহ আদম, নূহ ও ইবরাহীমের

বংশধর এবং ইমরানের বংশধরদের বিশ্ববাসীর ওপর মনোনীত করেছেন। এরা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সূরা আলে ইমরান : ৩৩- ৩৪)

উপরিউক্ত আয়াতগুলো থেকে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি :

১. আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শুনছেন। তিনি জানেন, মানুষের অন্তরে কী আছে বা তার জন্য মানুষের অন্তরে কতখানি ভালোবাসা ও বিশ্বাস আছে।

২. পরে তিনি তার ঈমানদার বান্দাদেরকে বর্ধিত আনুকূল্য বা মর্যাদা প্রাপ্তির যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য তাদের আরো পরীক্ষার সম্মুখীন করেন।

৩. আল্লাহর মনোনীত বা বাছাইকৃত বান্দা জাতিসমূহের ওপর মর্যাদা লাভ করেন।

৪. নবীদের প্রার্থনা কবুল করা হয়েছে এবং মানুষের কাছে প্রায়শই তাদের নিকটাত্মীয় ও সন্তান-সন্তুতি বা বংশধরদের দ্বারা আল্লাহর বাণী প্রচারে তাদেরকে শক্তি দান করা হয়েছে।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এবং তার চাচাত ভাই ইমাম আলী (আ.) ও তার বংশধরদের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলার এ অগ্রাধিকারের কোনো তারতম্য ঘটেনি।

আল্লাহর দ্বীন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) - এর মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ নেয়। তার পরে আর কোনো নবী আসবেন না। অতঃপর তার সন্তান- সন্তুতি বা বংশধরদের দায়িত্ব হয়ে দাড়ায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিকনির্দেশনা দানের জন্য কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবিকলভাবে আল্লাহর বাণী পৌছে দেয়ার কাজ অব্যাহত রাখা। শেষ নবী (সা.) - এর জন্য তার পূর্ববর্তী নবীদের তুলনায় আরো অধিক সমর্থন ও সহায়তার প্রয়োজন ছিল। এ কারনেই তিনি আল্লাহ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে তার বাণী প্রচার এবং উম্মাহকে পরিচালনার জন্য নিজের জীবদ্দশায় একটি পরিকল্পনা প্রপ্রণয়ন করে যান যা পৃথিবী থেকে তার বিদায় নেয়ার পরেও দিকনির্দেশনা দানের জন্য পালাক্রমে চলতে থাকে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃতভাবে ইসলাম পৌছে দেয়ার পরিকল্পনা য় কর্তব্যবদ্ধ ছিলেন। তাই তার পর মাত্র একজনকে তিনি উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেননি, বরং একের পর এক দায়িত্ব পালনের জন্য কয়েকজন

উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেন। তিনি তার উত্তরাধিকারী হিসাবে কেবল ইমাম আলী (আ.) - এর নাম উল্লেখ করেননি, বরং তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, 'আহলুল বাইত'- যারা কখনই কুরআন মজীদ থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন না- তারাই উম্মাহকে নেতৃত্ব দেবেন। কেবল একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র সৃষ্টি ইসলামের লক্ষ নয়। এর লক্ষ একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ সৃষ্টি করা, যা জীবনের প্রতিটি দিকে আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করবে। এ ধরনের দিকনির্দেশনা কেবল তাদের কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে যারা কখনই কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেন না। অতএব, এটি একটি সন্দেহাতীত বিষয় যে, অন্য কেউ নয়, বরং আহলে বাইতের সদস্যগণই পারেন মহানবী (সা.)- এর উত্তরাধিকারী হতে এবং তার মিশন পরিচালনা করতে।

মহানবী (সা.) - এর কন্যা হযরত ফাতেমা (আ.)- এর মর্যাদা উপলব্ধি করার জন্য ইসলামের প্রতি তার সেবার বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজন পড়ে না। তার সম্পর্কে মহানবী (সা.) - এর মন্তব্য এবং তার প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন, তা- ই আল্লাহ তা'আলার প্রতি হযরত ফাতেমা যাহরা (আ.) - এর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। মহানবী (সা.) বলেছেন : 'ফাতেমা আমার একটি অংশ; যে তাকে ক্রোধান্বিত করে সে আমাকেই ক্রোধান্বিত করে।' (সহীহ বুখারী : 'নবীদের আত্মীয়- স্বজনের সৎগুণ ও ফাতেমার সৎগুণ' অধ্যায়; আল- হাকিম : আল- মুসতাদরাক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.১৫৬; মাদারাজুন নাবুওয়াত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.৪৬০; সাওয়াইকু মুহরিকা, পৃ. ১৭৩) এ থেকে বোঝা যায়, মহানবী (সা.) নিশ্চিত ছিলেন যে, তার কন্যার ক্রোধ কেবল ভুল ও অন্যায়ের বিরুদ্ধেই হতে পারে, অন্য কিছুতে নয়।

মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, 'ফাতেমা জান্নাতে নারীদের নেত্রী বা ঈমানদার নারীদের নেত্রী।' (সহীহ বুখারী, 'নবুওয়াতের প্রমাণ' অধ্যায়, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৫) অতএব, আমরা এ মর্মে একমত যে, তিনি ছিলেন একজন নায়পরায়ণ ব্যক্তিত্বের মূর্ত প্রকাশ।

আরো বর্ণিত আছে যে, 'হযরত ফাতেমা যাহরা (আ.) যখনই মহানবী (সা.) - এর কাছে আসতেন তখন তিনি তাকে স্বাগত জানাতেন, তার জন্য দাড়িয়ে থাকতেন, তাকে চুমু দিতে ন, তার হাত

ধরতেন এবং নিজের জায়গায় তাকে বসাতেন।' (আল- হাকিম : আল- মুসতাদরাক, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫৪)

আল্লাহ তা'আলা যখন ফেরেশতাদের সামনে ঘোষণা করেন যে, তিনি 'কিসা'র (চাদরের) নিচের পাঁচজনকে ভালোবাসার জন্য সমগ্র বিশ্ব চরাচরকে সৃষ্টি করেছেন, তা থেকেই ফাতেমা (আ.) -এর মর্যাদা যে সকল দিক থেকে উচ্চতর ও বিশিষ্ট তা অনুধাবন করা যায়। 'কিসা'র ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের সামনে তাদের কে পরিচয় করিয়ে দেন : 'তারা নবীর পরিবারের লোক এবং আমার নবুওয়াতের সম্পদ। তারা হলো :ফাতেমা, তার পিতা, তার স্বামী ও তার দুই পুত্র (হাসান ও হোসাইন)।'

আল্লাহ তা'আলা এক ওহীর মাধ্যমে তার শুভেচ্ছাসহ নবী (সা.) - এর এক প্রর্থনার জবাব দিয়েছেন, 'আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে।' (সূরা আহযাব : ৩৩)

ইমাম আলী (আ.) যখন 'কিসা'র নিচে তাদের সমবেত হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা.) - কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন মহানবী (সা.) অত্যন্ত জোর দিয়ে ঘোষণা করলেন : 'হে আলী! আল্লাহর কসম, যিনি আমাকে তার বাণী বাহক হওয়ার জন্য নির্বাচন করেছেন এবং আমাকে তার নবী বানিয়েছেন, পৃথিবীতে মানুষের যে কোনো সমাবেশ, যাতে আমাদের অনুসারী ও নিবেদিত লোকেরা যোগদান করবে, সেখানে যে- ই এ ঘটনা বর্ণনা করবে, আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করবেন এবং ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়ে ঐ সমাবেশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতে থাকবে।' এতে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সা.) - এর এ ঘোষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলমানদের মাঝে এ বাণী স্থায়ীভাবে বিস্তৃত হতে থাকবে যাতে প্রজন্মসমূহ দিকনির্দেশনার জন্য আহলে বাইতের সদস্যদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে।

মহানবী (সা.) - এর নাতীদেরকে এক সময় নামাযের সেজদাকালে তার পিঠের ওপর দেখা যায়। তারা নিজে নেমে না আসা পর্যন্ত তিনি তার সেজদা দীর্ঘায়িত করেন এবং তাদেরকে নামিয়ে আনারা পারে তার সাহাবীদের চেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করে তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

ইমাম আলী (আ.) - এর পর তার দুই পুত্র ইসলামকে রক্ষা করেন। হযরত ইমাম হাসান (আ.) - এর পর তাদের পবিত্র সংগ্রামের দায়িত্ব এসে বর্তায় তৃতীয় ইমাম হোসাইন (আ.) - এর ওপর। ইমাম হোসাইন ইসলামের নীতি ও বিধান অনুযায়ী কপটতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে তার কৌশল নির্ধারণ করেন। তিনি এ বিষয়কে আরও বৈশিষ্টমণ্ডিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেন, যাতে উমাইয়্যা মুনাফিকরা তাকে শহীদ করার জন্য কোনো অলীক অজুহাত সৃষ্টি করতে না পারে। তিনি প্রয়োজনীয় সাবধানতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এমনভাবে যে, তার জিহাদ হবে মুনাফিকীর ওপর এক সুস্পষ্ট আঘাত।

তথ্য প্রমাণাদি থেকে জানা যায় যে, পরিস্থিতি সম্পর্কে ইমাম হোসাইন (আ.) –এর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল এবং সে অনুযায়ী তিনি একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে আত্মীয়- স্বজন ও নিষ্ঠাবান বন্ধুদের সাথে আলোচনা করেন, আন্তরিকতা ও ভালোবাসার ভিত্তিতে দেয়া তাদের পরামর্শ ও উপদেশসমূহ বিবেচনা করেন এবং সবশেষে একটি সিদ্ধান্ত মূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তিনি তার আত্মীয়- স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে ঐ পরিকল্পনার সাথে একমত করেন। ইমাম হোসাইন (আ.) - এর যে সব আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান আত্মীয়- স্বজন মদীনায় থেকে যান, মূলত তিনিই তাদেরকে মদীনায় রেখে যান সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে।

মহানবী (সা.) - এর পত্নী উম্মে সালমা, যিনি নবী কন্যা হযরত ফাতেমা যাহরা (আ.) - এর পরিবারের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন, যাকে মহানবী (সা.) কারবালার বালি সংরক্ষণের জন্য দিয়ে ছিলেন এবং যে বালি ইমাম হোসাইন (আ.) - এর শাহাদাতের দিন লাল হয়ে যাবে বলে বর্ণিত আছে, তিনিও মদীনায় থেকে গিয়েছিলেন। ইমাম হোসাইন (আ.) নিজের অসুস্ত কন্যাকে তার হফাজতে রেখে এসেছিলেন।

ইমাম হোসাইন - এই বোন হযরত যায়নাব (আ.) তার সাথেই ছিলেন। তবে তার স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে জাফর তাইয়্যার মদীনায় থেকে যান। কারণ, তিনি ছিলেন অসুস্থ। তবে কথিত আছে যে, ইমাম হোসাইন (আ.) যখন ইরাকের উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেন, তখন তাহিমে তার

যাত্রাবিরতিকালে আবদুল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে তিনি তার দুই পুত্রকে ইমাম হোসাইন –এর কাছে ন্যস্ত করেন, তার সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং মদীনায় ফিরে যান।

ইমাম হোসাইন (আ.) - এর এক ভাই মুহাম্মাদ হানাফিয়া মদীনায় ছিলেন। ইমাম খুব সতর্কতার সাথে ও ধৈর্যসহকারে তার পরামর্শ শুনতেন। পরে তিনি তাকে বলেন যে, তিনি মহানবী (সা.) - কে স্বেপ্নে দেখেছেন এবং তিনি তাকে বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রুত এগিয়ে যেতে বলেছেন। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, উপরিউক্ত ব্যক্তি বর্গের মদীনায় থেকে যাওয়ার পিছনে সুস্পষ্ট কারণ ছিল। ইমাম হোসাইন ২৮ রজব মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ইয়াযীদের ক্ষমতাসীন হওয়ায় মিল্লাতের, বিশেষ করে নিষ্ঠাবান ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের অসন্তোষের কথা তিনি জানতেন। এ ধরনের অসন্তোষ ও অস্থিরতার মধ্যে জনসাধারণ আহলে বাইত - এর কাছে সাহায্যের জন্য আসে। তিনি ইরাকের জনসাধারণের কাছ থেকে চিঠিপত্র পাওয়া শুরু করেন। চিঠিতে তারা সাহায্য ও দিকনির্দেশনার আবেদন জানায় এবং তার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে। এ ছাড়া তাকে, তার পরিবারবর্গ ও বন্ধুদেরকে নিজেদের পরিবারবর্গের অনুরূপ প্রতিরক্ষা প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৪ রামাযান ইমাম হোসাইন (আ.) মুসলিম ইবনে আকীলকে তার দূত হিসাবে ইরাকে পাঠান। তার মাধ্যমে ইরাকীজনগণকে তিনি আশ্বাস দেন যে, মুসলিম ইবনে আকীলের রিপোর্ট প্রাপ্তির পরই তিনি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

কাবা শরীফকে অপবিত্রকরণ থেকে রক্ষার জন্য ইমাম হোসাইন (আ.) পবিত্র হজ্জের একদিন আগেই ইরাকের উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। মক্কা ত্যাগের একদিন আগে তিনি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন :

‘হে জনগণ! নবী আদম (আ.) - এর বংশধর বা সন্তান- সন্ততির জন্য মৃত্যু এক সুন্দরী বালিকার গলার হারের মতো। নবী ইয়াকুব (আ.) যেমন নবী ইউসুফ (আ.) - এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আকুলভাবে প্রতীক্ষায় ছিলেন, আমিও তেমনি আমার পূর্ব পুরুষদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করছি। আমার শাহাদাতের স্থান নির্ধারিত হয়ে গেছে; আমি অচিরেই সেখানে পৌছে যাবো। আমি দেখতে পাচ্ছি, নেকড়েরা নাওয়াদিস ও কারবালার

মাঝখানে আমার দেহ টুকরা টুকরা করে কাটছে। তারা আমার দেহ নিয়ে শূন্য উদর পূরণ করছে। মৃত্যুর নির্ধারিত দিন কোনোভাবেই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আল্লাহর ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা; আহলে বাইত - এর ইচ্ছা তার ইচ্ছা থেকে আলাদা হবে না। হে জনগণ! যে আমাদের জন্য তার জীবন উৎসর্গ করতে চায় এবং তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করতে চায় সে আমাদের সঙ্গী হতে পারে। ইনশাআল্লাহ, আগামীকাল সকালে আমি রওয়ানা হচ্ছি।

কবি ফারাযদাক ইমাম হোসাইনকে পরবর্তী যাত্রা বিরতিতে বলেন যে, 'ইরাকীদের অন্তর আপনার সাথে, কিন্তু তাদের তরবারি আপনার বিরুদ্ধে। (বিহারুল আনওয়ার : ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪)

জিহাদে শরীক হওয়ার আশায় বিপুল সংখ্যক আরব ইমাম হোসাইন (আ.) - এর কাফেলার চারদিকে সমবেত হয়। জাবালায় যাত্রা বিরতিকালে ইমাম হোসাইন (আ.) খবর পেলেন যে, মুসলিম ইবনে আকীল শহীদ হয়েছেন। তিনি এ খবর লোকজনকে জানিয়ে বার বার একই লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করে বললেন : 'যারা জিহাদে অংশ নিতে চায় ও যাদের ধৈর্য আছে তাদেরই আমার সাথী হওয়া উচিত এবং বাকিরা ফিরে যেতে পারে।' (বিহারুল আনওয়ার : ১০ম খণ্ড, পৃ.- ১৮৪)

এর পর নতুন করে সমবেত হওয়া লোকজন বিদায় নিল এবং কেবল ইমাম (আ.) - এর বাছাই করা ব্যক্তিগণই ইমামের সাথে থেকে গেলেন।

ইমাম হোসাইন তখন তার সনাদলের উদ্দেশ্যে তার পরবর্তী তাৎপর্যময় ভাষণ প্রদান করেন যার অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

'হে লোকসকল! আল্লাহর নবী বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন একজন বাদশাহকে দেখেছে, যে বাদশাহ নিষ্ঠুর আচরণ করে, আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে, নবী (সা.) - এর সুন্নাতের বিরোধিতা করে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে পাপাচারী ও স্বেচ্ছাচারীভাবে শাসন করে, অথচ (সে ব্যক্তি) কথা ও কর্মের দ্বারা তার বিরোধিতা করে নি, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকেও সেখানে প্রেরণ করবেন, যেখানে ঐ বাদশাহকে পেরণ করা হবে (জাহান্নামে)। শোন, এ সব লোক (উমাইয়্যারা) শয়তানের অনুসরণ করে এবং আল্লাহর আনুগত্য করতে অস্বীকার করে। তারা ঝগড়া- বিবাদ ও

গালযোগ বিস্তার করে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে নীতিভ্রষ্ট ও জাহেল হয়ে যাচ্ছে, তারা রাষ্ট্রের অর্থ কুক্ষিগত করছে, হারামকে হালাল এবং আল্লাহ কর্তৃক বৈধ ঘোষিত বিষয়কে অবৈধ ঘোষণা করছে। মহানবী (সা.) - এর নিকটজন হিসাবে আমার ওপর তোমাদেরকে ভালো কাজ করা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলার এক বিরাট দায়িত্ব রয়েছে ...। আমি তোমাদের দিকনির্দেশনা দানের আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের প্রেরিত বার্তা বাহক ও অসংখ্য চিঠি পেয়েছি, যাতে তোমাদের এ প্রতিশ্রুতিও রয়েছে যে, তোমরা আমাকে অরক্ষিত রেখে ছেড়ে যাবে না এবং আমার প্রতি অবিশ্বস্ত ও বিশ্বাসভঙ্গকারী হবে না।' (আবু মাখনাফ, পৃ. ৪৩)

তার ভাষণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে :

১. ইমাম হোসাইন (আ.) সুস্পষ্টভাবে শাসকদের সম্পর্কে আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী বিধি- বিধান বর্ণনা করেছেন;

২. তিনি পরিস্কারভাবে মত প্রকাশ করেছেন যে, উমাইয়্যাদের আচরণ ছিল ইসলামী বিধানের বিপরীত;

৩. তিনি মহানবী (সা.) - এর বাণী উল্লেখ করে বলেছেন, যে শাসক আল্লাহপ্রদত্ত বিধানের বিরুদ্ধে কাজ করে, কথা ও কাজের মাধ্যমে তার বিরোধিতা করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য;

৪. তিনি নিজের থেকে অগ্রসর হননি, বরং লোকেরা তাকে যেতে এবং দিকনির্দেশনা দানে অনুরোধ করেছিল এবং

৫. তিনি তার শাহাদাত ঘনিয়ে আসার কথা উল্লেখ করেন এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণের কথাও ব্যক্ত করেন।

পরে ইমাম হোসাইন তার সহযোগীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং তাতে জোর দিয়ে বলেন, সত্য অনুশীলন করা হচ্ছে না এবং মিথ্যা পরিহার করা হচ্ছে না। এমতাবস্থায় ঈমানদারকে অবশ্যই তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করা উচিত। বর্তমান অবস্থায় মৃত্যু একটি আশীর্বাদ এবং জীবন হচ্ছে নির্যাতন। ইমাম হোসাইন (আ.) - এর এ ভাষণ তার সঙ্গী ও সাথীদের ঈমানের শক্তি আরো বৃদ্ধি করে।

হযরত যায়নাব জনসাধারণের মাঝে ইমাম হোসাইন –এর রক্ষ প্রদর্শন করায় তা প্রত্যাশিত ফল দিতে থাকে। ইবনে যিয়াদ বন্দি কাফেলা দ্রুত দামেস্কে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়। তাড়াহুড়া করে এবং তুলনা মূলকভাবে স্বল্প পরিচিতি রাস্তা দিয়ে গিয়েও উমাইয়্যা বাহিনীকে দামেস্কের পথে উপহাস, বিরোধিতা, এমনকি খোদ কুফায় বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। এসবের কিছু এখানে উল্লেখ করা হলো :

জনৈক অন্ধ অফিফ আজদী তার কান্যার সহায়তায় কুফায় বিদ্রোহ করেন। ইয়াযীদের যেসব লোক বন্দিদের এবং শহীদদের মাথা বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল তাকরিতের লোকজন তাদেরকে শহরে প্রবেশ করতে দেয়নি। লাবিনাবাসী চিৎকার দিয়ে বলে : 'হে নবীর বংশধরদের খুনীরা! আমাদের শহর থেকে বরিয়ে যাও।' মসূলবাসী ইয়াযিদী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয় এবং যথাযথ মর্যাদায় দাফনের উদ্দেশ্যে তাদের কাছ থেকে শহীদদের মাথাগুলো ছিনিয়ে নেয়। এ খবর শুনে ইয়াযিদী বাহিনী তাদের রাস্তা পরিবর্তন করে। তাব্ দূর্গের লোকেরা তাদের পানি সরবরাহে অস্বীকার করে এবং সংঘর্ষে ৬০০ ইয়াযিদীকে হত্যা করে। সেবুর শহরের লোকেরাও তাদের বিরোধিতা করে। হামার লোকেরা তাদের নগরের দ্বার বন্ধ করে দেয়। হাইমবাসীও ইয়াযিদী বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করে এবং শহীদদের মাথাগুলো ছিনিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে যে, দামেস্কে বন্দিদের পরিচয় প্রকাশ করার ও সাহস হচ্ছিলনা ইয়াযীদের। তবে হযরত যায়নাব ও উম্মে কুলসুম দামেস্কের বাজারে গিয়ে তাদের পরিচয় প্রকাশ করেন এবং ইয়াযীদের দরবারে গিয়ে কারবালার গণহত্যার বর্ণনা দিয়ে ঐ তথাকথিত মুসলিম শাসকের অনৈসলামী কাজের স্বরূপ উম্মোচন করেন।

তাদের মদীনায় ফিরে আসার ব্যবস্থা করা হয়। তবে তাদেরকে পথ বাছাইয়ের ইখতিয়ার দেয়া হয়। প্রথমে তারা কারবালায় যান। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে বুঝানো যে, জুলুমের বিরুদ্ধে সত্যের জয় হয়েছে। পরে তারা মদীনার দিকে অগ্রসর হন।

ইমাম হোসাইন (আ.) - এর রক্ত এতই কার্যকর প্রমাণিত হয় যে, মুনাফিকরা নিজেরাই তাদের নিফাকের কথা ঘোষণা করে। কুফায় ইবনে যিয়াদ বলে : 'আমরা বদরের প্রতিশোধ নিয়েছি।'

মদীনার গভর্নর ইমাম হোসাইন (আ.) - এর শাহাদাতের সংবাদ সংক্রান্ত চিঠি মহানবী (সা.) - এর রওজার ওপর ছুড়ে দিয়ে বলে : 'আমরা বদরের প্রতিশোধ নিলাম।' দামেস্কে ইয়াযীদ বলে : 'আমি আশা করি, বদরে নিহত আমার পূর্বপুষরা দেখবেন, কীভাবে আমি প্রতিশোধ নিলাম!'

মুনাফিকরা নিজেরাই তাদের পূর্ব পুরুষদের সাথে তাদের সম্পর্কের কথা ঘোষণা করে, যারা ছিল কাফের এবং মহানবী (সা.) - এর সাথে তথা ইসলামের সাথে যাদের সংশ্রব ছিল না। ইমাম হোসাইন (আ.) - এর রক্ত মুনাফিকদেরকে দিয়ে ইসলামের সাথে তাদের কপটতার কথা ঘোষণা করিয়েছে এবং সে সম্পর্কে হযরত যায়নাব (আ.) - এর প্রচার চিরকালের জন্য কুফর ও নিফাক এবং ইসলামী মূল্যবোধের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরেছে।

সূত্র : মাহজুবা, মে ২০০৩,

অনুবাদ : খলিফা সাইফুল ইসলাম

'শহীদরা হচ্ছেন সমাজে মোমবাতি। তারা নিজেদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সমাজকে আলোকিত করেন। তারা যদি আলো না ছড়ান তাহলে কোনো প্রতিষ্ঠানই আলোকিত হবে না।' –

শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাযা মোতাহহারী

কবিতা

ইমাম হোসেনের সংগ্রাম

ফকির গরীবুল্লাহ

হোসেন বলেন বিবি না কান্দিও আর।

আমা বাদে ভাল হবে তোমা সবাকার।

সহরবানু বলে ভাল কিসে হবে আর।

না রাখিলে মোর বংশ এজিদ কুফার।।

আপনি চলিল ফের করিতে লড়াই।

কুফরে সুপিয়া যাহ কি হবে ভালাই।।

এমাম বলেন বিবি না কান্দিও আর।

রদ না হইবে কভু কলম আল্লার।।

ঘিরিয়া রাখিল কুফর পানি বন্দ করে।

পানি পানি করে যত সব গেল মরে।।

তোমরা মরহ সবে পানির লাগিয়া।।

মেরা জিউ পানি বিনে যায় নেকালিয়া।।

আজ কালি পানি বিনে মরিব নিশ্চয়।

লড়িয়া মরিলে নাম রবে দুনিয়ায়।।

তোমা সবে সুপে যাই এলাহি আলমিনে।

আর কি ভরসা আছে কারবালা ময়দানে।।

জয়নাল আবদিনের তরে না দিবে ছাড়িয়া। য

যতনে তাম্বুর নিচে রাখ লুকাইয়া।।

এত বলি সবা হইতে বিদায় লইয়া।

চড়িল ঘোড়ার পরে বিসমিল্লা বলিয়া।।

চার রেকাবের উচা ঘোড়া জোরওয়ার।

হাওয়ায় মিশিয়া গেল ময়দান উপর।। [জঙ্গনামা]

কারবালা

কায়কোবাদ

এই কি কারবালা সেই? এই সেই স্থান?
এই সেই মহামরু? হেরিলে যাহারে
অশ্রু ঝরে দু'নয়নে কেঁদে ওঠে প্রাণ?
কত কথা পড়ে মনে, শিরায় শিরায়
প্রচণ্ড অনল- স্রোত হয় প্রবাহিত;
প্রাণের নিভৃত কক্ষে- হৃদয়ে- কন্দরে
কি যে এক শোক স্মৃতি হয় উচ্ছ্বসিত!
সেই স্থানে, কি বলিব বুক ফেটে যায়,
মুহাম্মদ মোস্তাফার (সা.) আদরের ধন,
ফাতেমার হৃদি- রত্ন নয়নের মণি,
বীরশ্রেষ্ঠ মোর্তযার স্নেহের নন্দন,
ইসলাম ধর্মের আলো, সৌন্দর্যের স্থান
হোসেন তাপস শ্রেষ্ঠ, আপন শোণিতে
প্রক্ষালিত মুসলেমের পাপতাপ রাশি
দিয়াছিলা ধর্মযুদ্ধে আপনাই প্রাণ,
স্মরিলে সে কথা আজি বিদরে হৃদয়।
এই কি কারবালা সেই? এই সে শ্মশান!
যাহার বালুকারাশি সিন্দুরের মত
হয়েছিল সুরঞ্জিত হোসেন শোণিতে।
যার প্রাণাধিক পুত্র আলী আকবর

"পিপাসা, পিপাসা" বলে বিপক্ষের তীরে
দিয়াছিল আপনাই অমূল্য জীবন।
যাহার করুণ স্মৃতি রয়েছে জড়িত
মরুময় কারবালার প্রতি অনেক অনেক
বালুকণা সাথে যার হাহাকার ধ্বনি
স্বর্গের দেবতাগণ শুনিয়া সতত
মর্মাহত কেদে কেদে আকুল পরান।
এই কি কারবালা সেই ? যার বালুকণা
"পিপাসা, পিপাসা" বলে উঠিছে কাদিয়া
দিবানিশি, বক্ষে যার আজিও অংকিত
শহীদের রক্তধারে বালুর উপরে-
"পিপাসা, পিপাসা" যার প্রতপ্ত সমীর
"পিপাসা, পিপাসা" বলে বেড়ায় ছুটিয়া
চারিদিকে সে উত্তপ্ত বালুর সাগরে।
ধ্বংসরূপী কারবালার ভীষণ প্রকৃতি
উম্মাদিনী বেশে করাঘাত করি-
"হা হোসেন, হা হোসেন" বলিয়া কাতরে
কেদে কেদে বার বার উঠিছে চিৎকারি।
কারবালার প্রান্তরে সে শব্দ করুণ
হইতেছে মুখরিত, জানি না কখন
এ পিপাসা মিটে যাবে জনমের তরে।
মিটিবে কি? মিটিবে না সপ্ত সিন্ধু জলে।
সে কথা স্মরণে আজি শিহরে পরান।

এই কি কারবালা সেই ? এই সে শ্মশান,

এই সেই মরুভূমি? সেই স্থান?

পিপাসা রাক্ষসী যেথা মূর্তিমতী হয়ে

"পিপাসা, পিপাসা" বলে কদিছে চিৎকারি।

কত শত পান্থ হেথা গভীর বিষাদে

কদিতেছে হায় হায় করিয়া সতত,

স্মরি সেই অতীতের করুণ কাহিনী।

নাই সেই নাই কীয় পাপিষ্ঠ এজিদ

মূঢ়মতী, নাই সেই দুর্ধর্ষ সেনানী

উমর, হোর নাই, নাই ও বেদ্দুল্লা,

তাহাদের অত্যাচারে- গোর উৎপীড়নে

শহীদ হইয়া গেছে সবংশে হোসেন

"পিপাসা, পিপাসা" বলে কারবালা প্রান্তরে,

তাহাদের মর্মান্তিক সে কাতার ধ্বনি

রয়েছে মিশিয়ে যেন দিবানিশি হায়

আজিও এ ফোরাতের কুল কুল তানে।

মহরম

শাহাদাৎ হোসেন

রুদ্র দুপর চলে আফতাব শিরে ঝলে

ছুটে জ্বালা চৌদিকে ইঙ্গিত মৃত্যুর,

কোনখানে নাহি চিন পানি এক বিন্দুর।

মরু- বালু ঝলকায়

উন্মনা ছুটে চলে বাতাসের হলকায়।

নাই পানি, নাই ছায়া জ্বল- জ্বল মরুকায়া

কারবালা প্রান্তর ঝাঁ- ঝাঁ করে চৌদিক,

শান্তির রেখা নাই, সান্তনা মৌখিক।

হাহাকার! হাহাকার!!

আজ বুঝি দুনিয়ায় জাগিয়াছে মহামার।

"লাও পানি জান যায়" ছাতি চাপি' পাঞ্জায়

কাতরায় পানি বিনে আজি তারা শাহারায়

'শরাবন তাহুরা'র সাকী যারা আখেরায়।

মা'র বুকে শুখা তন

মিলে নাকো ফোটা দুধ, কাঁদে শিশু আনমন।

কলেজার টুকরা সে সন্তান এক পাশে

জবে- করা কবুতর ছটফটি' মরে হায়!

ফাটে শোকে মা'র প্রাণ, 'দাও পানি ছেলে যায়'

দিল বুকে জনকের

ফিরে এল কোলে শিশু বুকে তীর জহরের।

শত্রুর রণভেরী ফোরাতের সীমা ঘেরি'

বাজে ঘন গৌরবে দামামার দমদম

ঝঙ্কৃত মুহুমুহু দামামার দমদম।।

আস্ফালি হাকে বীর,

কম্পন অরাতির পরাণী না মানে থির।

রক্তে 'নহর' বয় কোথা জয়- পরাজয়

নিষ্ঠুর তাণ্ডবে রুদ্র সে নেচে ঘুরে

খাত- উনে- জান্নাত আসমানে আখি ঝুরে!

আল্লাহর বাধা শের

হুঙ্কার ছাড়ে রোষে, খুন চায় জালেমের।

'হা হোসেন' অকসাৎ নিদারুণ শেলাঘাত

মূৰ্চ্ছিতা মা- ফাতেমা জান্নাৎ- দরজায়

জুলফিকার ধরে 'শেরে খোদা' পাঞ্জায়।

আসমানে দুনিয়ায়

ক্রন্দনে বাজে শুধু 'হা- হোসেন! হায়! হায়!''

এই সেই মহরম সে- দিনের সেই গম

ভুলেছ কি মুসলীম? 'দীন' তব ইসলাম,

সত্যের উপাসক তুমি 'ন্যায়- পয়গাম'

মুক্তির পন্থায়-

ছুটে চল নাশি' এই মিথ্যা ও অন্যায়।

হোসেন বধ

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

দুরাত্মা শিমর পাপী সহসা যাইয়া
বসিলেক বক্ষে চাপি'। নয়ন উন্মীলি'
হেরিলা রাজর্ষিবর নির্ম্মম মূরতি,
শিমর বসেছে বক্ষে শিরচ্ছেদ তরে।
কাতরে কহিলা বীর; "ওরে রে শিমর!
আজি পূণ্য জুম্মাবার, মধ্যাহ্ন- নমাজ
পড়িবার অবসর দে রে কিছুক্ষণ।
করিস নমাজ- শেষে মস্তক কর্ত্তন।"
এতেক শুনিয়া পাপী উঠি' দাড়াইল।
আনন্দে রাজর্ষিবর ভূমি হ'তে উঠি'
শোণিতে সমাপি' অজু, পশ্চিমাভিমুখে
সাষ্ঠাঙ্গে বিভুর তরে করিতে প্রণতি
দুরাত্মা শিমর পাপী চক্ষের পলকে
হানিল প্রচণ্ড অসি শিরোধি- শরব্যে।
খণ্ডিত হইল শির- দিব্য জ্যোতিঃরাশি
সহসা বিজলী- তেজে শিখার আকারে
বাহিরিয়া দেহ হ'তে দূর অন্তরীক্ষে
নিমেষে মিলায়ে গেল। পাপাত্মা শিমর
সত্রাসে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িল ধরায়।
খণ্ডিত হইল শির। কপিল ধরণী।

সহসা জলদ- জালে লুকাল তপন।
আধার হইল বিশ্ব। বিভু- সিংহাসন
কাপিলেক থরথর। নিদারুণ শোকে
প্রকৃতি ছাড়িল শ্বাস। উড়ি' রজোরাশি
আধারিল দশ দিশি। গগনম- লে
সহস্র সহস্র উল্কা জ্বলিয়া উঠিল।
বহিল প্রবল বেগে উজানে ফোরাত
বিপ্লাবিয়া বেলাভূমি কল্লোলে সমুদ্র
গর্জিল ভীষণ শ্বাসে বিষম বিষাদে।
যাদঃগণ তটদেশে পড়িল আছাড়ি'।
মড়মড়ি' তরুবাজি পড়িল ভাঙ্গিয়া।
বৃন্তচ্যুত হ'য়ে আহা! কুসুমনিকর
মহাশোকে ধরা- অঙ্গে পড়িল 'বিথারি'।
বিহঙ্গ করুণ কণ্ঠে করি' আর্তধ্বনি
পরিল অম্বরদেশ। যত পশু- যূথ
ছুটিল চীৎকারি' ঘোর দিক- দিগন্তরে
"হোসেন, হোসেন"! রবে। প্রস্তর নিচয়
শতধা- বিভক্ত হ'য়ে কারবালা প্রান্তরে
ছুটিতে লাগিল শোকে (প্রতপ্ত খোলায়
লাজপুঞ্জ যথা, হায়! হয় বিস্ফুটিত) !
ব্যাকুল মানবকুল। অস্থির মেদিনী।
আকুল নির্জরবৃন্দ। স্বর্গ বিকম্পিত।
প্রলয়ের শিঙ্গা যেন বিশ্ব বিদারিয়া

সহসা উঠিল বাজি' নাশিতে এ সৃষ্টি!

হা হোসেন! হা হোসেন! হায়! হায়!

প্রতি অণু- পরমাণু লাগিল ঘোষিতে। [মহাশিক্ষা কাব্য]

শোকের 'লু' হাওয়া [দেশ- কাওয়ালী]

কাজী নজরুল ইসলাম

বহিছে সাহারায় শোকের ' লু' হাওয়া

দুলে অসীম আকাশ আকুল রোদনে।

নূহের প্লাবন আসিল ফিরে যেন

ঘোর অশ্রু শ্রাবণ- ধারা ঝরে সঘনে।।

হায় হোসেনা হায় হোসেনা বলি'

কাঁদে গিরিদরি মরু বনস্থলী

কাঁদে পশু ও পাখী তরুলতার সনে।।

ফকির বাদশাহ গরীব ওমরাহে কাঁদে

তেমনি আজো, তারি মর্সিয়া গাহে,

বিশ্ব যাবে মুছে মুছিবে না এ আঁসু,

চির কাল ঝরিবে কালের নয়নে।।

ফল্গুধারা- সম সেই কাঁদন- নদী

কুল- মুসলিম চিতে বহে গো নিরবধি,

আসমান ও জমিন রহিবে যতদিন

সবে কাঁদিবে এমনি আকুল কাঁদনে।। (গুল- বাগিচা)

শহীদ কারবালা

ফররুখ আহমদ

উতারো সামান, দেখ সম্মুখে কারবালা মাঠ ঘোড় সোয়ার।
জ্বলে ধুধু বালু দোযখের মত, নাই সবজার চিহ্ন আর।
আকাশে বাতাসে কার হাহাকার? পান্থপাদপ লোহু সফেন,
আজ কারবালা ময়দানে মোরা দাঁড়ায়েছি এসে হায় হোসেন!
খুনের দরিয়া দেখেছি স্বপ্নে, কারবালা মাঠে দেখেছি খাব,
আহাজারি ওঠে দুনিয়া জাহান, ভাসে আসমানে কোটি বিলাপ;
হবে সয়লাব দুনিয়া জাহান- শান্ত মক্কা মুয়াজ্জমা;
জুলুমের তেগ হানবে জালিম পাবে না এখানে উদার ক্ষমা।
দিনান্ত ঝড়ে জুলুমাত- ম্লান শামিয়ানা টানে কোন বে- দীন?
কুফার দাওয়াত হয়েছে ব্যর্থ, দাড়াও এখানে সংগীহীন
দেখ এজিদের খঞ্জর ধার, শোন অগণন আর্তশ্বাস
দেখ সম্মুখে লানতের মত কারবালা মাঠ বিশ্বত্রাস।
উতারো সামান, দাড়াও সেনানী নির্ভীক- সিনা বাঘের মত।
আজ এজিদের কঠিন জুলুমে হয়েছে এ প্রাণ ওষ্ঠাগত,
কওমি ঝান্ডা ঢাকা পড়ে গেছে স্বৈরাচারের কালো ছায়ায়,
পাপের নিশানি রাজার নিশান জেগে ওঠে আজ নভঃনীলায়,
মুমিনের দিল জ্বলেছে বে- দিল জালিম পাপীর অত্যাচারে
নিহত শান্তি নিষ্কলংক শান্তিপ্রিয়ের রক্তধারে,
হেরার রশ্মি কেঁপে কেঁপে ওঠে ফারানের রবি অস্ত যায়!
কাঁদে মুখ ঢেকে মানবতা আজ পশু শক্তির রাজসভায়!

ওই শোন দূরে উষর মরুতে শত্রু সেনার পদধ্বনি,
নেজা তলোয়ার ঝলসিয়া ওঠে দূর মরুতটে উঠছে রণি
ফোরাতের তীরে ঘাঁটি পেতে করে এজিদ সৈন্য কুচকাওয়াজ
ইতারো সামান, মওতের মত এল কারবালা সামনে আজ।
ভীরু কাপুরুষ জীবন আকড়ি অন্তিম ক্ষণ করে স্মরণ;
বীর মুজাহিদ নির্ভীক বুকে করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন!
হোক দুশমন অগণন তবু হে সেনানী! আজ দাও হুকুম
মৃত্যু সাগরে ঝাপ দিয়ে মোরা ভাঙবো ক্লান্ত প্রাণের ঘুম!
হবে কারবালা মরু ময়দান শহীদ সেনার শয্যা শেষ
হে সিপাহ- সালার! জঙ্গী ইমাম আজ আমাদের দাও আদেশ!
বাজে রণ- বাজা, মাতে দুশমন কাপে শংকিত পৃথ্বীতল
দাও সাড়া দাও মুজাহিদ সেনা! সত্য পথের সাধকদল,
ফেরে চলো আজ দুশমন ব্যূহ বেহেশ্ত অথবা ফোরাত- তীরে
আসে অগণন শত্রু বাহিনী দিগন্ত- ধনু দুনিয়া ঘিরে!
হে ইমাম ! দেখ বিস্মিত রবি তোমার শৌর্য দেখছে আজ
তোমার দীপ্ত পৌরুষে স্লান শত্রু সেনার জরীন তাজ!
ভীরু বুজদিল পারেনা সইতে তোমার যুদ্ধ আমন্ত্রণ
তীর ছুড়ে ছুড়ে বহুদূর হতে শত্রু বাহিনী দেখায় রণ।
তৃষায় তোমার ছাতিফেটে যায়, কাদে তৃষাতুর শিশু ডেরায়,
নারীর কান্না শুনছো ইমাম ? ফোরাত এখনো রুদ্ধ হায়!
কারবালা মাঠ হল দিনান্তে মুজাহেদীনের শেষ কবর
ফোরাতের তীর রুদ্ধ এখনো ফোরাত জয়ের নাই খবর!
সূর্য এখনো নামেনি অস্তে তবু রাত্রির মরণ ছাপ,

নেভে তকদীরে আফতাব, নেভে মুজাহেদীনের প্রাণ প্রতাপ,
খিমার দুয়ারে আহাজারি ওঠে, কাদে শিশু- নারী মরুতৃষায়
ভরে হাহাকারে সাত আসমান অজানা রাতের ঘন ব্যথায়!
হে বীর! এখন চলেছ একাকী সকল সংগী হারায়ে, হায়
আহত সিংহ, ক্ষত তনুতটে ঝ'র্ছে রক্ত শত ধারায়।
এ কোন ক্লান্তি ঘিরেছে তোমাকে হে দিলীর শের, সংগীহীন।
ফোরাতের তীরে নিভে যায় রবি শেষ হয়ে আসে রক্ত দিন!
শত্রুর তীর বুকে এসে বিধে নাই ভ্রুক্ষেপ অসাবধানী!
দুধের বাচ্চা ম'রে গেছে চেয়ে পিয়াসের মুখে কাতরা পানি।
এক বছরের হাসিন শিশুকে তীর হানিয়াছে ভীরুর দল,
ভোলে এ শ্রান্তি ক্লান্ত সিংহ! জাগাও তোমার সুপ্তবল!
ঝাঞ্জারা সিনা তবুও সিংহ জয় করে নিল ফোরাত তীর,
আজলা ভরিয়া মুখে তুলে নিল ফোরাত নদীর শীতল নীর।
লাগেলো আবার তীরের আঘাত পানি ফেলে দিয়ে দাড়ালো বীর
হাহাকার করে উঠলো সভয়ে ফোরাত নদীর মুক্ত তীর।
বাজে রণ বাজা এজিদের দলে তলোয়ার তীর নেজার ছায়,
জাগে শংকার কাপন আকাশে, লাগে মৃত্যুর রং ধূলায়,
সে রণভূমিতে ক্লান্ত সিংহ চলে একা বীর মরণাহত;
ক্ষত তনু তার তীরের আঘাতে লুটালো বিশাল শিলার মত।
জীবন দিয়ে যে রাখলো বাচায়ে দীনি ইজ্জত বীর জাতির
দিন শেষে হায় কাটলো শত্রু সীমার সে মৃত বাঘের শির।
তীব্র ব্যাথায় ঢেকে ফেলে মুখ দিনের সূর্য অস্তা চলে,
ডাবে ইসলাম- রবি এজিদের আঘাতে অতল তিমির তলে,

কলিজা কাপায়ে কারবালা মাঠে ওঠে ক্রন্দন লোহ্ সফেন

ওঠে আসমান জমিনে মাতম; কাদে মানবতা :হায় হোসেন।।

কারবালায় ইমাম হুসাইন

মনিরউদ্দীন ইউসুফ

না, আমি বিদ্রোহী নই : যুদ্ধ করতে আসিনি আমি।

দেখ না আমার সৈন্য নেই, দুর্গ নেই, অস্ত্রাগার নেই।

আমার সঙ্গে আছে আমারী—স্ত্রী- পুত্র- কন্যা

আছে ভাই- বেরাদর ও কয়েকজন একনিষ্ঠ অনুগামী বন্ধু।

আমি কারবালা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছি একটি দায়িত্ববোধের শুভ তাড়নায়।

আমার মাতামহ আল্লাহর রাসূল –শেষ নবী;

তিনি প্রাচীন যুগের নবুওয়াতের শেষ ব্যক্তি

তার পরে কোনো নবী আর আসবেন না।

তিনি আধুনিক যুগের আল্লাহ প্রেরিত নকীব।

তিনি মানুষের মুক্তবুদ্ধির স্বাধীন ইচ্ছার উদ্বোধনকারী।

তাই প্রাচীন যুগের মতো আল্লাহ মানুষের কাজেকর্মে

কোনো হস্তক্ষেপ করবেন না।

না, মানুষের পাপে পাস্নাবন আসবে না

ভূমিকম্প না, ঝঞ্ঝা কিংবা শিলাবৃষ্টিও নয়।

মানুষের কর্মের দায়িত্ব মানুষের- যার বিচার হবে পরলোকে;

আমি হুসাইন, তার দায়িত্ব পালনের আগ্রহে আমি মরতে এসেছি

অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে এসেছি এই কারবালায়

আমি স্ত্রী- পুত্র ভাই- বেরাদর ও অনুগত বন্ধুগণ নিয়ে মরতে এসেছি।

এ ঐতিহ্য সকল পুরাতন নবী ও আমার মাতামহের।

আমি কারবালায় জিহাদের পতাকা উড্ডীন করে রেখে গেলাম।

তারপরই কোনো এক সময় ইমাম বলে ছিলেন,

আমরা শহীদ হতে এসেছি।

কাহিনী প্রচলিত আছে, মুসলমানের ইমাম

কারবালায় অবতীর্ণ হয়েই তার পার্শ্বচরকে

বলে ছিলেন, অনুভব করতে পারছ শীতল হওয়ার স্পর্শ?

হ্যাঁ কারবালা; এখানেই ছাউনি ফেলো; এখানেই আমার বিশ্রাম!

শাহাদাতের এ ঐতিহ্য আমাদের থেকেই ছড়িয়ে পড়বে

অনাগত যুগ যুগান্ত ধরে সব দেশে।

দেখ মনে রেখো, আমি যুদ্ধ করতে আসি নি;

আমার সৈন্য নেই, দুর্গ নেই, অস্ত্রাগার নেই।

আমি প্রতিবাদ করতে এসেছি, ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা নয়;

আমি শহীদ হতে এসেছি।

মানুষের প্রতিনিধিত্ব, দায়িত্ব ও শাহাদাতের ঝাণ্ডা উচু করে রেখে গেলাম।

মুক্তির আশায়

সোলায়মান আহসান

আকাশে বাতাসে এতো শোক কোনদিন কেউ দেখেনি
কেউ দেখেনি এমন মর্মবিদারী কান্নার রোল,
কেউ শোনেনি এমন ধ্বনি- হায় হোসেন! হায় হোসেন!
যে ধ্বনির মধ্যে মানবতার ক্রন্দন ধ্বনি মিশে।
যেদিন কারবালার প্রান্তরে লুটিয়ে পড়ল
মুহাম্মদ (সা.) - এর দৌহিত্র ইমাম হোসেনের পবিত্র দেহ
সেদিন লুটিয়ে পড়ল ইসলামের সাম্য ও মৈত্রীর সবুজ ঝাণ্ডা
পরমত সহিষ্ণুতা, মানুষের বাক স্বাধীনতা আর সত্যের মশাল নিভে গেল ফুৎকারে
আর তাই শোক ক্রমে পাথর হলো, পাহাড় হলো পৃথিবীর পেরেক হিসেবে।
আমরা সেই শোক বুকে নিয়ে পাড়ি দিতে চাই
মানুষের মুক্তির বার্তাবহ হয়ে মিথ্যা আর বাতিলের
জনপদ ছেড়ে দূরে বহুদূরে।

আহলে বাইতের ভালোবাসায় ইমাম শাফেয়ী (রহ.)

মুর্তাযা জাকাঈ সাভেজী

আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইদরীস বিন আব্বাস বিন ওসমান বিন শাফে' হাশেমী কারশী মোত্তালেবী- যিনি ইমাম শাফেয়ী নামে সমধিক খ্যাত- আহলে সুন্নাতের ইমাম চেয়ের অন্যতম। এ মহান ব্যক্তি ১৫০ হিজরীতে ফিলিস্তিনের গাজায় জন্ম গ্রহণ করেন। অবশ্য কেউ কেউ তার জান্মস্থান আসকালান, মিনা বা ইয়েমেন বলেও উল্লেখ করেছেন। শাফেয়ী অনেক দিন মাক্কা শরীফে থেকে ফিকাহশাস্ত্র শিক্ষা করে ছিলেন। এরপর তিনি মদীনায় চলে যান এবং আহলে সুন্নাতের ইমাম চতুষ্টয়ের অন্যতম মালেক বিন আনাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৭৯ হিজরীতে ইমাম মালেকের ওফাতের পরে তিনি ইয়েমেনে চলে যান এবং সেখানে কিছু দিন থাকার পর বাগদাদে চলে যান। তিনি ১৮৮ হিজরীতে বাগদাদ ত্যাগ করেন এবং হারান (ইরাকে অবস্থিত) ও শাম (সিরিয়া) হয়ে মিশরে যান। কিন্তু ১৯৫ হিজরীতে তিনি পুনরায় বাগদাদে ফিরে আসেন এবং ১৯৮ হিজরী পর্যন্ত সেখানে শিক্ষা দানের কাজে নিয়োজিত থাকেন। এর পর তিনি পুনরায় মিশরে গমন করেন। ২০০ হিজরীতে তিনি বাইতুল্লাহ শরীফেরে উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন এবং হজ্ব সমাপনের পরে মিশরে ফিরে যান। ২০৪ হিজরীতে তিনি মিশরের ফুস্তাতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম শাফেয়ী অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। গবেষকদের গবেষণা অনুযায়ী তার রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ১১৩ থেকে ১৪০টি। ইবনে নাদীম তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল ফিহরিস্ত'- এ- তার লিখিত ১০৯টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। তার লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থাবলীর অন্যতম হচ্ছে 'কিতাবুল উম্ম ' যা তার অনুসারী ইউসুফ বিন ইয়াহইয়া বুয়েতী (জন্ম ২৭০ হিজরী) কর্তৃক সংকলিত ও রাবি বিন সোলায়মান কর্তৃক বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। 'কিতাবুল উম্ম'- এর বিষয় বস্তু হচ্ছে ফিকাহ। গ্রন্থটি ১৯৬১- ১৯৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে কায়রো থেকে ৮খণ্ড- এবং ১৩২১- ১৩২৬ হিজরীতে

বুলা থেকে একবার চার খণ্ড- ও আরেকবার ১৩২৪-১৩২৫ হিজরীতে সাত খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

শাফেয়ী রচিত অপরাপর বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : 'আল মুসনাদ' (হাদীস গ্রন্থ), 'আহকামুল কুরআন', 'আসসুনান', 'আর রিসালাতু ফি উসূলিল ফিকহ', 'ইখতিলাফুল হাদীস', 'আসা সাবাকু ওয়ার রামী', 'ফাযায়েলু কুরাইশ ', 'আদাবুল কাজী', 'আল মাওয়ারিস' ইত্যাদি।

প্রাচীন কালের গবেষক ইবনে আবি হাতেম রাযী (জন্ম ৩২৭ হিজরী),আবি বাকর মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন মানজার (জন্ম ৩১৮ হিজরী),আবি জা'ফার বিন মুহাম্মাদ খুলদী (জন্ম ৩৪৮ হিজরী),মুহাম্মদ বিন হোসাইন বিন ইবরাহীম 'আছেম আবেরী (জন্ম ৩৬৩ হিজরী),ফখরুদ্দীন আবি আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ওমর রাযী (জন্ম ৬০৬ হিজরী) প্রমুখ শাফেয়ী সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তাতে তার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আধুনিক কালের গবেষক ওয়াস্তেন ফেল্ড (Wusten Feld) ইমাম শাফেয়ী এবং ৩০০ হিজরী পর্যন্ত তার শিষ্য - অনুসারীদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তেমনি মুস্তাফা মুনীর আদহাম,আবু মুহাম্মাদ যোহরাহ প্রমুখ ইমাম শাফেয়ী সম্বন্ধে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

স্বাধীন চিন্তাধারা পোষণকারী এ মহান মনীষী সব রকমের অন্ধত্ব থেকে মুক্ত থেকে নিষ্পাপ ও পবিত্র আহলে বাইত সম্বন্ধে স্বীয় মনোভাবকে বারবার সুস্পষ্টভাবে বয়ান করেছেন। তিনি মীনায় অবস্থানরত হাজীদের সম্বোধন করে যে সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। তিনি লিখেছেন :

ان كان رفضا حب آل محمد

فليشهد الثقلان انی رافضی

'আলে মুহাম্মাদের প্রতি ভালোবাসা যদি রাফযী হয় তাহলে জিন ও ইনসান সাক্ষী থাকুক যে, নিশ্চয়ই আমি রাফেযী।'

তিনি তার আরে কবিতায় আহলে বাইত –এর প্রতি তার ভালোবাসা এভাবে প্রকাশ করেছেন :

اذا فی مجلس ذکروا علیا

وشبليه و فاطمة الزكية

يقال: تجاوزوا يا قوم عن ذا

فهذا من حديث الرافضيه

هربت الي المهيمن من اناس

يرون الرفض حب الفاطميه

علي آل الرسول صلوة ربي

ولعنة لتلك الجاهلية

- 'যখন কোনো মজলিসে লোকেরা আলীকে স্মরণ করলো, আর তার দুই সিংহ শাবককে (তার দু'পুত্রকে) ও পবিত্র ফাতেমাকে, বলা হলো : হে লোকেরা! (সাবধান!) ওরা সঙ্গীমালজ্ঘন করেছে এ (ইসলামের সীমারেখা) থেকে, আর এ মত দেয়া হয় হাদীসে রাফেযিয়াহর ভিত্তিতে, (কিন্তু) আমি ঐসব লোক থেকে মুহাইমেনের (আল্লাহ তা'আলার) দিকে পালিয়ে গেলাম, ফলে (আমার মধ্যে) মুহাববাতে ফাতেমিয়াহ সুদৃঢ় হলো, আমার রবের সালাওয়া আলে রাসূলের ওপর, আর লা'নত ঐ জাহেলীয়াতের ওপর।'

ইবনে হাজ্র মাক্কীও ইমাম শাফেয়ী থেকে নিম্নোক্ত পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন :

يا اهل بيت رسول االله حبكم

فرض من االله في القرآن انزله

كفاكم من عظيم القدر انكم

من لم يصلي عليكم لاصلوة له

'হে রাসূলুল্লাহর আহলে বাইত ! তোমাদের (প্রতি) মুহাববাত, আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয করা হয়েছে তার নাযিলকৃত কুরআনে, এটাই যথেষ্ট যে, (তোমাদের মধ্যে) মহান মর্যাদা পুঞ্জীভূত হয়েছে, অতএব, নিঃসন্দেহে তোমরা হচ্ছে সেই ব্যক্তিগণ, যে ব্যক্তি তোমাদের ওপর সালাত (দরুদ) প্রেরণ করেনি তার জন্য কোনো সালাত (নামায) নেই।'

ইমাম হোসাইন (আ.) - এর শোকে ইমাম শাফেয়ীর কাসিদা (কবিতা)

মুওয়াফফাক বিন আহমদ খাওয়ারিমী তার 'মাকতালুল হোসাইন'- এ স্বীয় ধারাবাহিক সনদসূত্রে মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফেয়ী থেকে একটি কাসিদাহ উদ্ধৃত করেছেন। কাসিদাটি হচ্ছে :

تأوب همی و الفؤاد كتيب

وارق نومي فالسحار غريب

ومما نفي نومي وشيب لمتي

تصاريف ايام لهن خطوب

فمن مبلغ عني الحسين رسالة

و ان كرهتها انفس و قلوب

قتيلا بلاجرم كأن قميصة

صبح بماء الارجوان خضيب

فللسيف اعوال وللرمح رنة

وللخيل من بعد الصهيل نحيب

تزلزلت الدنيا لآل محمد

وكاذت لهم صم الجبال تذوب

وغارت نجوم واقشعرت كواكب

وهتک استار و شق جيوب

يصلي علي المهدي من ال هاشم

ويغزي نبوه ان ذالعجيب

لئن كان ذنبي حب آل محمد

فذالك ذنبي لست عنه اتوب

هم شفعائي يوم حشري وموقفي

اذا كثرتني يوم ذاك ذنوب

'আমার বেদনার প্রতিক্রিয়য় হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে গেলো এবং আমার নিদ্রা হরণ করে নিলো, এরপর নিদ্রা যে কত দূরে। আর যা আমার নিদ্রা কড়ে নিয়েছে এবং আমাকে করে দিয়েছে তা হচ্ছে কালের সেই বিবর্তন যা তাদের জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিলো। অতঃপর কে আমার বাণীকে হোসাইনের কাছে পৌছে দবে? যদিও এ বাণী সকল ব্যক্তি ও হৃদয় অপছন্দ করবে, তা হচ্ছে নিরপরাধ শহীদ যেন এই যে, তার জামাকে রক্তিম রং মেশানো পানিতে ডুবিয়ে রাঙ্গানো

হয়েছে। অতএব, তলোয়ারের জন্যই বিলাপ ও আর্তনাদ এবং বর্শার জন্যই বেদনার দীর্ঘশ্বাস, আর হ্রেষা ও দাবড়ানোর পরে অশ্বের জন্য রয়েছে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন।

আলে মুহাম্মাদের জন্য দুনিয়া প্রকম্পিত হবে, যেহেতু অচিরেই তাদের (বেদনার) কারণে পাহাড়গুলো বিগলিত হয়ে যাবে। তারকারাজি ছিটকে পড়েছে ধ্বংস হয়ে গেছে, পোশোকসমূহ ছিন্ন হয়েছে, জামার গলাবন্ধ ফেটে গেছে। হাশেম বংশের লোকেরা যারা স্বীয় সন্তানদেরকে মুহাববাতের শিক্ষা দান করেন তাদের পক্ষ থেকে মাহদীর প্রতি দরুদ; আলে মুহাম্মাদের প্রতি মুহাববাত যদি গুনাহ হয়ে থাকে তাহলে এ হচ্ছে সেই গুনাহ যা থেকে আমি কখনোই তওবাহ করবো না। কিয়ামতের দিন তারাই আমার শাফায়াতকারী যেদিন আমার গুনাহ পরিমাণ হবে অনেক বেশি; সেদিন তারাই আমার সাহায্যকারী।'

অনুবাদ :নূর হোসেন মজিদী,

সূত্র: কেইহানে ফারাঙ্গী, সংখ্যা - ১০২৩- ০২৮৯

'হে মানব জাতি! আমি তোমাদের মাঝে অতি ভারী মহান দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি; যদি তোমরা তা ধরে রাখো তবে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না- একটি হলো আল্লাহর কিতাব যার মধ্যে রয়েছে হেদায়াতের নুর, অপরটি আমার আহলে বাইত। অতঃপর হাউজে কাওসারে যাওয়া পর্যন্ত এই দুই জিনিস কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না।'

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) (তিরমিযী, মুসলিম)

আশুরা পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ

ইয়াযীদের দরবারে ইমাম সাজ্জাদ (আ.)

এম. তোরাবী

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর পুত্র ইমাম আলী ইবনে হোসাইন ওরফে যায়নুল আবেদীন (আ.) কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তার আল্লাহ - ভক্তি, ইবাদাত ও দো'আ প্রবাদতুল্য এবং তার অভিধাসমূহের অন্যতম হচ্ছে 'সাইয়্যেদুশ সাজেদীন' ও 'ইমাম সাজ্জাদ'। কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনা বিশ্বের সবচেয়ে যুগান্তকারী ঘটনা। এই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে দামেস্কে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) - এর ঐতিহাসিক উক্তি। এ সুযোগটি তিনি পান বন্দি অবস্থায়। একদিন যখন ইয়াযীদের সরকারি প্রচারক মিম্বরে উঠে ইমাম আলী (আ.) ও তার সন্তানদের নিন্দা এবং মু'আবিয়া ও তার বংশধরদের গুণকীর্তন করতে থাকে তখন ইমাম সাজ্জাদ জনগণকে উদ্দেশ্য করে সেই সত্য উম্মোচন করেন যা তাদের নিকট অবগুণ্ঠিত ছিল।

বলাবাগুল্য যে, ইমাম সাজ্জাদ (আ.) জনগণকে একথা বলার সুযোগ সহজে পান নি; বহু সমস্যা ও প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করেই তিনি তা অর্জন করেন। তাই এটি ছিল একটি মহামূল্যবান সুযোগ। ইমাম সাজ্জাদের জন্য এর চেয়ে আর কী উৎকৃষ্টতর হতে পারতো যে, তিনি সেই মিম্বরেই আরোহণ করেন যেখান থেকে তার মহান পূর্বপুরুষগণকে গালমন্দন্দ করা হতো। তিনি সখান থেকেই বনি উমাইয়্যার অপপ্রচারণাকে ধূলিসাৎ করে নিজ বক্তব্যে জনগণকে আলোকিত করেন- যারা বহু বছর ধরে সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল।

মহান আল্লাহর ইচ্ছা না হলে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) ও তার ফুফু হযরত যায়নাব (আ.) - এর পক্ষে আহলে বাইতের মহত্ব এবং ইসলামে তাদের সুমহান অবস্থান সম্পর্কে বলার সুযোগ হতো না।

মূলত মহানবী (সা.) - এর প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু যার গিফারী (রা.) ইতঃপূর্বেই এ বক্তব্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন; তিনি মু'আবিয়ার বিপথগামিতার প্রকাশ্য ও তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, খেলাফত প্রকৃত পথ থেকে কক্ষচ্যুত হয়েছে তখন তিনি খলিফার উপস্থিতিতে এবং মাঠ- ঘাট ও বাজার- বন্দরেও তার বিরোধিতা ও সমালোচনা করতে

শুরু করেন। তাকে ইসলামের পুনরুজ্জীবন দানকারী ও বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে। কারণ, তিনি ছিলেন মহানবী (সা.) - এর একজন সঙ্গী এবং সাহাবীদের তালিকায় তিনি অন্যদের থেকে অগ্রগণ্য ছিলেন। আবু যার নির্বাসিত হন ও সমাহীন দুর্দশা ভোগ করেন, তথাপি তিনি কখনো চুপ করে বসে থাকেন নি। তিনি 'রাবযা' নামক স্থানে অসহায় অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

মু'আবিয়ার ক্ষমতায় আরোহণের পর আরো কিছু সংখ্যক লোক হযরত আবু যার গিফারীর অনুসারী হয়ে কাজ করেন। আবু যার দুনিয়া থেকে বিদায় নন। কিন্তু হযরত হুযর বিন আদী কিন্দি তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে তা - ই বলতে থাকেন যা ন্যায়সঙ্গত ছিল। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাঙ্গে মু'আবিয়ার বিরোধিতা করেন। এজন্য তাকে জীবন দিতে হয়। আবু যার (রা.) এবং হুযর বিন আদী ও তার বন্ধুগণ উমাইয়্যাদের অন্যায় প্রচারণার বিরুদ্ধে যে জবাব দিয়েছিলেন তা যথেষ্ট ছিল না। তার আহলে বাইতের সদস্যদের কারো পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব পালন জরুরি হয়ে পড়ে। এ কারণে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) মিম্বরে আরোহণ ও জনসমক্ষে দাড়ানোর সুযোগকে মূল্যবান বিবেচনা করলেন।

সরকার নিযুক্ত এক ফতোয়াবাজ মিম্বরে আরোহণ করে আল্লাহর প্রশংসা করলো, অতঃপর ইমাম আলী (আ.) ও ইমাম হোসাইন (আ.) - এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর পর উচ্চকণ্ঠে মুআবিয়া ও ইয়াযীদের গুণকীর্তন করলো। সমস্ত পূর্ণ কর্মের সাথে মু'আবিয়া ও ইয়াযীদকে যুক্ত করলো এ বলে যে, পুণ্যাত্মা পিতা ও পুত্র সমস্ত উত্তম কর্মও নীতি প্রস্রবণধারা এবং জনগণ যা কিছু অর্জন করেছে তার মূলে রয়েছে আবু সুফিয়ানের বংশধর। পৃথিবীতে ও মৃত্যুর পরের জীবনে সফলকাম হওয়ার জন্য জনগণকে তাদের ওপর নির্ভর করতে হবে এবং তাদেরকে মান্য ও অনুসরণ করাই হচ্ছে স্বর্গীয় সুখ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়।

তখন ইমাম সাজ্জাদ (আ.) কোনো শঙ্কা না করে উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'হে বক্তা! তোমার জন্য দুঃখ হয়। মানুষকে তোষণের জন্য কেনো তুমি আল্লাহর ক্রোধকে নিজের দিকে ডেকে আনছো? তোমার জানা উচিত যে, তোমার গন্তব্য হচ্ছে নরক।'

তার এ মন্তব্য ছিল দামেস্কের সেই প্রচারকের বিরুদ্ধে যে ইয়াযীদকে তুষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহকে অসুন্তুষ্ট করেছিল, আর এভাবে সে তার জাহান্নাম- যাত্রাকেই নিশ্চিত করেছিল। কিন্তু ইমামের এ বাণী ছিল এমন সকল প্রচারকেরই উদ্দেশ্যে, যারা সৃষ্টিকে খুশি করার উদ্দেশ্যে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। ইমাম এভাবে সমস্ত মুসলমান বক্তাকেই শিক্ষা দিলেন যে, স্বর্গীয় সুখ প্রাপ্তির উপায় হচেছ আল্লাহর বাণীকে কোনো সংযুক্তি বা পরিবর্তন ব্যতীত মানুষের কাছে পৌছানো। মানুষকে তুষ্ট করার জন্য তাদের এমন কিছু বলা উচিত নয় যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে এবং আল্লাহ কুরআন মজীদে যা বলেছেন তার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে :

'নিশ্চিতভাবেই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে এবং আমরা অবগত তাদের নাফস তাদেরকে যে কুমন্ত্রণা দেয় সে সম্পর্কে। আমরা তাদের ঘাড়ের শাহ রগের চেয়ে তাদের নিকটবর্তী। যখন দু'জন ফেরেশতা তার ডানে ও বামে সংলগ্ন হয়ে বসে তখন সে এমন একটি শব্দও উচ্চারণ করে না যা পর্যবেক্ষক লেখকদ্বয় দ্বারা সাথে সাথেই লিপিবদ্ধ হয় না।' (সূরা ক্বাফ : ১৬- ১৮)

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) অজ্ঞ প্রচারকদের এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাদেরকে সাবধান করেন এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যে, মানুষের ভালো- মন্দ সমস্ত কর্মই লিপিবদ্ধ হচ্ছে এবং কোনো মানুষের উচিত নয় আল্লাহর সৃষ্ট জীবের তুষ্টির জন্য তারা ক্রোধকে। অগ্রাহ্য করা। কারণ, এমন একদিন আসবে, যেদিন সে যাদের ক্ষমতাবান বিবেচনা করতো, তারা তার জন্য কিছুই করতে পারবে না।

খলিফার প্রচারককে ভর্ৎসনা করে ও তার ধর্মবিরোধী নিন্দা জ্ঞাপন করে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) ইয়াযীদের দিকে ফিরলেন ও বললেন, 'তুমি কি আমাকেও এ কাষ্ঠখণ্ডসমূহের ওপর আরোহণের অনুমতি দেবে যাতে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ও শ্রোতাদের আতিমক পুরুস্কারের জন্য কিছু বলতে পারি?'

এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) –এর প্রজ্ঞার ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ, তিনি 'মিম্বরে' আরোহণের অনুমতি চাননি, বরং কাষ্ঠখণ্ড আরোহণের অনুমতি চান। তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, কোনো কিছুকে মিম্বরের আকৃতি দিয়ে যে কেউ তাতে বসে কিছু বললেই তাকে মিম্বর বলা

যায়না, বরং এরূপ কাষ্ঠখণ্ডসমূহ মিম্বরের জন্য ধ্বংসাত্মক। যে কেউ ধর্ম প্রচারকের ছদ্মবেশ ধারণ করলেই তাকে ধর্মের প্রচারক বলা চলে না। তিনি আরো বুঝাচ্ছিলেন যে, যে প্রচারক নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে পার্থিব স্বার্থের আশায় বক্তব্য প্রদান করে এবং মানুষকে খুশি করতে আল্লাহর বিরাগ ভাজন হয়, তার পরিণতি দোযখ। অন্যদিকে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু বলতে চান।

তিনি যা বোঝাতে চাচ্ছিলেন তা হচ্ছে, প্রচারক যা বলছিল তা আল্লাহর ক্রোধকে ডেকে আনবে এবং ইমাম আলী (আ.) - এর মতো মানুষকে গালমন্দ করে ও ইয়াযীদের মতো লোকের প্রশংসা করে কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব নয়। তিনি আরো বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে, শ্রোতারা এসব বক্তব্য শ্রবণে কোনো আত্মিক পুরুস্কার তো পাবেই না, বরং তা তাদের পাপের বোঝা ভারী করবে এবং তাদেরকে সুপথ থেকে বিপথগামী করবে।

জনগণ ইমাম সাজ্জাদকে বক্তব্য প্রদানের অনুমতি দেয়ার জন্য ইয়াযীদের ওপর চাপ প্রয়োগ করলে প্রথমে সে প্রবলভাবে তা অগ্রাহ্য করে এবং বলে, 'এসব লোক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আবহে প্রতিপালিত হয়েছে; আমি যদি তাকে কথা বলতে দেই তাহলে সে আমাকে লাজ্জায় ফেলবে।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনগণের আকাঙ্ক্ষারই জয় হলো, ইমাম সাজ্জাদ (আ.) মিম্বরে দাড়ালেন। তিনি যেভাবে কথা বললেন তাতে লোকজন আন্দোলিত হলো, তারা কেদে ফেললো। ইমাম হোসাইন (আ.) - এর পুত্র ইসলামী সমাজে আহলে বাইতের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করলেন, তাদের মেধা ও মহত্ত্বের বিষয়ও জনগণকে অবহিত করলেন। তিনি সে সাথে একটি মাপকাঠি উপস্থাপন করলেন, যা সকল জ্ঞানীর কাছে গৃহীত। তিনি বললেন, 'যারা জনগণকে নেতৃত্ব ও পথ দেখাতে চান, তারা অবশ্যই জনগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হবেন এবং শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখেই তাদের নির্বাচিত করা হবে।'

পবিত্র কোরআন এ যৌক্তিক মাপকাঠি সম্পর্কে বলছে, 'সেই ব্যক্তি কি সত্যের দিকে অন্যকে পরিচালিত করতে পারে অন্য কেউ তাকে সুপথ না দেখালে যে নিজেই সত্যপথের সন্ধান পায় না ? তোমাদের কী হলো ?তোমরা কেমন ফায়সালা করছো?' (সূরা ইউনুস : ৩৫)

এ আয়াত তার্কের খাতিরে ব্যবহৃত হয়নি, বরং লোকজনের মনোযোগকে এ যৌক্তিক মাপকাঠির দিকে আহবান করতে ব্যবহৃত হয়েছে যে, যিনি অধিক জ্ঞানী তিনিই অন্যদের পরিচালিত করতে পারেন, অন্যরা নয়। যদিও মক্কার বহু দেব-দেবীর উপাসকরা মহানবী (সা.)-বেদুইন নবুওয়াতের ওপর বিশ্বাস করে নি, তথাপি তারা এ যৌক্তিক মাপকাঠির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতো যে, যদি তাদের জাতির জন্য আল্লাহকে একজন নবী নিযুক্ত করতে হয়, তাহলে তিনি একজন মহামানবই হবেন, যদিও তারা মহত্বের উপায় ও শ্রেষ্ঠত্বের উৎস সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করছিল। তারা ভাবতো যে, মহত্ব বিপুল পরিমাণ সম্পদ অথবা অনেক পুত্র ও আত্মীয়-স্বজন বা ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। তাই তারা বলতো, আল্লাহ যদি আমাদের অর্থাৎ হেজাযবাসীর জন্য একজন নবী নিযুক্ত করতেন তাহলে কেনো তিনি তা মক্কার কোনো মহান ব্যক্তি, যেমন: ওয়ালিদ বিন মুগিরা মাম্জুসী বা তায়েফের মহান ব্যক্তি উরওয়া ইবনে মা'সদ সাকাফীকে নিয়োগ দিলেন না?

এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদ বলছে, 'তারা প্রশ্ন করে কেনো কুরআন এ দুই শহরের দুই মহান ব্যক্তির কোনো একজনের ওপর নাযিল হলো না?' (সূরা যুখরুফ : ৩১)

তাদের এ ভুলের কারণ হচ্ছে তারা সম্পদ ও বাহ্যিক ক্ষমতা এবং খ্যাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠিরূপে বিবেচনা করতো, জ্ঞান, নৈতিক ও অন্যান্য মানবিক গুণকে নয়। তাই তাদের বিশ্বাস ছিলো না যে, শুধু হেজাযে নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) তার ঘোষণায় সেসব গুণের কথা উল্লেখ করে ছিলেন যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে যায় বা এক জাতি ছাড়িয়ে যেতে পারে অপর জাতিকে। তিনি এ বিষয়েও সুস্পষ্টরূপে বলেন যে, নবী (সা.) - এর পবিত্র আহলে বাইত অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন, অন্যরা তাদের সমর্মযাদার নয়। কারণ, মহান আল্লাহই তাদের শ্রেষ্ঠরূপে প্রেরণ করেছেন এবং তাদের মানবতার দিকনির্দেশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করেছেন।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) সাথে বললেন, 'হে লোকসকল! আল্লাহ আমাদের ছয়টি জিনিস দিয়েছেন এবং আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যদের ওপর সাতটি স্তরের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে

যা একজন ব্যক্তির অপর একজনের ওপর বা এক জাতির অপর এক জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্বের মৌলিক ভিত্তি। আমাদের ধৈর্য দেয়া হয়েছে যা জনগণকে পুনর্গঠন করতে বা হেদায়াত প্রদান করতে জরুরি। উদারতা- যা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য, তা আমাদের স্বভাবগত। বাগ্মিতাও – যা লোকজনকে পথ দেখাতে এবং তাদের সৎ পথে আনতে ও অসৎ পথ থেকে বিরত রেখে আলোকিত করতে ও জিহাদে উজ্জীবিত করতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আত্মোৎসর্গ আমাদের পরিবারের বিশেষ। সাহসিকতা - যার ওপর নেতৃত্ব নির্ভরশীল, তা আমাদের দেয়া হয়েছে। ঈমানদারদের বন্ধুত্ব ও স্নেহশীলতা হচ্ছে পরিচালনা ও প্রজ্ঞার রহস্য, তা আমাদের প্রদান করা হয়েছে; আর বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য লোকজনের কাছ থেকে জবরদস্তি করে আদায় করা সম্ভব নয়।'

এসব বক্তব্য উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তিনি বোঝাতে চান, হে ইয়াযীদ ! এটি আল্লাহর ইচ্ছা যে, ঈমানদার লোকদের উচিত আমাদের ভালোবাসা এবং তাদের এ থেকে বিরত রাখাও সম্ভব নয়; এও করা সম্ভব নয় যে, তারা অন্যদের প্রতি বন্ধুবৎসল হবে, আর আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে।

অতঃপর ইমাম সাজ্জাদ (আ.) বললেন, 'অন্যদের ওপর সে যে- ই হোক না কেনো, আমাদের এসব বিশেষত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল, তার উত্তরসূরি আলী ইবনে আবি তালিব (আ.), হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব বেহেশতের পথযাত্রী, জা'ফর ইবনে আবি তালিব (আ.), যারা এই কওমের নবীর দৌহিত্র; মাহদী (যিনি নির্যাতিতদের উদ্ধারকর্তা) - দ্বাদশ ইমাম, হাসান ও হোসাইন (আ.) এবং এরা সবাই আমাদের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভব হলে ইয়াযীদ এই মুহূর্তে এসব বিশেষত্ব নিজের ওপর আরোপ করুক। অন্যকথায়, কেবল ইতিহাসের বিকৃতি সাধন করেই সম্ভব হবে যা আমাদের আছে তা তার পক্ষে অর্জন করা, সেই সাথে তার লজ্জাকর ও অসৎকর্মগুলোকে উপেক্ষা করে তার অবস্থা পুননির্ধারিত করা। অন্যথায় যতদিন ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহ আমাদের বনী হাশেমের মাঝে বর্তমান, যেমন আবু তালিব, তার ভাই হামযা এবং তার পুত্ররা অর্থাৎ আলী ও জা'ফর এবং ইমাম আলীর পুত্র হাসান ও হোসাইন (আ.), আর এ ইতিহাস যতদিন সংরক্ষিত আছে যে, তারা আল্লাহর সবচেয়ে অনুগত বান্দা, বিশেষত যখন

আল্লাহর নবী ও বনী হাশিমের সাথে সংযুক্ত, ততদিন কীভাবে সম্ভব আমাদেরকে অন্ধকারে রেখে বা আমাদের অমর্যাদা করে বা আমাদের অধিকার অন্য কাউকে দিয়ে বা অন্য কারো দিকে ঘুরে গিয়ে আমাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা?'

এসব বলে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) নিজের পরিচয় উম্মোচন করলেন, আর পরিস্থিতি এমন দাড়ালো যে, ইয়াযীদ বাধা দান করতে বাধ্য হলো, হীন উদ্দেশ্যে সে মুয়াজ্জিনকে নামাযের জন্য আযান দিতে বললো। মহান আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ইমামও সে সময় নিশ্চুপ রইলেন। অতঃপর তিনি যখন আরো একটি সুযোগ পলেন তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন। মুয়াজ্জিন বললো : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।' তখন ইমাম সাজ্জাদ (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর সাম্মানার্থে তার পাগড়ি খুলে ফেললেন এবং বললেন : 'হে মুয়াজ্জিন ! তুমি এই মাত্র নবীর নাম উচ্চারণ করলে তার নামে তোমাকে চুপ করতে বলছি।'

সূত্র:মাহজুবা :সেপ্টেম্বর ২০০৫
অনুবাদ : এন.জেড.আলী হোসাইন

কারবালার পর পবিত্র মক্কা ও মদীনায় ইয়াযিদী তাণ্ডবলীলা

মাওলানা শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহ্‌লভী (রহ.)

[ইয়াযীদ মুসলিম জাহানের ক্ষমতারোহণ করে মাত্র সাড়ে তিন বছর রাজত্ব করে। তার দ্বারা মুসলমানদের কোনো উপকার হয়নি; বরং যা হয়েছে তা হলো চরম দুঃখ, লাঞ্ছনা ও লোমহর্ষক গঞ্জনা। তার সৈন্যরা প্রথম বছর কারবালায় ইমাম হোসাইন (আ.) - কে বাহাত্তর জন সঙ্গী-সাথীসহ হত্যা করে, দ্বিতীয় বছর পবিত্র মদীনা শরীফে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে এবং তৃতীয় বছর পবিত্র মক্কা নগরীকে দু'মাস ধরে অবরুদ্ধ রেখে পবিত্র কাবা গৃহে অগ্নি সংযোজন করে। এখানে আমরা কারবালার পর ইয়াযীদ বাহিনী কর্তৃক মদীনা ও মক্কায় যে হত্যালীলা ও লোমহর্ষক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তার কিয়দংশ বর্ণনার আশা রাখি।]

কারবালায় হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) - এর শাহাদাতের পরে মদীনায় ইয়াযীদ কর্তৃক যে লোমহর্ষক ও মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয় এটাই 'হাররা'র ঘটনা নামে অভিহিত। এ স্থানটি মদীনা নগরী থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত। মদীনা তৈয়বাতে যে সব হত্যাকাণ্ড, সংঘর্ষ ও এ পবিত্র স্থানের অবমাননার ঘটনা ঘটেছে সে সব ঘটনা বর্ণনার দ্বারা যদিওবা পবিত্র অন্তর বিশিষ্ট লোকদের অন্তর দুঃখভারাক্রান্ত হয়, কিন্তু হুজুর আকরাম (সা.) এ সমুদয় অঘটনের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, তাই এ সম্পর্কে এখানে কিঞ্চিত আভাস দেয়া দরকার। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি মদিনাবাসীকে কষ্ট দেবে এবং ভীতসন্ত্রস্ত করবে, সে দুনিয়া ও আখিরাতের আযাবে গ্রেপ্তার হবে। 'হাররা' এলাকায় যে অঘটন ঘটেছে হাদিস দ্বারা এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন যে, 'হাররা'র' ঘটনা এ হাদিসের দ্বারাও সত্যায়িত করা হয়। তিনি এরশাদ করেছেন- মদীনা শরীফ আবাদ হওয়ার পর আবার বিরান হয়ে যাবে, মানুষও এ স্থান ছেড়ে চলে যাবে এবং মরু এলাকার পশুপক্ষী এখানে এসে বসবাস করবে। কিন্তু বাস্তব এই যে, মদীনার এ অবস্থা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দেখা দেবে, ইমাম নববী কথা বলেছেন।

কেননা, কোনো কোনো হাদিসে যে সমুদয় বর্ণনা পাওয়া যায়, এতে বুঝা যায় যে, 'হাররা'র ঘটনায় এটা পরিলক্ষিত হয়নি। যেমন- ইবনে আবি শাইবা উল্লেখ করেছেন, এ পবিত্র নগরী চল্লিশ বছর যাবৎ বিরান হয়ে পড়ে থাকবে। তথায় হিংস্র জন্তু এবং পশু- পাখি বসবাস করবে। অতঃপর মুজনিয়া গোত্রের দু'জন রাখাল এখানে এসে অবাক হয়ে পরস্পরকে বলবে, এখানকার জনপদ কোথায় গেল ? তারা সেখানে বন্য জীবজন্তু ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না। এতে বুঝা যায় যে, এটা কিয়ামত পূর্বকালীন সময়ের ঘটনা হবে।

'হাররা'র মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে অনেক সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত আছে- মদীনার ওপর এমন এক সময় উপস্থিত হবে যে, মদীনার বাসিদেরকে এ খান থেকে বের করে দেয়া হবে। সাহাবাগণ আরজ করলেন : 'কে তাদেরকে বের করে দেবে?' এরশাদ করলেন : 'আমীরগণ'। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সা.) এরশাদ করেছেন : 'কুরাইশ গোত্রীয় লোকের হাতে আমার উম্মত ধ্বংস হবে।' সাহাবাগণ আরজ করলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.) ! তখন আমাদের জন্য কী নির্দেশ?' এরশাদ করলেন : 'তখন তোমাদের একাকীভাবে জীবন যাপন করা উচিত।' অপর এক হাদিসেও হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত (সা.) এরশাদ করেছেন : 'যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন, তার শপথ করে বলছি, মদীনায় এমন এক যুদ্ধ সংঘটিত হবে, যার ফলে "দ্বীন" এখান থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন মাথা মুণ্ডনের ফলে চুল মাথা থেকে খসে পড়ে যায়। সেদিন তোমরা মদীনার বাইরে চলে যেও, এক মনজিলের ব্যবধান হলেও।' হযরত আবু হুরাইরাহ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি এভাবে দোয়া করতেন : 'হে আল্লাহ ! আমাকে ষাট হিজরীর অঘটন এবং ছেলেদের রাজত্ব থেকে রক্ষা করুন। সে আসার পূর্বেই আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিন।' এতে ইয়াযীদের হুকুমতের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, সে ষাট হিজরীতে সিংহাসনে আরোহণ করেছে এবং 'হাররা'র ঘটনা তারই রাজত্বকালে সংঘটিত হয়েছে।

ওয়াকেদী 'হাররা' নামক কিতাবে আইয়ুব ইবনে বশর থেকে বর্ণনা করেছেন- রাসূল (সা.) একদা সফর করে 'হাররা নামক স্থানে পৌছেন, তখন দাড়িয়ে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন

পড়েন। এতে সাহাবাগণ মনে করলেন যে, হয়ত সফরের পরিণতি শুভ হবে না। তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলো। হযরত ওমর (রা.) আরজ করলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.) ! আপনি কী ভেবে ইন্নালিল্লাহ পড়লেন?' তিনি বললেন : 'হাররার' এ মরু প্রান্তরে আমার সাহাবাদের পরে আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে হত্যা করা হবে।' অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার হস্ত মুবারকের দ্বারা ইশারা করে বললেন : এ 'হাররার' মরু প্রান্তরে আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে হত্যা করা হবে।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত কা'বে আহবার থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত কাব বলতেন, 'তাওরাত' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, মদীনা মুনাওয়ারার পূর্বদিকের মরু প্রান্তরে উম্মতে মুহাম্মাদীয়া (সা.) - এর এমন কতক লোক শাহাদাত বরণ করবেন, যাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাদের আলো থেকে উজ্জ্বল। ইবনে যুবলা থেকে বর্ণিত আছে- একদা আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর (রা.) –এর খেলাফতের আমলে খুব বৃষ্টিপাত হয়। তখন তিনি তার বন্ধু বান্ধবসহ মদীনার বাইরে ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। যখন 'হাররা' নামক স্থানে পৌছেন এবং দেখতে পান যে, চতুর্দিকে পানির ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, তখন তার সাথী হযরত কাবে আহবার (রা.) শপথ গ্রহণ করে বললেন : 'এখানে যেভাবে পানির স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, ঠিক এমনিভাবেই এখানে রক্ত প্রবাহিত হবে।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কোন সময়ে হবে ?' তিনি উত্তর দিলেন : 'হে যুবাইরের পুত্র ! তুমি এর থেকে সতর্ক থেক যেন তোমার হস্ত- পদের দ্বারা এটা সংঘটিত না হয়।' সীরাত লেখক এবং ঐতিহাসিকরা সংক্ষেপ এবং বিস্তারিতভাবে এ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের উদ্ধৃতিসমূহ নিম্নে পেশ করা হলো যাতে আসল ঘটনা অস্পষ্ট না থাকে।

কুরতবী বলেন : 'মদীনাবাসীর মদীনা থেকে বাইরে চলে যাওয়ার কারণ এ 'হাররা'র মর্মান্তিক ঘটনা। যেমন কোনো কোনো হাদিসে বর্ণিত আছে- যে সময় মদীনা শরীফ অবশিষ্ট সাহাবা এবং তাবেয়ী দ্বারা পরিপূর্ণ এবং লোক বসতিতে ভরপুর এবং তার চিত্তাকর্ষক সাদৃশ্য বিদ্যমান তখন মদীনাবাসীর ওপর একের পর এক বিপর্যয় এবং অঘটন নেমে আসে ফলে তারা মদীনা ছেড়ে বাইরে চলে যান। পাপিষ্ঠ ইয়াযীদ মুসলিম ইবনে উকবার নেতৃত্বে শাম দেশীয় এক বিশাল সৈন্য

বাহিনী যুদ্ধ করার জন্য মদীনায় প্রেরণ করে। সৈন্য বাহিনীর বদবখত লোকেরা তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীর সম্মান হানিকর কাজে লিপ্ত থাকে। এ কারনেই একে 'হাররা'র ঘটনা বলা হয়। এটা শহর থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত।

এ মর্মান্তিক ঘটনার প্রাক্কালে ইয়াযীদের কুচক্রী দল শিশু এবং নারী ব্যতীত মদীনার বিশিষ্ট ও সম্মানিত বার হাজার চারশ' সাতানব্বই জন লোককে হত্যা করে।

মদীনায় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডে শহীদানের তালিকা

১. মুহাজির, আনসার, তাবেয়ীন, উলামা-	১৭০০ জন
২. সাধারণ লোক	১০, ০০০ জন
৩. কুরআনের হাফিজ	৭০০ জন
৪. কুরাইশ	৯৭ জন
	সর্বমোট = ১২, ৪৯৭ জন

'হাররাহ' এ লোমহর্ষক ঘটনা ছাড়া ও ইয়াযীদের সৈন্যরা নানা প্রকার অত্যাচার, অনাচার ও ধৃষ্টতাপূর্ণ অপকর্মে লিপ্ত হয় এবং জেনার মতো ঘৃণ্য অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। বর্ণিত আছে যে, এ ঘটনার পর এক হাজার অবৈধ সন্তান প্রসব করে। এ সব পাপিষ্ঠ লোক মসজিদে নববীর অমার্জনীয় অবমাননা করে। এ পবিত্র স্থানকে তারা ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করে। হুযুর আকরাম (সা.) - এর রওজায়ে পাক এবং মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান (যার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এখানে বেহেশতের বাগান সমূহের একটি বাগান আছে) ঘোড়ার মলমূত্র দ্বারা কলুষিত করে। আর লোকদের থেকে ইয়াযীদের জন্য এভাবে বাইআত নেয়া হয় যে, ইয়াযীদ যদি ইচ্ছা করে, তাদেরকে বিক্রয় করতে পারবে অথবা স্বাধীনভাবেও রাখতে পারবে। সে যদি ইচ্ছে করে আল্লাহর বন্দেগীতেও রাখতে পারবে অথবা তার নাফরমানি করারও নির্দেশ দিতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যমা (রা.) যখন ইয়াযীদকে বললেন যে, বাইআততো অন্ততঃপক্ষে কুরআন ও সুন্নাতের ওপর গ্রহণ করা চাই। তখনই ইয়াযীদ তাকে হত্যা করে ফেলে।

ইমাম কুরতবী বলেন- ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে, মদীনা মুনাওয়ারা তখন জন শূন্য হয়ে যায়। তখন মরুর পশুপাখিরা তথায় মলমুত্র ত্যাগ করত। মসজিদে নববী কুকুরের বাসস্থানে পরিণত হয়। এ সকল ঘটনা দ্বারা হুজুর (সা.) - এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়।

তাবরানী হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত মু'আবিয়া (রা.) - এর ইন্তিকালের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) ইয়াযীদের বাইআত এবং আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং তার নিন্দাবাদ করতে থাকেন। ইয়াযীদ এ কথা শ্রবণে শপথ নিয়ে বলল : 'খোদার কসম, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর- এর গলায় বেড়ী পরাব।' অতঃপর সে একজন দূত মারফত তাকে ডেকে পাঠায়। দূত এসে তাকে বলল : 'আপনি রৌপ্যের একটি ফাদ তৈরী করুন এবং ইয়াযীদের শপথ পূরণকল্পে গলার মধ্যে তা ঝুলিয়ে দিন, আর এই ওপর স্বীয় কাপড় পরিধান করুন, তবে আশা করি আপনি রক্ষা পাবেন। 'আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) বললেন : 'আল্লাহ তাআল কখনও তার শপথকে বাস্তবায়িত করবেন না। আমি অন্যায়ের কাছে কখনও আত্মসমর্পণ করবো না। যতক্ষণ শক্ত পাথর দাতের নিচে নরম হবে না।' অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) জনগণকে তার বাইআত গ্রহণ ও আনুগত্য স্বীকারের দাওয়াত দিতে লাগলেন।

এ দিকে পাপিষ্ঠ ইয়াযীদ মুসলিম ইবনে উকবার নেতৃত্বে এক বিশাল সেনাবাহিনী শাম (সিরিয়া) থেকে মদীনা অভিমুখে প্রেরণ করে। তাদেরকে সে এ নির্দেশ দিয়েছিল যে, মদীনাকে ধ্বংস করে দেয়ার পর মক্কায় চলে যাবে এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে হত্যা করবে। মুসলিম ইবনে উকবা যখন মদীনায় পৌছে তখন সকল সাহাবায়ে কেরাম মদীনা শরীফের বাইরে চলে গেলেন। মুসলিম ইবনে উকবা অবশিষ্ট লোকদের হত্যা করার পর মক্কা শরীফ অভিমুখে যাত্রা করল। পথিমধ্যে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ সময় সে হোসাইন ইবনে নুমাইর কিন্দিকে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করে এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) - কে অবরোধ করার জন্য পবিত্র মক্কায় কামানের গোলা নিক্ষেপ এবং অগ্নিসংযোগের নির্দেশ দেয়। হোসাইন পথিমধ্যে থাকাকালেই ইয়াযীদের মৃত্যু সংবাদ পৌছে। হোসাইন পালিয়ে গেল এবং সে তার প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে পারল না।

ইবনে জওযী বলেন, বাষট্টি হজরীতে ইয়াযীদ তার চাচাত ভাই উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু সুফিয়ান তার বাইআত গ্রহণের জন্য মদীনায় প্রেরণ করে। উসমান মদীনাবাসীর একটি দলকে ইয়াযীদের নিকটে পাঠিয়ে দেন। যখন তারা ইয়াযীদের কাছ থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তারা ইয়াযীদকে গালিগালাজ করতে লাগলেন ও বললেন যে, সে ধর্মদ্রোহী, মদখোর, ফাসিক। সে কুকুর পালন করে। এ কথা বলে তারা তার বাইআত বর্জন করলেন। ইয়াযীদের নিকট গমনকারী লোকদের মধ্যে হযরত মুনযের (রা.)ও ছিলেন। তিনি বললেন : 'ইয়াযীদ আমার বড় উপকার করেছে। সে আমাকে একলক্ষ দিরহাম অনুদান দিয়েছে। কিন্তু এজন্য আমি সত্যকে পরিত্যাগ করতে পারিনি। সে মদ্যপায়ী ও বেনামাযী।' তার মুখ থেকে এ কথা শোনার সাথে সাথেই লোকজন তার বাইআত প্রত্যাখ্যান করে আবদুল্লাহ ইবনে হানযালার হাতে বাইআত গ্রহণ করল আর উসমানকে মদীনা থেকে বের করে দিল। আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রা.) বলতেন : 'যদি আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণের আশংকা না করতাম, তবে ইয়াযীদের বাইআত প্রত্যাখ্যান করতাম না এবং তার মোকাবিলা করার ঝুঁকি গ্রহণ করতাম না। ইবনে জওযী আবদুল হাসান মাদাহেনী থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়াযীদের পাপাচার এবং কর্মসমূহ প্রকাশিত হওয়ার পর মদীনাবাসী মিম্বরের ওপর আরোহণ করে তার বাইআত প্রত্যাখ্যান করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হাফস মাখযুমী মাথা থেকে পাগড়ি নিক্ষেপ করে বললেন : 'ইয়াযীদ আমার বড় উপকার করেছে এবং আমাকে বিশেষ অনুদানে সম্মানিত করেছে কিন্তু সে আল্লাহর শত্রু এবং মদপানে আসক্ত ব্যক্তি; আমি তার বাইআত এভাবে প্রত্যাখ্যান করলাম যেভাবে এ পাগড়িকে নিক্ষেপ করেছি।' এক ব্যক্তি দাড়িয়ে জুতা নিক্ষেপ করে তার বাইআত প্রত্যাখ্যান করল। এভাবে পাগড়ি এবং জুতাতে মজলিস ভরে গেল। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মুতী (রা.) –কে কুরাইশের এবং আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রা.) –কে আনসারের প্রশাসক নিযুক্ত করা হলো।

উমাইয়্যা বংশীয় লোকদেরকে মারওয়ানের গৃহে অবরুদ্ধ করা হলো। উমাইয়্যাগণ তাদের এ দুরবস্থার সংবাদ ইয়াযীদের কাছে পাঠিয়ে সৈন্য দিয়ে সাহায্যের আবেদন জানায়। ইয়াযীদ

তাদের সাহায্যার্থে মুসলিম ইবনে উকবাকে মদীনায় প্রেরণ করে। এ হতভাগা যদিও বৃদ্ধ, কিন্তু মদীনাবাসীকে রক্ত স্রোত প্রবাহিত করার ঝুঁকি গ্রহণ করে। অতঃপর ইয়াযীদ এ কথাও ঘোষণা করে যে, যে ব্যক্তি হেজাযে গমন করবে তাকে যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র এবং সফরের যাবতীয় আসবাবপত্র ছাড়াও একশ দিনার করে বখশিস দেয়া হবে। এ ঘোষণা শুনে বার হাজার লোক হেজায গমনে রাজি হয়ে গল। এ সব লোককে সেখানে প্রেরণ করে ইবনে ফারজানাকে নির্দেশ দিল যে, তুমি তথায় গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর-এর সাথে যুদ্ধ কর। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন এবং বললেন, 'আল্লাহর শপথ, একজন ফাসেকের সন্তুষ্টির নিমিত্তে আমি পয়গম্বর আলাইহিস সালামের একজন আওলাদের হত্যা এবং হেরেম শরীফে আল্লাহর ঘরের মধ্যে লড়াইয়ের ঝুঁকি নিতে পারি না।' এরপর সে মুসলিম ইবনে উকবাকে সেখানে পাঠিয়ে দেয়। সে তাকে নির্দেশ দেয় যে, যদি কোনো অঘটন ঘটে তবে হোসাইন ইবনে নুমাইরকে তোমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করবে। সে আরও নির্দেশ দিল যে, যার বিরুদ্ধে তোমাকে পাঠানো হচ্ছে তাকে তিনবার দাওয়াত দেবে, যদি দাওয়াত গ্রহণ করে তবে তাকে ছেড়ে দেবে। আর যদি দাওয়াত কবুল না করে, তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। বিজয় লাভ করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

সেখানে সম্পদ, অস্ত্র এবং খাদ্য ইত্যাদি যা কিছু পাও তা সৈন্যদের জন্য হালাল করে দাও। তিনদিন পর যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। হযরত হোসাইনের পুত্র হযরত আলী ওরফে যায়নুল আবেদীনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ো না। কেননা, তিনি ঐ দলকে সমর্থন করেন না। যখন মদীনাবাসীর নিকট এ খবর পৌছে তখন মদীনাবাসী সমবেতভাবে ইয়াযীদের সৈন্যদের মোকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। বনী উমাইয়্যার যে দলটি মারওয়ানের গৃহে অবরুদ্ধ ছিল, তারা তাদের নিকট গিয়ে বললেন : 'তোমরা এ কথার প্রতিশ্রুতি দাও যে, তোমরা ধোকাবাজি, প্রতারণা এবং গোয়োন্দাগিরি করবে না এবং আমাদের শত্রুদের কোনো প্রকার সাহায্য -সহযোগিতা করবে না। তাহলেই আমরা তোমাদেরকে ছেড়ে দিতে পারি; অন্যথায় আমরা তোমাদেরকে হত্যা করব।' বনী উমাইয়্যার ঐসব লোক মুনাফিকী করে মদীনাবাসীর সাথে শামিল হয়ে মুসলিম ইবনে উকবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে আসে। মারওয়ান

ইবনে হাকাম গোপনে স্বীয় পুত্রকে মুসলিম ইবনে উকবার নিকট প্রেরণ করে এ কথা বলে যে, মদীনায় পৌছে তিনদিন যেন যুদ্ধ স্থগিত রাখে। তিনদিন পর মারওয়ান মদীনাবাসীর সাথে পরামর্শ করে তাদেরকে বলল : 'তোমরা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছ?' তারা বললেন : 'যুদ্ধ ব্যতীত গতি নেই।'

মারওয়ান বলল : 'যুদ্ধ করা উচিত হবে না। এতে ফাসাদ বড়ে যাবে। ইয়াযীদের হাতে বাইআত করাই আমি সমীচীন বলে মনে করি। কিন্তু মদীনাবাসী তা পছন্দ করলো না এবং ইয়াযীদের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার জন্য মদীনার বাইরে চলে গেলেন।

এক দিকে আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রা.) যুদ্ধের ময়দানে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, অপর দিকে মুসলিম ইবনে উকবা বার্ধক্য জনিত কারণে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে স্বীয় সেনাবাহিনীকে উৎসাহিত করছিলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুতী (রা.) তার সাত পুত্র সহকারে শত্রুর মোকাবিলা করে শাহাদাত বরণ করেন। মুসলিম ইবনে উকবা তার মস্তক মুবারক দ্বিখণ্ডিত করে ইয়াযীদের নিকট পাঠিয়ে দেয়। অবশেষে ইয়াযীদ বাহিনী বিজয় লাভ করে। ইয়াযীদের সৈন্য বাহিনী তার নির্দেশ মোতাবেক মদীনা মুনাওয়ারায় তিনদিন পর্যন্ত অত্যাচার, অবিচার ও ব্যভিচার চালায়, সম্পদ লুটপাট করে এবং জেনার মতো জঘন্য কার্যে লিপ্ত হয়।

ওয়াকেদী বলেন : 'যখন ইয়াযীদের সেনাবাহিনী মদীনার নিকট পৌছে তখন মদীনাবাসী পরস্পরের পরামর্শক্রমে রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর মতো মদীনার চতুর্দিকে দীর্ঘ পনের দিন অত্যন্ত দুঃখ কষ্ট সহকরে পরিখা খনন করেন। মদীনার চতুর্দিকে তারকটার বেড়া লাগিয়ে দেন এবং দুশমনের পথ অবরোধ করে চতুর্দিক থেকে তাদের ওপর তীর ও পাথর নিক্ষেপ করতে থাকেন। এতে শাম বাহিনী মদীনায় প্রবেশ করতে বাধার সম্মুখীন হয়। অবস্থা বেগতিক দখে মুসলিম ইবনে উকবা ভীত হয়ে 'হাররা'র এক কোণায় অবস্থান করে এবং মারওয়ানের নিকট এ মর্মে লোক প্রেরণ করে যে, যুদ্ধে জয়লাভ করার কোনো একটা পথ বের করতে, যাতে সফলকাম হওয়া যায়। মারওয়ান বনী হারেসার নিকট গমন করে তাদেরকে লোভ- লালসায় আকৃষ্ট করে

মদীনার একদিকের রাস্তা খুলে দিল। ইয়াযীদের সেনাবাহিনী সে পথ দিয়ে মদীনায় প্রবেশ করে এবং মদিনাবাসী অপর দিক থেকে গুটিয়ে এসে শুধু সে দিকে এসেই যুদ্ধে লিপ্ত হন।

ইবনে আবি খাইসামা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মদীনার লোকজন বর্ণনা করেন যে, হযরত মু'আবিয়া তার মৃত্যুকালে ইয়াযীদকে ডেকে বলে ছিলেন : 'আমার মনে হয় মদীনাবাসীর সাথে একদিন তোমাকে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে। সে সময় তুমি মুসলিম ইবনে উকবার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করে নিও ! কেননা, এ ব্যাপারে তার চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত আর কেউ নেই।' পিতার মৃত্যুর পর যখন ইয়াযীদ সিংহাসনে আরোহণ করে তখন মদিনাবাসীর সাথে তার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। সে পিতার নির্দেশ মতো এ সমস্যার সমাধান করে।

কথিত আছে যে, এক বৃদ্ধা মুসলিম ইবনে উকবার নিকট এসে কেদে কেদে ফরিয়াদ করলেন : 'আমার পুত্র বন্দি হয়েছে, আপনি তাকে মুক্তি দিন।' সে তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দিল যে, তার ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে তার গর্দান দু'টুকরা করে যেন মায়ের হাতে তুলে দেয়া হয়। নির্দেশমত কাজ করা হলো এবং বৃদ্ধার হাতে তার পুত্রের মস্তক সোপর্দকরে তাকে বলে দেয়া হলো, 'তুমি নিজের জীবনের মঙ্গল না চেয়ে পুত্রকে রেহাই দানের সুপারিশ করাতেই এ পরিণতি হয়েছে।'

হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যেব যিনি একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী ছিলেন তাকে মুসলিম ইবনে উকবার নিকট হাজির করা হয়। সে তাকে বলল : 'ইয়াযীদের বাইআত গ্রহণ কর।' তিনি বললেন : 'আমি আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.) –এর নীতি মোতাবেক বাইআত করেছি।' এ সময় একজন লোক দাড়িয়ে বলল : 'এ একজন পাগল।' এ কথা বলার পর তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। মুসলিম ইবনে উকবা হত্যাকাণ্ডে এবং ফিতনা- ফাসাদে অতিশয় সীমালঙ্ঘনকারী ছিল বিধায় স 'মাসরিফ' (সীমালঙ্ঘনকারী) নামে অভিহিত ছিল।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক 'ওয়াকেদী' তার 'কিতাবুল হাররা' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, একদা ইয়াযীদ মুসলিমের নিকট এসে দেখতে পায় যে, সে অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত। ইয়াযীদ তাকে লক্ষ করে বলল : 'যদি তুমি দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত না হতে তবে আমি তোমাকে মদীনা অভিযানে প্রেরণ করতাম। কেননা, আমি তোমার চেয়ে আর কাউকে আমার একনিষ্ঠ ভক্ত বলে মনে

করিনা। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান আমাকে তার মুমূর্ষ অবস্থায় অসিয়ত করেছেন : 'যদি হেজাযবাসীর সাথে তোমার কোনো অঘটন ঘটে তবে তুমি মুসলিম ইবনে উকবার নিকট তোমার সমস্যার সমাধান চেয়ে নেবে"।' এ কথা শোনামাত্র মুসলিম ইবনে উকবা উঠে দাড়ায় এবং বলে : 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাকে শপথ দিয়ে বলছি- একাজ আমি ব্যতীত আর কারও ওপর ন্যস্ত করবেন না। কেননা, আমার থেকে মদীনাবাসীর আর কোনো বড় শত্রু নেই। এ সম্পর্কে আমি একটি স্বপ্নও দখেছি যে, জান্নাতুল বাকীর একটি বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাসহ হযরত উসমান (রা.) এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার ফরিয়াদ করছেন। আমি যখন বৃক্ষটির নিকটে যাই তখন বলতে শুনলাম, এ কাজ মুসলিম ইবনে উকবার দ্বারাই সম্পন্ন হবে। সে দিন থেকে আমার অন্তরে এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমিই মদিনাবাসীকে হত্যা করব এবং এ আশায় মনকে সান্তনা দিয়েছি এই বলে- আমিই হযরত উসমান (রা.) -এর হত্যাকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণ করব।' যখন ইয়াযীদ মুসলিম ইবনে উকবার মধ্যে এরূপ প্রেরণা ও আগ্রহ দেখতে পেল- তখন তাকে নির্দেশ দিল : 'সত্বর প্রতিশোধ গ্রহণ কর এবং আল্লাহর নাম নিয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা কর। যদি মদীনায় প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হও এবং বাইআত গ্রহণে মদিনাবাসী রাজি না হয়, তবে তুমি ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করবে। তিনদিন পর্যন্ত একাজ চালিয়ে যাবে। কাউকে বাদ দেবে না। আর তাদের ধন-সম্পদ লুটপাট করে নেবে। অবশ্য যদি তারা বাইআত স্বীকার করে তবে তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ো না। সেখান থেকে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর-এর কাছে চলে যাবে এবং তার কাজ সম্পন্ন করবে।'

বর্ণিত আছে যে, মদীনার হেরেমের শহীদগণকে দর্শন করে সে বলত : 'আমি এ সব লোককে হত্যা করার পরও যদি দোযখে যাই তবে আমার থেকে হতভাগা আর কেউ নেই।'

মারওয়ানের গোলাম যাকওয়ান বলে : 'একদা মুসলিম ইবনে উকবা রোগের ঔষধ সেবন করার পর খাবার তলব করল। অথচ ডাক্তার তাকে নিষেধ করে ছিল যে, ঔষধ সেবনের পর খাদ্য গ্রহণ করলে ঔষধ ক্রিয়াশীল হবে না। সে বলল : 'এখন আমি জীবিত থাকার আর কোনো আশা করবনা। কারণ, আমি তো হযরত উসমান (রা.) –এর হত্যাকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণ করে এখন

স্বস্তিবোধ করছি। আমার অন্তরের বাসনা পূর্ণ হয়েছে। মৃত্যু ব্যতীত এখন আমার কাছে আর কোনো কিছু প্রিয় নেই। এখন মৃত্যুই আমার কাছে সবেচেয়ে প্রিয়। আমার বিশ্বাস এ সব নাপাককে হত্যা করার ফলে আল্লাহ তা'আলা আমার সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন'।" সৈয়দ আলাহির রহমত বলেন : 'তার গুনাহ মার্জনার ধারণা নিতান্ত মুর্খতা, অজ্ঞতা ও দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক; কেননা, আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত এমন একদল বিশিষ্ট সাহাবায়ে করামকে হত্যা করা এমন এক অপরাধ ও পাপের কাজ, যা ক্ষমা করা দূরের কথা এই অশুভ পরিণতি থেকে তার রেহাই পাওয়াও অসম্ভব; এ তার দুঃস্বপ্ন মাত্র।'

যে সব সাহাবায়ে কেরামকে মদীনায় জোরপূর্বক অমানুষিকভাবে হত্যা করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন ফেরেশতা কর্তৃক গোসলপ্রাপ্ত হযরত হানযালা (রা.) - এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা.)। তিনি তার সাত পুত্রসহ শহীদ হন। আর রয়েছেন রাসূল (সা.) - এর অজুর বর্ণনা প্রদানকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যাইদ (রা.) ও হযরত মাকল ইবনে সিনান (রা.), যিনি মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বীয় গোত্রের পতাকা বহন করেন।

ইবনে জওযী সনদের সূত্র ধরে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : 'হাররার' অঘটনের সময়ে রাত্রিতে আমি ব্যতীত আর কেউ মসজিদে নববীতে উপস্থিত হতো না। শাম দেশীয় লোকজন আমাকে মসজিদে দেখে বলত, এ পাগল বুড়ো! এখানে কী করছো? প্রত্যেক নামাযের সময় রাসূলে পাক (সা.) - এর হুজরা শরীফ থেকে আযান, ইকামাতের আওয়াজ শুনে আমি নামায পড়তাম।'

'হাররা'র এ হৃদয় বিদারক ঘটনার প্রাক্কালে ইয়াযীদ বাহিনীর হাতে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা.) সর্বশেষ লাঞ্ছিত হন। বর্ণিত আছে যে, এ গুণ্ডাবাহিনী তার দাড়ি মোবারক গোড়া থেকে উপড়ে ফেলে। লোকেরা তার দাড়ির এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করতো : 'আপনি কি দাড়ি নিয়ে খেলেছেন এবং দাড়ি উচ্ছেদ করে ফলেছেন?' তিনি উত্তর দিতেন : 'না। বরং শাম দেশের লোকজন আমার ওপর এ অত্যাচার করেছে। শাম দেশীয় একদল লোক আমার ঘরে প্রবেশ করে ঘরের সমস্ত আসবাব পত্র নিয়ে যায়। তারপর আরেক দল প্রবেশ করে ঘরের মধ্যে

কোনো আসবাবপত্র না পেয়ে আমার দাড়ি নির্মম ভাবে উপড়ে ফেলে, যা তোমরা প্রত্যক্ষ করছো। এ সব দুষ্ট লোক এভাবে আরো কত যে অবর্ণনীয় নিপীড়ন ও নির্যাতন চালিয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না।'

এ সব জালিম অশুভ ও ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে মুক্তি পায়নি। বর্ণিত আছে যে, যখন পাপিষ্ঠ মুসলিম ইবনে উকবা মদীনাবাসী থেকে জোরপূর্বক ইয়াযীদের জন্য বাইআত নিচ্ছিল, তখন অধিকাংশ লোক ভয়ে বাইআত গ্রহণ করে আনুগত্যের স্বীকৃতি দেয়। এ সময় কুরাইশ বংশীয় একজন লোক বলে : 'আমি আল্লাহর আনুগত্যের ওপর বাইআত করেছি গুনাহের ওপর নয়।' এ কথা বলায় মুসলিম তার বাইআত কবুল না করে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। তিনি যখন শহীদ হয়ে যান তখন তার মাতা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করেন, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে শক্তি দান করেন, তবে আমি এ পাপিষ্ঠ মুসলিমকে মৃত অথবা জীবিত অবস্থায় জ্বালিয়ে ফেলব।

উল্লেখ্য যে, হতভাগা মুসলিম মদীনা মুনাওয়ারায় লুটপাট এবং হত্যাযজ্ঞ সমাপ্ত করার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) –এর বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। তখন পূর্ব থেকে সে যে রোগে আক্রান্ত ছিলো তিনদিন পর সে রোগেই মৃত্যু বরণ করে জাহান্নামে পৌছে যায়। এ সময় ঐ স্ত্রীলোক তার শপথ মোতাবেক তিনজন গোলামকে সাথে নিয়ে মুসলিমের কবরে উপস্থিত হয়। যখন কবর খনন করা হয় তখন দেখা গেল যে, একটি বিরাট সাপ তার গর্দান বেষ্টন করে নাকের হাড় চুষে খাচ্ছে। লোকেরা এ অবস্থা দর্শনে ভীত হয়ে পড়ে। তারা সকলে ঐ স্ত্রীলোককে বলল : 'আল্লাহ তা'আলা তার অপকর্মের শাস্তি প্রদান করেছেন এবং তোমার তরফ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। তাই এ শাস্তিই যথেষ্ট।' ঐ স্ত্রীলোক বলল : 'না, এটা হবে না। খোদার শপথ গ্রহণ করে আমি যে পণ করেছি তা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি পূর্ণ করব না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে ক্ষমা করব না।' অতঃপর স্ত্রীলোকটি বলল : 'তাকে তার পায়ের দিক থেকে বের কর।' কিন্তু দেখা গেল- তার পায়েও অপর একটি সাপ বেষ্টন করে আছে। এরপর স্ত্রীলোকটি অজু করে দু'রাকাআত নামায পড়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করল : খোদাওন্দ করীম! আপনি জানেন, মুসলিম ইবনে উকবার ওপর আমার রাগ একমাত্র আপনারই

সন্তুষ্টির জন্য। সুতরাং আপনি আমাকে সুযোগ দিন যাতে আমি তাকে কবর থেকে বের করো জ্বালিয়ে দিতে পারি।' এরপর একখণ্ড গাছের টুকরা নিয়ে সাপের লেজে আঘাত করায় সাপ চলে যায়। অতঃপর সে লাশটি কবর থেকে বের করে জ্বালিয়ে দেয়।

ওয়াকেদী বলেন : 'আমর যাচাই মতে উক্ত স্ত্রীলোক ছিল ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যমআ'র মাতা। যখন মুসলিম ইবনে উকবা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) - এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মক্কায় যাচ্ছিল তখন এ স্ত্রীলোকও তার পিছনে ধাওয়া করে। যখন মুসলিমের সংবাদ তার কাছে পৌছে তখন সত্বর সে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং মুসলিম ইবনে উকবাকে কবর থেকে বের করে শূল বিদ্ধ করে।'

জাহহাক বলেন : 'যে সব লোক মুসলিম ইবনে উকবাকে শূল বিদ্ধ অবস্থায় দেখেছে তারাই আমার কাছে এসে বর্ণনা করেছে যে, লোকেরা তার ওপর পাথরও নিক্ষেপ করেছে।' এ রেওয়ায়েতের মধ্যে জ্বালিয়ে দেয়ার কথা নেই, হতে পারে শূল বিদ্ধ করার দু'তিন দিন পরে জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে এবং যে ব্যক্তি এ ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন সম্ভবত তিনি জ্বালিয়ে দেয়ার আগে তাকে শূলিতে দেখেছেন।

আল্লামা কুরতবী বলেন : 'মুসলিম ইবনে উকবা হাররার তিন দিন পর মারা যায়। মদীনা মুনাওয়ারার পথে রক্ত এবং পুজে তার পেট পরিপূর্ণ হয়ে যায়। নিতান্ত খারাপ অবস্থায় সে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। মৃত্যুকালে সে অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার সাথে বলে : 'হে আল্লাহ ! কালেমায়ে শাহাদাতের পরে আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় নেক আমল, যা আপনার দরবারে গ্রহণযোগ্য বলে আমার ধারণা, তা মদীনাবাসীকে হত্যা ছাড়া আর কিছুই নেই। এখন যদি আমার এমন নেক আমল সত্ত্বেও আপনি আমাকে দোযখে নিয়ে যান তবে আমার মতো হতভাগা আর কেউ হতে পারেনা'।

এর পর মুসলিম ইবনে উকবা হোসাইন ইবনে নুমাইরকে ডেকে এনে বলল : আমীরুল মু'মিনীন (ইয়াযীদ) আমার পরে তোমাকেই প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করেছে। তুমি অতি সত্বর মক্কায় পৌছে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর- এর কাজ সম্পন্ন কর। তার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে কোনোরূপ

দ্বিধা করবে না। কামানের সাহায্যে পাথর নিক্ষেপ করবে। যদি সে কাবা গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে তবে এতেও কোনো পরোয়া করো না, কামান দাগিয়ে যাও।' এ বদবখতের নির্দেশমতো হোসাইন ইবনে নুমাইর চল্লিশ দিন (অপর এক রেওয়ায়েত মতে চৌষট্টি দিন) যাবৎ মক্কা শরীফকে ঘেরাও করে রাখে এবং ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়, আর কা'বা শরীফের দিকে কামানের গোলা ছোড়ে।

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি বর্শার মাথায় আগুন লাগিয়ে সজোরে নিক্ষেপ করে এবং হঠাৎ দম্কাকা হাওয়া প্রবাহিত হওয়ায় কা'বাগৃহে আগুন ধরে যায়। ইতোমধ্যে ইয়াযীদের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, সে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এ সংবাদ শ্রবণের পর শামদেশীয় এবং বনী উমাইয়্যার লোকজন চিন্তিত হয়ে পড়ে। অতঃপর সবাই অপমানের বোঝা নিয়ে পরাজয় বরণ করে পলায়ন করে।

উল্লেখ্য যে, 'হাররা'র ঘটনা তেষট্টি হিজরীর জিলহজ্ব মাসের সাতাশ অথবা আটাশ তারিখ বুধবারে সংঘটিত হয়। মুসলিম ইবনে উকবা চৌষট্টি হিজরীর মুহররম মাসের প্রথম তারিখে মারা যায়। মক্কার সংঘর্ষও কামানের দ্বারা বাইতুল্লাহ শরীফে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে চৌষট্টি হিজরীর তেসরা রবিউসসানী শনিবারে। 'হাররা'র ঘটনার পর রবিউসসানীর প্রথম তারিখে ইয়াযীদের মৃত্যু হয়। সাদী 'কিতাবুল ওয়াফা' নামক গ্রন্থে এভাবেই উল্লেখ করেছেন।

অনুবাদ :মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জববার

পীরসাহেব বায়তুশ শরফ

সৌজন্যে : জয়ুল কুলুব ইলা দিয়ারিল

মাহবুব- হযরত মাওলানা শাহ আবদুল হক দেহলভী (রহ.)

আশুরা আন্দোলনে নারী

কারবালার বীর নারী হযরত যায়নাব (আ.)

নূর হোসেন মজিদী

ইসলামের ইতিহাসে যেসব মহীয়সী নারী জ্ঞান, মনীষা, প্রজ্ঞা ও সাহসী ভূমিকার জন্য চিরভাস্বর হয়ে রয়েছেন তাদের মধ্যে হযরত যায়নাব (আ.) অন্যতম। কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী হযরত যায়নাব শুধু যে হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) - এর শাহাদাতের পরে তার পরিবারের নারী ও শিশুদের এবং অসুস্থ ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) - এর অভিভাবিকার দায়িত্ব পালন করেন তা নয়, বরং কুফা ও দামেস্কে অসাধারণ সাহসিকতার সাথে ইমাম হোসাইন ও তার পরিবার- পরিজনের প্রতি ইয়াযীদের জুলুম- অত্যাচারের কথা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন। এর ফলে ইয়াযীদ ও তার তবেদারদের বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারের জাল ছিন্ন হয়ে যায় এবং সাধারণ মানুষের কাছে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ইয়াযীদ ও তার সুবিধাভোগীরা এ মর্মে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছিল যে, ইয়াযীদ মুসলিম উম্মাহর বৈধ খলিফা এবং ইমাম হোসাইন ছিলেন একজন ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তি যিনি ক্ষমতার লোভে 'খলিফাতুল মুসলিমীন' ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। কিন্তু হযরত যায়নাব এ মিথ্যাচারের স্বরূপ প্রকাশ করে দেন এবং ইমাম হোসাইন (আ.) - এর মিশন ও তাকে যে অন্যায়ভাবে শহীদ করা হয় তা তুলে ধরেন। ফলে কারবালার ঘটনার স্বরূপ মিথ্যাচারের জঞ্জালের নিচে চাপা পড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। হযরত যায়নাব (আ.) - এর ভূমিকার ফলে মুসলিম উম্মাহ অচেতনতার নিদ্রা থেকে জগে ওঠে। এর ফলে অচিরেই বিভিন্ন স্থানে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, উমাইয়্যা নর ঘাতকদের বিরুদ্ধে ইমাম হোসাইনকে হত্যার প্রতিশোধ নেয়া হয় এবং উমাইয়্যা শাসনের ধ্বংসের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

হযরত যায়নাব (আ.) নারীকুল শিরোমণি হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (আ.) ও জ্ঞান নগরীর দরজা হযরত আলী (আ.) - এর সন্তান। তার জন্মের তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তবে অধিকতর সঠিক বলে পরিগণিত মত অনুযায়ী তার জন্ম হিজরী পঞ্চম সালের পাঁচ জমাদিউল উলা। তিনি ৬২ হিজরীর ১৫ রজব ৫৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার মাযার দামেস্কে অবস্থিত; তার নামানুসারে ঐ জায়গা 'যায়নাবিয়া' নামে সুপরিচিত।

স্বয়ং হযরত রাসুলে আকরাম (আ.) তার নাম রাখেন যায়নাব। তার ডাকনাম ছিল উম্মে কুলসুম। উল্লেখ্য যে, তার কনিষ্ঠতম বোনের নামও যায়নাব ও ডাকনাম উম্মে কুলসুম ছিল। হযরত যায়নাব (আ.) 'যায়নাবে কুবরা' (বড় যায়নাব) ও তার ছোট বান 'যায়নাবে ছোগরা' (ছোট যায়নাব) নামে পরিচিত ছিলেন। যায়নাবে ছোগরা হযরত ফাতেমা (আ.) - এর সন্তান ছিলেন না; হযরত ফাতেমার ইন্তেকালের পর হযরত আলী 'ছাহ্বায়ে ছা'লাবিয়া' নামে একজন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন; তারই সন্তান যায়নাবে ছোগরা। অনেকে এই দুই যায়নাবকে এক করে ফেলেন।

হযরত যায়নাবে কুবরা ছিলেন মানব জাতির ইতিহাসে সর্বাধিক মহিমান্বিত পরিবারের সন্তান। বেহেশতে নারীদের নেত্রী হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা ছিলেন তার মাতা, শেরে খোদা হযরত আলী ছিলেন তার পিতা, বেহেশতে যুবকদের নেতা হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন ছিলেন তার ভ্রাতা এবং সর্বোপরি সৃষ্টি লোকের সৃষ্টির কারণ রাহ্‌মাতুল্লিল 'আলামীন রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন তার নানা। এমন অনন্যসাধারণ প্রিয়জনদের নয়নমনি ছিলেন হযরত যায়নাবে কোবরা। তিনি এমন এক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন যেখানে হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতরণ করতেন। খোদায়ী ওহীর ধারক- বাহক ও ব্যাখ্যাকারকদের সহচর্যে তিনি বড় হন।

হযরত যায়নাব ছিলেন অনন্যসাধারণ মেধা ও স্মরণশক্তির অধিকারী। এই অন্যতম প্রমাণ এই যে, হযরত ফাতেমা হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) - এর ইন্তেকালের কিছুদিন পরে মসজিদে নববীতে যে ভাষণ দেন হযরত যায়নাব তা হুবহু মনে রাখেন ও পরবর্তীকালে বর্ণনা করেন, অথচ

ঐ সময় তার বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তার নিকট থেকে শুনে হযরত ফাতেমা (আ.) - এর ভাষণ বর্ণনা করেন।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ কৈশোরকাল থেকেই তিনি মনীষার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। এ কারণে তিনি বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হন। লোকমুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব উপাধি প্রচলিত হয়ে পড়ে। এসব উপাধির মধ্যে সর্বাধিক বিশিষ্ট উপাধি হচ্ছে 'আকীলাতু বানী হাশেম' (হাশেম বংশের বুদ্ধিমতী মহিলা)। তার অন্যান্য উপাধির মধ্যে রয়েছে : মুআচ্ছাকাহ (নির্ভরযোগ্য; নির্ভরযোগ্য হাদীস- বর্ণনাকারিণী), 'আলেমাতু গায়রা মু'তাআল্লামা' (কারো কাছে শিক্ষাগ্রহণ ব্যতিরেকেই যিনি 'আলেমাহ), 'আরেফাহ, ফাযেলাহ, কামেলাহ ও 'আবেদাতু আলে 'আলী (আলী- বংশের 'আবেদাহ)।

ইমাম হোসাইন (আ.) - এর প্রতি ভালোবাসা

হযরত যায়নাব মাত্র ছয় বছর বয়সে নানা ও মাকে হারান। এর পর তিনি পিতা ও ভ্রাতাদের সহচর্যে বড় হন। তবে হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) - এর প্রতি তার ভালোবাসা ছিল এতই বেশী যে, তিনি ইমাম হোসাইনকে না দেখে একদিনও থাকতে পারতেন না। তার এ ভালোবাসা আজীবন আটুট থাকে। কারবালায় হযরত ইমাম হোসাইন শহীদ হওয়া পর্যন্ত কখনোই হযরত যায়নাব তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হননি।

হযরত যায়নাব ১৬ হিজরীতে বয়ঃপ্রাপ্তা হলে হযরত আলী (আ.) তাকে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর তাইয়ারের সাথে বিবাহ দেন। ইমাম হোসাইন - এর প্রতি হযরত যায়নাব - এর অপরিসীম মুহাব্বাতের কারণে হযরত আলী ববিবাহের ক্ষেত্রে দু'টি বিশেষ শর্ত আরোপ করেন। প্রথম শর্ত এই যে, আবদুল্লাহর সাথে বিবাহের পর (যেহেতু তার বাড়িতে গিয়ে বসবাস করবেন) হযরত যাযনাব প্রতি দিনে- রাত অন্তত একবার তার ভাই হযরত ইমাম হোসাইনের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতে পারবেন। দ্বিতীয় শর্ত এই যে, যখনই ইমাম হোসাইন কোথাও সফরে যাবেন তখন হযরত যায়নাবকে সাথে নিয়ে যেতে পারবেন; আবদুল্লাহ এতে

কোনো রূপ আপত্তি করতে পারবেন না। আবদুল্লাহ এ উভয় শর্তই মেনে নিলে হযরত আলী উভয়ের মধ্যে বিবাহকার্য সম্পাদন করেন।

৩৫ হিজরীর ১৮ জিলহজ্ব হযরত আলী (আ.) খেলাফতের দায়িত্ব লাভ করেন। এর পরপরই তাকে বিদ্রোহ দমনে পদক্ষেপ নিতে হয়। ৩৬ হিজরীর জঙ্গে জামাল- এর পর তিনি সিরিয়ার বিদ্রোহ দমনের সুবিধার্থে ইসলামী খেলাফতের কেন্দ্র মদীনা মুনাওয়ারা থেকে কুফায় স্থানান্তরিত করেন। হযরত আলীর সাথে হযরত ইমাম হাসান, হযরত ইমাম হোসাইন এবং হযরত যায়নাবও কুফায় চলে যান।

মুসলিম উম্মাহর খলিফার কন্যা হিসাবে কুফায় হযরত যায়নাব অত্যন্ত মর্যাদার জীবনের অধিকারী ছিলেন। তা ছাড়া তারা জ্ঞান- গরিমার খবর আগেই কুফাবাসীর নিকট পৌছে ছিল। তাই হযরত যায়নাব কুফায় এসেছেন জানতে পেরে সেখানকার মহিলারা দীনী জ্ঞানার্জনের জন্য তার নিকট ভিড় জমাতে থাকেন। বিশেষ করে হযরত যায়নাব তাদের সামনে নিয়মিত কুরআন মজীদের তাফসীর করতেন এবং তারা তার নিকটে এসে খোদায়ী কালামের গভীর জ্ঞানের সাথে পরিচিত হতেন।

হযরত আলীর শাহাদাতের পর হযরত ইমাম হাসান মুসলিম জাহানের খলিফার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছয় মাস এ দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর মুসলিম উম্মাহকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষে ৪১ হিজরীর ২৫ রবিউল আউয়াল এক শান্তি চুক্তির মাধ্যমে তিনি আমীর মু'আবিয়ার অনুকূলে খেলাফত ত্যাগ করেন। অতঃপর হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনী স্বীয় পরিবার- পরিজনসহ মদীনায় ফিরে আসেন।

হযরত যায়নাব ও তাদের সাথে মদীনায় ফিরে আসেন। এর পর দীর্ঘ বিশ বছর তিনি মদীনায় অবস্থান করেন। হিজরী ৬০ সালের রজব মাসে আমীর মু'আবিয়ার মৃত্যু হলে ইয়াযীদ নিজেকে মুসলিম জাহানের খলিফা হিসাবে ঘোষণা করে। আমীর মু'আবিয়া মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বেই ইয়াযীদের অনুকূলে প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বাই'আত গ্রহণ করে তার ক্ষমতারোহণের পথ নিষ্কন্টক করে যান। হযরত ইমাম হোসাইনসহ কেবল চার ব্যক্তি এ বাই'আতের বাইরে ছিলেন।

আমীর মু'আবিয়া তার দীর্ঘকালীন রাজনেতিক অভিজ্ঞতার আলোকে ইয়াযীদকে অসিয়ত করে যান যাতে সে ইমাম হোসাইন (আ.) - এর নিকট থেকে বাই'আত আদায়ের চেষ্টা না করে; বরং তকে স্বাধীনভাবে নিজের মতো চলতে দেয়। কিন্তু উদ্ধত অহঙ্কারী ইয়াযীদ সে উপদেশকে গুরুত্ব না দিয়ে তার অনুকূলে হযরত ইমাম হোসাইনের নিকট থেকে বাই'আত আদায়ের জন্য মদীনার উমাইয়্যা আমীরকে নির্দেশ দেয়। মদীনার আমীর ওয়ালিদ বিন 'উতবাহ ইয়াযীদের নির্দেশ অনুযায়ী তার নিকট বাইআত দাবি করে। কিন্তু ইমাম এ দাবি দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, ইমাম হোসাইন (আ.) - এর পক্ষে ইয়াযীদের মতো চরিত্রহীন ব্যক্তিকে খলিফা হিসাবে স্বীকার করে নেয়ার প্রশ্নই ওঠেনা।

এমতাবস্থায় ইমাম হোসাইন মদীনা থেকে বেরিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি জানতেন যে, ইয়াযীদ তার নিকট থেকে বাই'আত আদায়ের জন্য শক্তি প্রয়োগ করবে যার পরিণাম যুদ্ধ ও ব্যাপক রক্তপাত। কিন্তু তিনি সর্বান্তঃকরণে রক্তপাত এড়াতে চাচ্ছিলেন। তাই তিনি স্বীয় পরিবার-পরিজন নিয়ে ২৮ রজব রাতে মদীনা ত্যাগ করে মাক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বনী হাশেমের যুবকগণও তার সঙ্গী হন। সর্বাবস্থায় ইমাম হাসানের সাথী প্রিয় বোন হযরত যায়নাবও তার সাথে রাওয়ানা হন; সাথে নেন তার দুই পুত্র 'আওন ও মুহাম্মাদকে। স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর তাইয়ার, দুই পুত্র আকবার ও আব্বাস এবং কন্যা কুলসুমকে মদীনায় রেখে যান।

কারবালায় বীর নারী

হযরত ইমাম হোসাইন ৩ শা'বান মক্কা মু'আয্যামায় এসে পৌছেন এবং মসজিদুল হারামে অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু মদীনার উমাইয়্যা আমীর ওয়ালিদ বিন 'উতবাহ ইয়াযীদকে খুশি করার লক্ষ্যে মক্কায় ঘাতকদল প্রেরণ করে। তারা ইমামকে হত্যার জন্য সুযোগ খুজতে থাকে। ইমাম তা জানতে পারেন। কিন্তু তিনি চাচ্ছিলেন না যে, মসজিদুল হারামে তার রক্তপাত ঘটুক। ঘাতকরা হজ্বের সময় তাকওয়াফকারীদের ভিড়ের মধ্যে ইমামকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্য দিকে কুফার লোকদের পক্ষ থেকে গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দান ও খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তার নিকট

একের পর এক পত্র আসছিল; তাদের ডাকে সাড়া দেয়ারও প্রয়োজন ছিল। এমতাবস্থায় ইমাম ৮ জিলহজ্ব মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

কুফার পথে কারবালায় উপনীত হবার পর হযরত ইমাম হোসাইন ইয়াযীদের অনুগত বাহিনী দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হন। তারা ইমামের কুফায় গমনের পথ বন্ধ করার সাথে সাথে তাদের জন্য ফোরাত নদীর পানিও বন্ধ করে দেয়। তারা ইমামকে ইয়াযীদের অনুকূলে বাই'আত হবার জন্য চাপ দেয়। তখন ইমাম হোসাইন তিনটি বিকল্প প্রস্তাব দেন, তা হচ্ছে : তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করবেন, অথবা দামেশকে গিয়ে সরাসরি ইয়াযীদের মুখোমুখি হবেন অথবা ইয়াযীদের শাসনাধীন এলাকার বাইরে চলে যাবেন। কিন্তু ইয়াযীদী বাহিনীর অধিনায়করা তা মানতে রাযী হয়নি। তারা বাই'আত, স্বেচ্ছাবন্দিত্ব বরণ করে কুফা হয়ে দামেশকে নীত হওয়া অথবা যুদ্ধ এ তিনটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করে। বলা বাহুল্য যে, ইমামের পক্ষে প্রথম দুই প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, তাই বাধ্য হয়ে তাকে যুদ্ধ ও শাহাদাতের পথ বছে নিতে হয়।

৬১ হিজরীর দশ মুহররম মানব জাতির ইতিহাসের সর্বাধিক বিয়োগান্তক ঘটনার দিন। প্রথমে হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) - এর ৫০ জন সহচর ইয়াযিদী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন। এর পর হুর বিন ইয়াযীদ ও তার সঙ্গীরা যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর ইমামের পরিবারের যুবকদের ও স্বজনদের যুদ্ধের পালা। এ সময় হযরত যায়নাব তার দুই পুত্র 'আওন ও মুহাম্মাদকে ইমামের পুত্রদের আগে যুদ্ধে পাঠান এবং উভয়ই শাহাদাত বরণ করেন।

'আওন ও মুহাম্মাদ শহীদ হলে ইমাম হোসাইন উভয়ের লাশ মোবারক এনে তার সামনে রাখেন। কিন্তু হযরত যায়নাব পুত্রদের শাহাদাতে সামান্যতমও ক্রন্দন বা মনোবেদনা প্রকাশ করেননি। এমনকি শহীদদ্বয়ের লাশ দেখার জন্য তাবুর বাইরেও যাননি। কিন্তু এরপর যখন ইমাম হোসাইন (আ.) - এর জৈষ্ঠপুত্র আলী আকবার রণাঙ্গনে গিয়ে শহীদ হলেন এবং ইমাম তার লাশ নিয়ে এসে তার শাহাদাতের কথা ঘোষণা করলেন তখন হযরত যায়নাব অস্থিতার সাথে তাবু থেকে বেরিয়ে

এলেন এবং আলী আকবারের লাশ জড়িয়ে ধরে এমনই বিলাপ করলেন যা কেবল কোনো মায়ের পক্ষে স্বীয় নিহত সন্তানের জন্য করা সম্ভব।

নিজ সন্তানের শাহাদাতের কারণে হযরত যায়নাবের মোটেই ব্যথিত না হওয়া ও আলী আকবারের শাহাদাতে বিলাপ করার মধ্যে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এবং অত্যন্ত উচুমানের আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিহিত রয়েছে। তা হচ্ছে, মানুষ যখন খালেসভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারই রাস্তায় কোনো কিছু দান করে, তখন ঐ বস্তুর ওপরে তার মালিকানার বিন্দুমাত্র অনুভূতি থাকে না। অতঃপর ঐ বস্তুর কী হলো তা তার অন্তরে কোনোরূপ ভাবান্তর সৃষ্টি করেনা। দানকৃত বস্তুর প্রতি সামান্যতম আকর্ষণ ও বজায় থাকার মানে হচ্ছে তার দান পুরোপুরি খালেস নয়। মোখলেস দাতা দানকৃত বস্তুর প্রতি কখনো ফিরে তাকায়না। এমনকি অনিচ্ছা সত্বেও চোখে পড়ে গেলে লজ্জিতভাবে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। কারণ, এভাবে দৃষ্টি পড়ার কারণে দানগ্রহীতার মনে হতে পারে যে, দাতা বোধ হয় দানকৃত বস্তুর মায়া পুরোপুরি কাটাতে পারেনি। দাতা আরো এক কারণে লজ্জিত হতে পারে, তা হচ্ছে, দানকৃত বস্তুকে দাতার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট মনে না হওয়া, অথচ ঐ মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু দিতে সক্ষম না হওয়া।

দ্বিতীয়ত হযরত যায়নাব হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) - কে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। তাই ইমামের সন্তান তার নিকট নিজের ও নিজের সন্তানের চেয়েও প্রিয়তর ছিল। এ কারনেই আলী আকবারের শাহাদাতে তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি, বরং বিলাপে ভেঙ্গে পড়েন।

হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) - এর শাহাদাতের পর তার পরিবারের নারী ও শিশুদের এবং অসুস্থ ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) - এর অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন হযরত যায়নাব। অসাধারণ ধৈর্যের সাথে তিনি কারবালার বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে আতঙ্কে ছড়িয়ে পড়া ইমাম - পরিবারের সদস্যদের একত্র করেন এবং অসুস্থ ও আহতদের সেবাশুশ্রূষা করেন।

কুফাবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ

ইয়াযীদের অনুগত বাহিনী হযরত যায়নাব ও হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) সহ আহলে বাইতের নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করে কুফায় নিয়ে যায়। কুফাবাসী বন্দিদের নিয়ে আসার দৃশ্য দেখার জন্য কুফার রাস্তায় জমা হয়। বন্দিদেরকে দেখার পর তাদের অনেকের চোখ অশ্রু সিক্ত হয়। তখন হযরত যায়নাব তাদের মধ্যে বিবেকের দংশন সৃষ্টির জন্য তীব্র ভাষায় তিরস্কার করে বক্তব্য রাখেন। কারণ, তারা ইমাম হোসাইনকে কুফায় এসে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব প্রদান ও খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখেছিল। কিন্তু পরে তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং ইমামের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে।

হযরত যায়নাব কুফাবাসীকে সম্বোধন করে প্রাঞ্জল ভাষায় যে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন তা মানব জাতির ইতিহাসে সর্বাধিক স্মরণীয় ভাষণসমূহের অন্যতম। তিনি বলেন : 'হে কুফার জনগণ! হে বাহানার আশ্রয়গ্রহণকারিগণ! হে প্রতারণার আশ্রয়গ্রহণকারিগণ! তোমরা আমাদের জন্য ক্রন্দন করছো; তোমাদের চোখের অশ্রুপ্রবাহ যেন বন্ধ না হয়, তোমাদের বিলাপ যেন নীরব হয়ে না যায়। তোমরা হচ্ছ সেই নারীর সমতুল্য যে তার সুতাকে মজবুত বুননে গেথে দেবার পর আবার তা খুলে ফেলছিলো, তারপর তার প্রতিটি তন্তুকে আলাদা করে ফেলছিলো। তোমরা তোমাদের ঈমানের সুত্রকে ছিন্ন করে ফেলেছো এবং তোমাদের মূল কুফরে ফিরে গিয়েছো। তোমরা কি তোমাদের শপথের ব্যাপারে প্রতারণা ও বিশ্বাস ঘাতকতা করতে চাও ? তোমাদের কাছ থেকে মিথ্যা দাবি, রিয়াকারী কলুষতা, চাটুকারিতা, হীনতা- নীচতা আর কথার ফুলঝুরি ছাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না। হে লোকেরা! তোমরা আবর্জনার স্তুপে জন্মগ্রহণকারী উদ্ভিদের ন্যায় অথবা এমন রৌপ্য ও চক- পাথর সমতুল্য যার ওপরে আলকাতরা লেপন করা হয়েছে। তোমরা তোমাদের পরকালের জন্য এই খারাপ পাথেয় প্রেরণ করেছো। তোমাদের ওপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিপতিত হোক। তোমাদের জন্য আল্লাহর আযাব প্রস্তুত হয়ে আছে যেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে। হে কুফাবাসী! তোমরা কি আমাদের জন্য ক্রন্দন ও বিলাপ করছো? আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি তোমরা অনেক বেশি কাঁদো এবং খুব কম হাসো। কারণ, তোমরা নিজেদের জন্য চিরন্তন অপরাধ ও লাজ্জা রেখে এসেছো এবং চিরন্তন লাঞ্ছনা খরিদ করছো। তোমরা কোনোদিনই

নিজেদের থেকে এ লাঞ্ছনা দূর করতে সক্ষম হবে না। আর কোনো পানি দ্বারাই তা ধুয়ে ফেলতে পারবেনা। তোমরা কীদিয়ে (এ লাঞ্ছনা ও লজ্জাকে) ধুয়ে ফেলবে? কোন কাজের দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ করবে? হোসাইন হচ্ছেন খাতামুন্নাবিয়্যিনের কলিজার টুকরা, বেহেশতে যুবকদের নেতা; তোমরা তাকেই হত্যা করেছো। তিনি ছিলেন তোমাদের সেরা মানুষদের আশ্রয়স্থল। যে কোন অবস্থায়, যে কোন ঘটনায় তোমরা তার নিকট আশ্রয় নিতে; তিনি তোমাদের ঐতিহ্যকে বাস্তবায়ন করতেন। তোমরা তার নিকট থেকে ধর্ম ও শরীয়তের শিক্ষা গ্রহণ করতে। হে লোকেরা! তোমরা অত্যন্ত খারাপ ধরনের পাপাচারে জড়িয়ে পড়েছো। আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে গিয়েছো। তোমাদের চেষ্টা- সাধনায় আর কী ফায়দা! তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতিতে নিমজ্জিত হয়েছো। তোমরা আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত হয়ে গেছো এবং তোমাদের নিজেদের জন্য নিকৃষ্ট আবাসস্থল ক্রয় করেছো। তোমাদের জন্য আফসোস, হে কুফার জনগণ! কারণ, তোমরা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর কলিজার টুকরাকে ছিন্নভিন্ন করেছো এবং তার পরিবারের পর্দানসীনা নারীদেরকে পর্দার বাইরে নিয়ে এসেছো। আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ব্যক্তির [রাসূল (সা.)- এর] সন্তানদের থেকে কতই না রক্ত প্রবাহিত করেছো! হে জনগণ! তোমরা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও জঘন্য কাজ করেছো- যার কদর্যতা আসমান ও যমিনকে আবৃত করে ফেলেছে। তোমরা কি এতে বিস্মিত হয়েছো যে, আসমান থেকে রক্ত বৃষ্টি হয়েছে! অবশ্য আখেরাতের শাস্তি তোমাদেরকে অধিকতর লাঞ্ছিত করবে এবং তখন কেউ তোমাদেরকে সাহায্য করতে আসবেনা। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছেন, সে কারণে তোমাদের আরামের নিঃশ্বাস ফেলার কোনো কারণ নেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা পাপাচারীদের শাস্তি দানের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করেন না এবং কালের প্রবাহে প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়টি পিছিয়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন হননা। তোমাদের রব পাপাচারীদের প্রতি দৃষ্টি রাখছেন।'

হযরত যায়নাব (আ.)- এর এ ভাষণ কুফার জনগণের অন্তরে তীব্র দংশন সৃষ্টি করে। তারা বুঝতে পারে যে, তারা এমন এক পৈশাচিক অপরাধ করেছে মানব জাতির ইতিহাসে যার দৃষ্টান্ত নেই। এ ভাষণ তাদের অচেতন অবস্থা থেকে চেতনায় ফিরিয়ে আনে। ফলে অচিরেই ইয়াযিদী জুলুম-

অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। পরবর্তীকালে ' মুখতারের অভ্যুত্থান' নামে খ্যাত অভ্যুত্থানের প্রচণ্ড আঘাতে জালিমদের প্রাসাদ ধসে পড়ে।

ইবনে যিয়াদের সাথে বিতর্ক

হযরত যায়নাব (আ.) - সহ আহলে বাইতের বন্দিদেরকে কুফায় ইয়াযীদের নিয়োজিত আমীর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে হযরত যায়নাব ও ইবনে যিয়াদের মধ্যে যে বাকযুদ্ধ সংঘটিত হয় কার্যত তাতেই ইবনে যিয়াদের পতন নিশ্চিত হয়ে যায়। কারণ, হযরত যায়নাব তাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করেন এবং তার স্বরূপ সর্বসমক্ষে উম্মুক্ত করে দেন। ফলে মনের দিক থেকে সকলেই তার বিরুদ্ধে চলে যায়।

ইবনে যিয়াদ হযরত যায়নাব –কে চিনতে পেরে তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করে। ইবনে যিয়াদ বলে : 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তোমাদের লাঞ্ছিত করেছেন এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করেছেন, আর তোমাদের বাগাড়ম্বরকে মিথ্যা প্রমাণ করেছেন।' সাথে সাথে হযরত যায়নাব জবাব দিলেন : 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তার নবী মুহাম্মাদ (সা.) - এর বদৌলতে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং আমাদেরকে সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করেছেন। হযরত যায়ন)াব এখানে 'আয়াতে তাতহীর' নামে খ্যাত আলনং ৩৩আহযাবের - হয়েছে। এ আয়াতে আয়াতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যাতে আহলে বাইতের সদস্যদের পবিত্রতার কথা বলা আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ 'হে আহলে বাইত অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূরীভূত করতে ! এবং তোমাদেরকে যথাযথভাবে পবিত্র করতে চান।') অবশ্যই ফাসেক লাঞ্ছিত হবে এবং ফাজের (পাপাচারী) মিথ্যা বলছে; আর সে ব্যক্তি আমরা ছাড়া অন্য কেউ। তাই সকল প্রশংসা আল্লাহর।'

ইবনে যিয়াদ এ ধরণের জবাবের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। তাই এভাবে লাঞ্ছিত হয়ে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং হযরত যায়নাবকে যে কোনভাবে লাঞ্ছিত করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এবার ইবনে যিয়াদ নতুন করে বিদ্রূপবাণ ছুড়ে দিল : 'আল্লাহ তোমার ভাইয়ের সাথে যে আচরণ করলেন তা কেমন দখলে? সে খলীফা ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ছিল ও প্রতিরোধ গড়ে

তুলে ছিল, তাই আল্লাহ তাকে হতাশ করলেন এবং ইয়াযীদকে সাহায্য করলেন।' জবাবে হযরত যায়নাব বললেন : 'আমরা এতে উত্তম বৈ কিছু দেখিনি। আল্লাহ তা'আলা আমার ভাইকে শাহাদাতের মর্যাদায় পৌছিয়ে সম্মানিত করেছেন। আমার ভাই সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছেন, আর তা হচ্ছে তার রাস্তায় নিহত হওয়া। আল্লাহর পক্ষ থেকে এর চেয়ে উত্তম আচরণ আর উত্তম বেচা- কেনা কী হতে পারে? আল্লাহ তাদের জন্য শাহাদাত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তোমাকে এবং তুমি যাদেরকে হত্যা করেছ তাদেরকে খুব শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা বিচারার্থে তার আদালতে হাজির করবেন। অতএব, জবাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত হও। কী জবাব দেবে সেদিন? সেদিনর জন্য উদ্বিগ্ন হও। কে সেদিন বিজয়ী ও সফল হবে, হে যেনাকারিণীর পুত্র?'(ঐতিহাসিক গণ এ ব্যাপারে একমত যে, ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ছিল তার মায়ের জারজ সন্তান(

এতে ইবনে যিয়াদ তীরবিদ্ধ নেকড়ের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু দেয়ার মতো উপযুক্ত জবাব তার কাছে ছিল না। তাই চরম নির্লজ্জতার সাথে বলল : 'আমার অন্তর শীতল হয়েছে, আমি খুশি হয়েছি। কারণ, আমি যা চেয়েছি তা পেয়েছি।'

জবাবে হযরত যায়নাব বললেন : 'তুমি দুনিয়ার দ্বারা নেশাগ্রস্ত, প্রতারিত ও ফিতনাগ্রস্ত। কিন্তু তোমার এ আধিপত্য টিকে থাকবেনা, বরং খুব শীঘ্রই বিলুপ্ত হবে। তুমি কি মনে করেছো যে, হোসাইনের পরে তুমি আনন্দের সাথে পৃথিবীতে চিরদিন টিকে থাকবে? তুমি কি মনে করছো যে, স্বস্তিতে থাকবে? কখনো নয়; তুমি স্বস্তির মুখ দেখবে না। তুমি তোমার অভীষ্ট লক্ষে উপনীত হতে পারবে না। হে ইবনে যিয়াদ ! তুমি নিজ হাতে নিজের ওপর যে কলঙ্ক লেপন করেছ তা অনন্তকাল পর্যন্ত থেকে যাবে।'

এতে দিশেহারা, অস্তির ও ক্ষিপ্ত হয়ে ইবনে যিয়াদ চিৎকার করে উঠল : 'আমাকে এ নারীর হাত থেকে মুক্তি দাও; ওদেরকে কারাগারে নিয়ে যাও।'

ইবনে যিয়াদের নির্দেশমতো হযরত যায়নাব সহ বন্দিদেরকে কুফার প্রাসাদের কাছে কারাগারে আটক রাখা হলো এবং হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) - এর কর্তিত শির কুফার রাস্তায় রাস্তায় ও বাজারে ঘুরিয়ে লোকদের দেখানো হলো।

বন্দিদেরকে কিছুদিন কুফার কারাগারে আটক রাখা হলো। এর পর হযরত ইমামের শির মোবারকসহ তাদেরকে দামেশকে ইয়াযীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

ইয়াযীদের দরবারে

হযরত যায়নাবসহ বন্দিদেরকে ইয়াযীদের দরবারে হাজির করার আগেই ইয়াযীদের সামনে হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) - এর কর্তিত মস্তক পেশ করা হয়। বন্দিরা যখন দরবারে প্রবেশ করেন তখন ইয়াযীদ ও তার পরিষদবর্গ হাসিঠাট্টায় মশগুল ছিল। হযরত ইমামের শিরের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই নিজের অজান্তেই হযরত যায়নাব ফরিয়াদ করে ওঠেন : 'হায় আমার প্রিয়! হায় মক্কা তনয়ের (অর্থাৎ হযরত আলী (আ.) - এর। কা'বাগৃহে তার জন্ম হয়েছিল বলে বর্ণিত আছে) হৃদয়ের ফসল! হায়া মুস্তাফা- তনয়ার (অর্থাৎ হযরত ফাতেমা (আ.) - এর) পুত্র!...'

হযরত যায়নাবের হৃদয়বিদারক ফরিয়াদে মূহুর্তের মধ্যে মজলিসের হাসি- আনন্দ নিভে যায়। অতঃপর হযরত যায়নাব ও ইয়াযীদের মধ্যে কিছুক্ষণ বাকযুদ্ধ চলে এবং এ বাকযুদ্ধে হযরত যায়নাবের কথায় ইয়াযীদ চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়।

হযরত যায়নাবের ফরিয়াদে মজলিসে নীরবতা নেমে এলে কিচুক্ষণ পর সিরীয় এক ব্যক্তি নীরবতা ভঙ্গ করে হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) - এর কন্যা ফাতেমাকে দাসী হিসাবে দেয়ার জন্য ইয়াযীদের কাছে অনুরোধ জানায়। এতে ফাতেমা ভয় পেয়ে তার ফুফুকে জড়িয়ে ধরলে হযরত যায়নাব তাকে সান্তনা দিয়ে বলেন : 'শান্ত হও; এ হওয়ার নয়; কেউ, এমনকি ইয়াযীদও তোমাকে দাসী বানাতে পারবেনা।'

হযরত যায়নাবের এ উক্তিতে ইয়াযীদের অহংবোধে দারুণ আঘাত লাগে। তাই সে বলে : 'আমি চাইলে হোসাইনের কন্যাকেও দাসী বানাতে পারি; এতে কোনো সমস্যা নেই।' হযরত যায়নাব দৃঢ়তার সাথে বললেন : 'তা পারবে না, যদি না আমাদের দীন ও আমাদের মিল্লাত থেকে বেরিযে যাও।'

ইয়াযীদ তার অহংবোধ চরিতার্থ করতে গিয়ে এভাবে অপমানিত হবে তা ভাবতেও পারেনি। তাই হযরত যায়নাবকে পাল্টা অপমান করার জন্য বলল : 'নিঃসন্দেহে তোমার বাবা ও তোমার ভাই-ই আল্লাহর দ্বীন থেকে বেরিয়ে গেছে।' সাথে সাথে হযরত যায়নাব দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন : 'আমার পিতা ও আমার ভ্রাতার দ্বীনের দ্বারাই তুমি পথ পেয়েছো যদি তুমি মুসলিম হয়ে থাকো।' হযরত যায়নাব সুস্পষ্ট ভাষায় ইয়াযীদের মুসলমান হওয়ার বিষয়টিকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেন। এর কোনো জবাব না থাকায় ইয়াযীদ ক্ষিপ্ত হয়ে (চিৎকার করে) বলে : 'মিথ্যা বলছ, হে আল্লাহর দুশমন!'

এ ধরনের গালির জন্য হযরত যায়নাব প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।কিন্তু শীঘ্রই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন : 'যেহেতু ক্ষমতা তোমার হাতে তাই গালি দিচ্ছো, মন্দ বলছো, জুলুম করছো।'

এ কথার কোনো জবাব খুজে না পেয়ে ইয়াযীদ নীরব হলো। কিন্তু এ সময় সেই সিরীয় ব্যক্তি ফাতেমা বিনতে হোসাইনকে দাসী হিসাবে দেয়ার জন্য ইয়াযীদের কাছে পুনরায় অনুরোধ জানায়। এতে যায়নাব তেজোদীপ্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। 'নাসেখুত তাওয়ারীখ' গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত যায়নাব লোকটিকে দৃঢ়কণ্ঠে ধমক দিয়ে বললেন : 'চুপকরো, আল্লাহ তোমার কণ্ঠরোধ করে দিন, তোমাকে অন্ধকরে দিন, তোমার হাতকে অবশ করে দিন এবং তোমাকে দোযখের আগুনে জায়গা দিন; রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সন্তানগণ (বংশধরগণ) যেনাকারিণীর সন্তানের খেদমতে নিয়োজিত হবে না কখনোই।' সাথে সাথেই অভিশপ্ত সিরীয় লোকটির দু'হাত অবশ হয়ে যায় এবং সে সেখানেই মারা যায়।

এভাবে হযরত যায়নাব (আ.) -এর নিকট থেকে কারামত প্রকাশিত হওয়ায় ইয়াযীদ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং পরিবেশ পরিবর্তনের লক্ষে মদপান ও কবিতা আবৃতি শুরু করে। তখন হযরত যায়নাব (আ.) বলেন : 'হে ইয়াযীদ ! হোসাইনকে হত্যা করাই কি তোমার জন্য যথেষ্ট হয়নি? তুমি তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে; হত্যা করেছো। তোমার জন্য এটাইকি যথেষ্ট

নয় যে, তার পরিবার- পরিজনকে বন্দি করেছো' শহরে শহরে ঘুরিয়েছো এবং এই অবস্থায় তোমার দরবারে নিয়ে এসেছো? আর এখন তার কর্তিত মস্তকের সাথে এ আচরণ করছো!'

জবাবে ইয়াযীদ বলল : 'তোমার ভাই হোসাইন কি বলতনা : "আমি ইয়াযীদের চেয়ে উত্তম।"? হোসাইন কি বলতনা : "আমার পিতা ইয়াযীদের পিতার তুলনায় উত্তম "? সে কি বলতনা : "আমার মাতা ইয়াযীদের মাতার চেয়ে উত্তম "?' জবাবে হযরত যায়নাব শুধু এতটুকু বললেন : ' তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে, হোসাইন তোমার চেয়ে উত্তম, তার পিতা তোমার পিতার চেয়ে উত্তম, তার মাতা তোমার মাতার চেয়ে উত্তম ?'

এবার ইয়াযীদ এক নতুন কুটকৌশলের আশ্রয় নিল। বলল : 'তোমার ভাই কি এ আয়াত পড়েনি যে, আল্লাহর হাতেই রাজত্ব এবং তিনি যাকে চান রাজত্ব দেন, যার কাছ থেকে চান রাজত্ব ফিরিয়ে নন, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন; তার হাতেই কল্যাণ নিহিত'? কুরআন মজীদের সূরা আলে ইমরানের ২৬ নং আয়াত উদ্ধৃত করে ইয়াযীদ বলল : 'তোমার ভাই কি এ আয়াত পড়েনি? যদি পড়ে থাকে তাহলে তার জানা উচিত ছিল যে, সত্য আমার অনুকূলে; আল্লাহ তোমার পিতার কাছ থেকে রাজত্ব নিয়ে আমার পিতাকে দিয়েছেন এবং হোসাইনকে লাঞ্ছিত করেছেন ও আমাকে সম্মানিত করেছেন।'

ইয়াযীদ এভাবে কুরআন মজীদের অপব্যাখ্যা করায় হযরত যায়নাব এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন যা মানব জাতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ হিসাবে পরিগণিত।

হযরত যায়নাব - এর ভাষণ

হযরত যায়নাব (আ.) ইয়াযীদের দরবারে নিম্নোক্ত ভাষণ দেন : আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন ওয়া সাল্লাল্লাহু 'আলা রাসূলিহি ওয়া আলিহি আজমা'ঈন। পরম প্রমুক্ত আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন। যারা খারাপ কাজ করেছে তাদের পরিণতি এই হয়েছে যে, তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করেছে এবং তা নিয়ে উপহাস করেছে। হে ইয়াযীদ ! তুমি কি মনে করছ যে, তুমি এমনভাবে আমাদের জন্য ভূ- পৃষ্ঠের সকল জায়গাকে ও আকাশের দিগন্তসমূহকে রুদ্ধ

করে দিয়েছো যে, অতঃপর আমরা ক্রীতদাস- দাসীদের মতো অসহায় হয়ে পড়েছি এবং এজন্যই যেদিকে খুশি টেনে নিচ্ছ? তুমি কি মনে করেছো যে, আমরা আল্লাহর নিকট তুচ্ছ, আর তুমি সম্মানিত এবং আমাদের ওপরে তোমার বিজয়ের কারণে তুমি তার নিকট মর্যাদার অধিকারী? এ কারণেই কি তুমি তোমার নাসিকা উচু করেছো ও অহঙ্কার করেছো এবং আনন্দে আত্মগৌরব করছো যেন গাটা পৃথিবী তোমার ধনুকের আওতার মধ্যে এবং তোমার সকল কাজ কর্মকে সুন্দর ও চমৎকার মনে করছো? আমাদের শাসন - কর্তৃত্ব (তোমার হাতে গিয়ে) তোমাকে সুখে নিমজ্জিত করেছে; ধীরে ধীরে তুমি মহিমান্বিত মহা প্রতাপশীল আল্লাহর সেই বাণী ভুলে গিয়েছো : 'কাফেররা যেন মনে না করে যে, আমরা যে তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি তা তাদের নিজেদের জন্য কাল্যাণকর। বরং আমরা তাদেরকে এজন্যই অবকাশ দিচ্ছি যাতে তাদের পাপসমূহ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়।(সূরা আলে 'ইমরান : ১৭৮।)

হে সেই ব্যক্তির পুত্র যাকে বন্দি হবার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল উল্লেখ্য), আমীর মু'আবিয়া হযরত রাসূলুল্লাহ কর্তৃক মক্কা বিজয়ের সময় বন্দি হয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলে তাকে মুক্তি দেয়া (.সা) (হয়।! এটা কি ন্যায়সঙ্গত কাজ যে, তুমি তোমার পরিবারের নারী ও কন্যাদেরকে সসম্মানে পর্দার অন্তরালে রেখেছো, আর রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর কন্যাদেরকে (তার বংশধর নারী ও কন্যাদেরকে) বন্দি করে যেদিকে খুশি নিয়ে যাচ্ছ? তুমি তাদের পর্দাকে ছিন্ন করেছো, তাদের চেহারাকে উম্মুক্ত করেছো; শত্রুরা তাদেরকে এক শহর থেকে আরেক শহরে টনে নিয়ে গেছে এবং বেগানা ও আদিবাসী লোকেরা তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে; কাছের লোক ও দূরের লোকেরা এবং ইতর লোকেরা ও শরীফ লোকেরা তাদেরকে দেখেছে। না তাদের পুরুষদের মধ্য থেকে তাদের কোনো অভিভাবক (বেচে) আছেন, না তাদের সহায়কদের মধ্য থেকে কোনো সহায়ক (বেচে) আছেন। এমতাবস্থায় কীভাবে তারা এমন এক বন্ধুর আশা করতে পারেন যিনি তার কথার দ্বারা তাদেরকে সান্তনা দেবেন- যার দেহের মাংস শহীদগণের খুন থেকে গঠিত হয়েছে? এমতাবস্থায় এটা কী করে সম্ভব যে, যে ব্যক্তি আমাদের আহলে বাইতের প্রতি হিংসা ও ঈর্ষার দৃষ্টি পোষণ করে সে দুশমনী চরিতার্থ করবেনা? তাই এটাই স্বাভাবিক যে, তুমি কোনো

পপাপবোধ ছাড়াই এবং একাজকে গুরুতর মনে না করেই (কবিতার ভাষায়) বলছ : 'আহা! তারা (গোত্রের গত হয়ে যাওয়া লোকেরা) যদি থাকতেন এবং আনন্দের সাথে এ প্রতিশোধ গ্রহণ দেখতেন, তাহলে বলতেন : 'হে ইয়াযীদ ! তোমার হস্ত প্রকম্পিত না হোক।" আর (এ কথা বলে) বেহেশতে যুবকদের নেতা আবু আবদুল্লাহ হোসাইনের দাতে আঘাত করছো। আর কেনোই বা তুমি তা বলবেনা যখন তুমি মুহাম্মাদ (সা.) –এর বংশধরের যখমকে বৃদ্ধি করেছো, তার দাড়ি (হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) - এর) উৎপাটিত করেছো ও পুড়িয়েছো এবং তার খুনকে প্রবাহিত করেছো? অথচ আবদুল মুত্তালিবের এ বংশধর ছিলেন ধরণীর অধিবাসীদের মধ্যে নক্ষত্রতুল্য।
তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের স্মরণ করছো এবং তাদেরকে আহবান করছো। অবশ্য খুব শীঘ্রই তুমি তাদের কাছে প্রেরিত হবে এবং (সেখানে) এরূপ কামনা করবে যে, (দুনিয়ার বুকে) যদি তোমার হস্তদ্বয় অবশ হয়ে যতো এবং তুমি বোবা হতে, আর যা বলেছো তা না বলতে ও যা করেছো তা না করতে !
হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের অধিকার আদায় করো, যারা আমাদের ওপর জুলুম করেছে তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো, আর যারা আমাদের রক্ত প্রবাহিত করেছে তাদের জন্য তোমার গযব অবধারিত করো। সে আমাদের সহায়কদেরকে হত্যা করেছে।
আল্লাহর কসম! তুমি তা কেবল নিজের চামড়াকেই (কেটে) ফাক করেছো, কেবল নিজের মাংসকেই টুকরা টুকরা করেছো। তুমি অচিরেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াআলিহ) - এর বংশধরদের রক্তপাতের এবং তার স্বজনদের ও যারা তার শরীরের অংশস্বরূপ তাদের সম্ভ্রমহানির দায় বহনরত অবস্থায় তার নিকট প্রেরিত হবে। অন্যদিকে আল্লাহ তাদের (আহলে বাইতের বেচে থাকা সদস্যদের।) পরেশানী ও দুশ্চিন্তা- উদ্বেগকে দূর করে দেবেন এবং তাদের বিক্ষিপ্ততার অবসান ঘটাবেন, আর তাদের অধিকার আদায় করবেন (তাদেরকে হত্যা ও তাদের প্রতি জুলুমের প্রতিশোধ নেবেন)। 'আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত মনে করোনা, বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত- রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছে।'(সূরা আলে ইমরান

: ১৬৯) আর বিচারক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং প্রতিপক্ষ (অভিযোগকারী) হিসাবে মুহাম্মাদ (সা.) ও পৃষ্ঠপোষক হিসাবে জিবরাঈলই যথেষ্ট।

যে ব্যক্তি (আমীর মু'আবিয়ার প্রতি ইঙ্গিত) তোমার জন্য এসবের ব্যাবস্থা করেছে এবং তোমাকে মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে সে অচিরেই জানতে পারবে যে, জালিমদের জন্য কতই না মন্দ প্রতিদান রয়েছে এবং (এ-ও জানতে পারবে যে) তোমাদের মধ্যে কার অবস্থান নিকৃষ্টতর, আর কার বাহিনী দুর্বলতর !

যদিও ঘটনাচক্র আমাকে তোমার সাথে কথা বলতে বাধ্য করেছে, কিন্তু আমি তোমাকে খুবই তুচ্ছ ও নীচ মনে করি এবং তোমাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করছি ও অনেক বেশি নিন্দা করছি, কিন্তু (আমার ভাইয়ের হত্যার কারণে মুসলমানদের) দৃষ্টিসমূহ অশ্রুসজল আর হৃদয়সমূহ কাবাবসম দগ্ধীভূত।

বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপারে যে, শয়তানের দলের হাতে আল্লাহর দলের সদস্যরা নিহত হয়েছেন এবং তোমাদের মুখ থেকে আমাদের মাংস চর্বিত হয়ে পড়েছে, আর ঐ পবিত্র লাশগুলোকে নেকড়েরা ঘিরে রেখেছে ও চিতারা তাদেরকে টানাহেচড়া করছে।('তোমাদের মুখ থেকে ...টানাহেচড়া করছে।'রূপক অর্থে জুলুম- নির্যাতন ও অবমাননা বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।)

আজকে যদি তুমি আমাদেরকে গনিমত হিসাবে গণ্য করে থাক ও লাভজনক মনে করে থাকো, তাহলে খুব শীঘ্রই আমাদেরকে তোমার লোকসান ও ক্ষতির কারণ হিসাবে দেখতে পাবে- যখন তোমার হস্তদ্বয় যা পাঠিয়েছে তা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। 'আর তোমার রব বান্দার ওপর জুলুমকারী নন।'(সূরা হা- মীম আস- সাজদাহ: ৪৬।) অতএব, তুমি যে ষড়যন্ত্রই করতে চাও করো যে চেষ্টাই করতে চাও কারো, সমস্ত সাধনাকে কাজে লাগাও। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমাদের স্মরণ বিলুপ্ত করতে পারবে না এবং আমাদের (নিকট আগত) ওহীকে দূর করে দিতে পারবে না, আমাদের অবস্থানে কখনোই তুমি পৌছতেঁ পারবে না এবং এই (আমাদের ওপর জুলুম- অত্যাচারের) কলঙ্ক ঘুচাতে পারবে না। তোমার অভিমত একেবাই মূল্যহীন, তোমার

(রাজত্বের) দিনসমূহ কয়েক দিন বৈ নয়; আর যেদিন ঘোষণাকারীরা ঘোষণা প্রদান করবে সেদিন তোমার লোকজনরা পেরেশানীর কবলে নিক্ষিপ্ত হবে।

মনে রেখো, জালেমদের ওপর আল্লাহর লা'নত। অতএব, সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের রব আল্লাহর জনন্য যিনি আমাদের অগ্রবর্তীদের জন্য সৌভাগ্য ও ক্ষমার পরিণতি দিয়েছেন এবং আমাদের মধ্যকার অনুবর্তীদেরকে শাহাদাত ও রহমতের পরিণতি দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর নিকট দো'আ করি, তিনি তাদের শুভ প্রতিদান পূর্ণ করে দিন এবং তাদেরকে (স্বীয় অনুগ্রহ) বৃদ্ধি করে দিন এবং আমাদেরকে তাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী করুন। অবশ্যই তিনি দয়াবান, প্রেমময়। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং কতই না উত্তম অভিভাবক তিনি !'(সূরা আলে 'ইমরান : ১৭৩)

হযরত যায়নাব (আ.) - এর এ ভাষণ ইয়াযীদের পরিষদবর্গের অনেকের মধ্যেই ভাবান্তর সৃষ্টি করে। পরে এ ভাষণ তাদের মাধ্যমে দামেশকের জনগণের মধ্যে এবং অচিরেই তৎকালীন মুসলিম জাহানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ও বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি কিরে। কারবালার ঘটনার দশ বছরের মধ্যে হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) - এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষে উমাইয়্যা শাসনের বিরুদ্ধে মুখতারের অভ্যুত্থানসহ বহু বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। শুধু আরব উপদ্বীপেরই চার লক্ষ লোক ইমাম হোসাইনের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অভ্যুত্থান করে। বস্তুত হযরত যায়নাবের ভাষণই উমাইয়্যা শাসন উৎখাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

হযরত যায়নাবের ভাষণের পর আর ইয়াযীদের পক্ষে আহলে বাইতের সদস্যদের ওপর জুলুম-অত্যাচার অব্যাহত রাখা সম্ভব ছিল না। তাই সে তাদেরকে মুক্তি দেয় এবং মদীনায় ফিরে যাবার অনুমতি দেয়। সে সাথে তাদের নিরাপত্তার জন্য একদল সশস্ত্র প্রহরী প্রদান করে। হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীনের নেতৃত্বে আহলে বাইতের কাফেলা কারবালা যিয়ারতসহ বিভিন্ন শহর হয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে। পথে প্রতিটি শহর- জনপদে হাজার হাজার মানুষ তাদের কাছে এসে

ভিড় জমায় এবং হযরত যায়নুল আবেদীন ও হযরত যায়নাব লোকদের নিকট কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনাবলী বর্ণনা করেন। এর ফলে জনমনে উমাইয়্যা শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

সিরিয়া প্রত্যাবর্তন ও ইন্তেকাল

আহলে বাইতের কাফেলা মদীনায় পৌছার পর হযরত যায়নাব সেখানে বেশি দিন থাকেননি। এ সময় মদীনায় খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তাই তিনি সিরিয়ায় তার স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর তাইয়ারের খামারবাড়িতে চলে আসেন। এখানে আগমনের অল্প দিনের মধ্যেই ৬২ হিজরীর ১৫ রজব তিনি ইন্তেকাল করেন। সেখানের তাকে দাফন করা হয়। এ জায়গা পরবর্তীকালে 'যায়নাবিয়া নামে' পরিচিত হয় যা বর্তমানে দামেশক শহরেরই অংশ।

আশুরা আন্দোলনের শিক্ষা ও তাৎপর্য

পবিত্র আশুরার উত্থানের লক্ষ্য

ইমাম খোমেইনী (রহ.) - এই বাণী থেকে

সকল নবী ও রাসূলকে পাঠানো হয়েছিল সমাজ সংস্কারের জন্য। তারা সবাই জানতেন যে, সমাজের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ কুরবানি দিতে হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ তা যত বড়ই হোক না কেনো, এমনকি যদি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা বস্তুকেও সমাজের কল্যাণে কুরবানি দিতে হয় তাতেও তারা পিছপা হন না। শহীদদের নেতা ইমাম হোসাইন (আ.) এ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে জেগে উঠেছিলেন এবং সহায়-সম্পত্তি ও অনুগতদের সাথে নিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। ইমাম হোসাইন শাহাদাতবরণ করেছিলেন স্বর্গীয় শান্তি ও আল্লাহর ঘরের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য।

* * *

প্রথম দিন থেকে ই ইমাম হোসাইন (আ.) - এর উত্থান বা জিহাদের লক্ষ্য ছিল ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। তিনি লক্ষ্য করলেন, ভালো কিছুর বাস্তবায়ন সহজে হয়না, কিন্তু মন্দের চর্চা চলতে থাকে। তার লক্ষ্য ছিলো সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজ থেকে মন্দ কাজ দূর করা। নিষিদ্ধ জিনিসের চর্চাই সমাজে সব ধরনের অনাচার সৃষ্টির কারণ। আমরা যারা শহীদদের নেতার অনুসারী তাদেরকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে তারা কীভাবে জীবন যাপন করতেন। ইমাম হোসাইন (আ.) - এর জিহাদের লক্ষ্য ছিল সমাজের সব খারাপ ও শয়তানী কাজের মুলোৎপাটন এবং জালিমের শাসন উৎখাত করা।

* * *

শহীদদের নেতা তার সারা জীবন ব্যয় করেছেন সমাজের সব মন্দের মুলোৎপাটন এবং জালিমের শাসন ও নিপীড়ন প্রতিরোধ করতে। তিনি অনৈতিকতা ও শাসক শ্রেণীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন যা আজকের দুনিয়ায় বিশেষভাবে শাসক শ্রেণী করে থাকে।

শহীদদের নেতা তার জিহাদের অন্তর্নিহিত কারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি নিজের এবং তার সন্তানদের জীবন ও মান- সম্মান উপেক্ষা করেছিলেন। তিনি জানতেন এ থেকে কী ফল আসবে। ইমামের সঙ্গে যারা মদীনা থেকে মক্কায় এসে ছিলেন এবং মক্কা থেকে শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে ছিলেন তারা তার পবিত্রতা দেখেছিলেন। ইমাম হোসাইন কী করতে যাচ্ছেন তা তিনি খুব ভালো করে জানতেন। এটা এমন ছিলো না যে, তিনি দেখতে চেয়েছিলেন কী হয়; বরং তিনি একটি জালিম সরকারের মুলোৎপাটনের জন্য জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

* * *

শহীদদের নেতা দেখলেন যে, আদর্শ ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে ইমাম হাসান ও আমীরুল মু'মিনীন ইমাম আলী (আ.) - এর জিহাদ এবং পৌত্তলিক ও জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে নবিগণের সংগ্রাম কোনো দেশ দখলের জন্য ছিলো না। কারণ, তাদের কাছে সারা দুনিয়ারও কোনো মূল্য ছিলো না। তাদের সামনে কোনো ভূখণ্ড দখলের উদ্দেশ্যও ছিলো না।

* * *

কুফা ও কারবালায় ইমাম হোসাইন (আ.) যে জিহাদ করেছিলেন তা ছিল জুলুম- অন্যায়ের বিরুদ্ধে আদর্শের সংগ্রাম। এটা ছিলো তার ঈমান এবং এর জন্য তিনি তার সর্বস্ব ত্যাগ করতে পরেছিলেন। তিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন ইসলামের ওপর ঈমান ও অগাধ বিশ্বাসের কারণেই। তার শাহাদাতবরণ করার মাধ্যমে উৎপীড়ক শাসকের পরাজয় হয়েছিলো।

* * *

ইমাম হোসাইন ইয়াযীদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ঠিকই, তবে সম্ভবত তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি ইয়াযীদের রাজত্ব উৎখাত করতে পারবেন না। বলা হয়ে থাকে, তিনি এটা জেনে- বুঝেই জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন যে, একজন স্বৈরাচারী ও উৎপীড়ক শাসকের বিরুদ্ধে তাকে জিহাদ করতে হবে। এমনকি তাকে তার ঈমান ও বিশ্বাসের জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে হতে পারে। অতএব, তিনি জেগে উঠলেন, নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন এবং তার সাথে বহু নিরপরাধ মানুষ ও শহীদ হলেন।

* * *

মহান ইমাম ইসলাম ও মুসলমানদের ভবিষ্যতের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি চ্যালেঞ্জ নিলেন, যুদ্ধ করলেন এবং জীবন উৎসর্গ করলেন। শহীদদের নেতা মনে করলেন, এ স্বৈরাচার ও জালিম শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তার কর্তব্য। পারিপার্শ্বিকতা সেভাবেই তৈরী হলো এবং তিনিও তার সঙ্গী- সাথীরা জীবন উৎসর্গ করার মাধ্যমে উৎপীড়ক শাসকের মুখোশ উম্মোচন করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, একজন জালিম শাসক দেশের লক্ষ্য ভিন্ন দিকে পরিচালিত করছে। তিনি এটাও লক্ষ্য করলেন যে, একটি জালিম শক্তি রাষ্ট্রের গন্তব্য ব্যাহত করছে এবং তিনি এতে বাধা দেয়া পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করলেন। যদিও এটা স্পষ্ট ছিলো যে, ইমাম হোসাইন (আ.) এবং তার অনুসারীদের পক্ষে এত বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে দাড়ানো কঠিন, তারপরও স্বর্গীয় পবিত্র দায়িত্বানুভূতি থেকে তিনি তা করলেন।

তখন শহীদদের নেতার জন্য দায়িত্ব ছিল জেগে ওঠা (জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া), নিজের রক্ত দেয়া যাতে জাতি পুনর্গঠিত হতে পারে এবং ইয়াযীদের পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয়। ঠিক এটাই ঘটলো। ইমাম হোসাইন নিজের রক্ত ও নিজ সন্তানের রক্ত দিলেন, ইসলামের জন্য তিনি তার সব কিছু দিলেন।

* * *

ইমাম হোসাইন (আ.) জেগে উঠেছিলেন এমন এক সময় যখন তার কাছে উল্লেখযোগ্য কোনো বাহিনী ছিলো না। আল্লাহ্ মাফ করুন, তিনি যদি অলস হয়ে বসে থাকতেন এবং বলতেন, ‘এটা আমার দায়িত্ব নয়’, তাহলে এটা উমাইয়্যা শাসক গোষ্ঠিকে সবচেয়ে বেশি খুশি করতো। কিন্তু ইমাম মুসলিম ইবনে আকীলকে পত্র পাঠালেন- লোকজনকে তার আনুগত্য প্রকাশ করে তার বাইআত নেয়ার জন্য দাওয়াত দিতে বললেন যাতে ইয়াযীদের দুর্নীতিগ্রস্থ শাসনের বিপরীতে একটা ইসলামী সরকার গঠন করা যায়। ইমাম খুব স্বাচ্ছন্দেই মদীনায় থাকতে পারতেন এবং তিনি লোকজনকে ইয়াযীদের কাছে বাইআত নিতে বলতে পারতেন। এতে ইয়াযীদ বেশি খুশি হতো এবং সে ও তার লোকজন ইমামের হাতে চুমু দিতো।

শহীদদের নেতা জেগে উঠেছিলেন ইসলামকে শক্তিশালী করতে, সব ধরনের নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও জুলুম প্রতিরোধ করতে এবং তিনি দাড়িয়েছিলেন তখনকার এক স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে।

অনুবাদ : সাইদুল ইসলাম

সুত্র:মাহজুবা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

আয়াতুল্লাহ আল উযমা সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী প্রদত্ত ভাষণ

১৪১৫ হিজরীর মুহররম মাসে কোহিকলূয়েহ ও বোয়ের আহমদ প্রদেশের আলেমদের সাথে সাক্ষাতকালে ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতা আয়াতুল্লাহ আল উযমা সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী প্রদত্ত ভাষণ

পরম করুণাময় দাতা ও দয়ালু মহান আল্লাহর নামে।

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর এবং দরুদ ও সালাম আমাদের নেতা মহানবী (সা.) ও তার পবিত্র বংশধরদের ওপর বর্ষিত হোক। সৌভাগ্যবশত আজ আলেমগণ ও মুবাল্লিগদের সাথে সাক্ষাৎ - যা প্রতি বছর মুহররম মাসের পূর্বে প্রচলিত একটি প্রথা, এ বছর তা এই শহর ও এই প্রদেশে অনুষ্ঠিত হলো। আমরা এ সুযোগটি কাজে লাগাতে এবং পবিত্র মুহররম মাস ও আশুরার অবিস্মরণীয় স্মৃতি সম্পর্কে বেশ কিছু বিষয় প্রিয় আলেম ভাইদের খেদমতে উপস্থাপন করতে চাই। কিন্তু ঐ সব বিষয় আলোচনা করার পূর্বে সম্মানিত আলেমদের, বিশেষ করে এ প্রদেশের মহান আলেমদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা আলহামদুলিল্লাহ অধ্যয়ন- অধ্যাপনা, আলোচনা, জ্ঞানচর্চা, তাফসীর, বাস্তব পরিস্থিতি বর্ণনা এবং জুমআ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায কায়েম করার গুরুদায়িত্ব নিজেদের কাধে তুলে নিয়েছেন। এ প্রদেশ ঈমানী শক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যদিও গোটা দেশেই আমাদের জনগণ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনুরক্ত, তবে সব কিছুরই কম- বেশি আছে। এ প্রদেশ ঐ সব কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর অধিবাসীরা প্রমাণ করেছেন যে, তারা বিশ্বাসী, নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক। যেখানকার অধিবাসীরা এরকম হবেন সেখানে আলেমগণের ঐশী দায়িত্ব - কর্তব্য পালন করার উপযুক্ত ও সহায়ক ক্ষেত্র বিদ্যমান।

আমি এ সব মহান ব্যক্তি, বিশেষ করে মহান আলেমদের পরিশ্রম ও সাধনার কারণে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা অত্যন্ত মূল্যবান অবদান রেখে চলেছেন। আমি সে সাথে তাদের

প্রতি এ আবেদনও রাখতে চাই যে, বঞ্চিত কোহিকলূয়েহ ও বোয়ের আহমদ প্রদেশের সাংস্কৃতিক পাশ্চাদপদতার অবসান ঘটানোর জন্য আপনাদের অদম্য প্রচেষ্টা ও একাগ্রতা যেন আরো বৃদ্ধি পায়।

পবিত্র মুহররমের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংক্রান্ত দু'ধরনের আলোচ্য বিষয় আছে। একটি হচ্ছে আশুরার আন্দোলন সংক্রান্ত কথা। যদিও মহান আলেমগণ ইমাম হোসাইনের বিপ্লবের দর্শন সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছেন, লিখেছেন এবং এ প্রসঙ্গে অনেক মূল্যবান কথাও বলা হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ দেদীপ্যমান বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে জীবনভর কথা বলা যায়। আশুরা ও ইমাম হোসাইনের বিপ্লব সম্পর্কে আমরা যতই চিন্তা করি না কেনো, তারপরও এ সুমহান বিপ্লব তত বেশি ভিন্ন ভিন্ন পরিমাত্রায় চিন্তা- ভাবনা ও ব্যাখ্যার দাবী রাখে। এ মহান বিপ্লবের ব্যাপারে আমরা যত বেশি চিন্তা করবো ততই নতুন নতুন সারসত্যের সন্ধান পেতে থাকবো।

এটা গেলো প্রথম কথা, যদিও সারাবছর ধরে তা বলা হয় এবং বলা উচিতও বটে; কিন্তু মুহররমের এমন এক বিশেষত্ব রয়েছে যা এ মাসের দিনগুলোতে বেশি বেশি আলোচনা করা উচিত। যেমনটা সবসময় এ ব্যাপারে বলা হয়, ইনশাআল্লাহ আরো বলা হবে।

আরেকটি কথা যা মুহররম উপলক্ষে আলোচিত হওয়ার দাবি রাখে এবং খুব কমই আলোচিত হয়ে থাকে, আর আমিও এ রাতে যে ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই, তা হচ্ছে ইমাম হোসাইন ইবনে আলী (আ.) - এর স্মরণে শোকানুষ্ঠান (আযাদারী) পালন এবং আশুরার পূণ্যস্মৃতিকে পুনজাগরুক করার কল্যাণসমূহ সম্পর্কে।

নিঃসন্দেহে অন্যান্য মুসলিম ভাইয়ের ওপর শিয়া সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, শিয়া সমাজ আশুরার পূণ্যস্মৃতি লালনকারী। যেদিন থেকে ইমাম হোসাইন (আ.) - এর মুসিবত স্মরণের বিষয়টি প্রবর্তিত হয়েছে সেদিন থেকেই আহলে বাইতের ভক্ত ও প্রমিকদের অন্তরে এক আধ্যাত্মিক ও ঐশ্বরিক কৃপার উচ্ছ্বল ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়েছে যা আজ অবধি প্রবহমান রয়েছে এবং ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতেও অব্যাহতভাবে প্রবহমান থাকবে। আর এর উৎসও হচ্ছে আশুরার পূণ্যস্মৃতির স্মরণ।

আশুরার পুণ্যস্মৃতি নিছক একটি স্মৃতির বর্ণনা ও রোমন্থন নয়; বরং তা হচ্ছে এমন এক ঘটনার বর্ণনা যা অগণিত দিক ও মাত্রার অধিকারী। তাই এ পুণ্যস্মৃতির স্মরণ প্রকৃত প্রস্তাবে এমন এক আলোচ্য বিষয় যা অপরিসীম আধ্যাত্মিক আশীষ ও কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। এ কারনেই আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, ইমামদের যুগে ইমাম হোসাইন (আ.) - এর জন্য কাদা ও কাদানোর এক বিশেষ স্থান ও মর্যাদা ছিল। পাছে কেউ ধারণা না করে যে, চিন্তা ও যুক্তি –প্রমাণ থাকতে আবার কান্নাকাটি ও পুরাতন সব আলোচনার প্রয়োজন কি? না জনাব, এটা ভুল। এ সব কিছুরই স্ব স্ব গুরুত্ব আছে। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণে এগুলোর প্রতিটিরই ভূমিকা রয়েছে; আবেগ-অনুভূতির যেমন নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। এমন অনেক সমাস্যা আছে যেগুলো ভক্তি ও ভালোবাসা দ্বারা সমাধান করতে হয়। সেখানে যুক্তি ও প্রমাণ যথেষ্ট নয়। আপনারা যদি পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে দেখতে পাবেন, মহান নবীদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে যখনই তারা (নবুওয়াত সহকারে) উত্থিত হতেন তখন প্রথমে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তাদের চারপাশে জড়ো হতো। কিন্তু তাদের এই ঝুকে পড়ার পেছনে যুক্তি ও প্রমাণ মূল কারণ ছিল না। আপনারা মহানবী (সা.) - এর ইতিহাস- যা একটি লিখিত ও স্পষ্ট জীবনেতিহাস- জানেন যে, উদাহরণস্বরূপ, তিনি কি কোনো যোগ্যতাবান ও প্রতিভাসম্পন্ন কুরাইশদলকে ডেকে বসিয়েছেন এবং যুক্তি - প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন কিংবা বলেছেন যে, এ যুক্তিতে আল্লাহ অস্তিত্বশীল অথবা এ যুক্তিতে আল্লাহ এক-অদ্বিতীয় কিংবা এই যুক্তিতে মুর্তিসমূহ বাতিল। মহানবী (সা.) - এর যুক্তি হলো পরবর্তী সময় সম্পর্কিত। বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি - প্রমাণ সেই সময়ের ব্যাপার যখন আন্দোলন এগিয়ে গিয়েছে। শুরুতে আন্দোলন হল একটি আবেগ ও অনুভূতিগত আচরণ। শুরুতেই মহানবী (সা.) উচৈঃস্বরে ঘোষণা করেন, 'তোমরা তাকিয়ে দেখ এসব মুর্তির দিকে; দেখ, যে এগুলো নিষ্কর্মা।' এ পর্যায়েই তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা ভালো করে দেখ যে, মহান আল্লাহ এক- অদ্বিতীয়। (قولوا لا اله الا الله تفلحون) তোমরা যদি 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই বল, তাহলে সফলকাম হবে'। কোন যুক্তিতে لا اله الا الله (তিনি ব্যতীত আর উপাস্য নেই) সফলকাম হওয়ার কারণ?

কোন বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক যুক্তি - প্রমাণ এখানে রয়েছে ? অবশ্য, প্রত্যেক সত্য আবেগ-অনুভূতির মধ্যেই একটি দার্শনিক প্রমাণও নিহিত থাকে। কিন্তু কথা হলো, নবী যখন তার ধর্ম প্রচার কার্যক্রম করতে চান তখন দার্শনিক যুক্তি উত্থাপন করেন না, সত্য আবেগ ও অনুভূতিই উপস্থাপন করেন। অবশ্য ঐ সত্য আবেগ কোনো যুক্তিবর্জিত ভুল আবেগ নয়। এর নিজের মধ্যে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি লুক্কায়িত থাকে। এই অনুভুতি প্রথমে জনগণকে সমাজে বিরাজমান অন্যায় ও শ্রেণীবৈষম্যের প্রতি আর আল্লাহর শত্রু মনুষ্য শয়তানরা জনগণের ওপর যে চাপ সৃষ্টি করে তার প্রতি সচেতন করে তোলে। অতঃপর যখন বুদ্ধিবৃত্তিক গতিপ্রবাহ লাভ করে এবং স্বাভাবিক গতিপথে প্রবেশ করে তখন বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি- প্রামাণের পালা আসে। যাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সহনীয়তা ও চিন্তার প্রশস্ততা রয়েছে তারাই স্বাভাবিক যুক্তি প্রমাণ অনুধাবন করতে সক্ষম। কেউ কেউ আবার ঐ সাধারণ স্তরেই আটকে যায়। অবশ্য একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, যারা যুক্তি প্রমাণের দিক দিয়ে উচ্চস্তরে রয়েছে, তারা অনিবার্যভাবে আধ্যাত্মিকতারও উচ্চতর পর্যাযে থাকবে। কখনো কখনো যাদের অবস্থান বুদ্ধিবৃত্তির নিম্ন পর্যাযে, তাদের আত্মিক আবেগ-অনুভূতির জোয়ার আর গায়েবী উৎসমূল ও মহানবী (সা.) - এর সাথে তাদের আত্মিক সম্পর্ক ও বন্ধন অপেক্ষাকৃত বেশি এবং তাদের প্রেম- ভক্তিও অত্যধিক প্রবল। আর এরাই আবার আধ্যাত্মিকতার উচ্চতর পর্যায়সমূহ অর্জন করে। ঘটনা এরকমই। আবেগ- অনুভুতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং এর নিজস্ব স্থান রয়েছে। আবেগ- অনুভুতি যেমন যুক্তির স্থান দখল করতে পারেনা, তেমনি যুক্তিও আবেগ- অনুভুতির স্থান দখল করতে পারেনা। আশুরার মহাঘটনা এর নিজস্ব সত্ত্বা ও প্রকৃতির মধ্যে এক সত্য আবেগ- অনুভূতির উত্তাল গর্জনশীল ঝাঞ্ঝাবিক্ষুদ্ধ সমুদ্রের ধারক। একজন মহান পবিত্র জ্যোতির্ময় মানুষ, যার সুমহান স্বর্গীয় ব্যক্তিত্বের মাঝে বিন্দুমাত্র সন্দেহ- সংশয়ের অবকাশ নেই, যে সুমহান লক্ষ্যের সত্যতার ব্যাপারে বিশ্বের সকল ন্যায়বান ব্যক্তিই একমত অর্থাৎ, যুদ্ধ অন্যায়, অত্যাচার ও সীমালজ্ঘনের হাত থেকে মানব সমাজকে উদ্ধার করা ও মুক্তি দেয়া, সেই লক্ষ্যের জন্য তিনি দৃঢ়ভাবে অভ্যুত্থান করেন।

হে জনগণ ! মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি একজন অত্যাচারী শাসন কর্তাকে দেখবে’. . . কথা এ ব্যাপারেই। ইমাম হোসাইন (আ.) অন্যায়ের মোকাবিলা করাটাকে তার আন্দোলনের দর্শন হিসাবে দাঁড় করেছিলেন। ‘যে আল্লাহর বান্দাদের মাঝে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন করে অথবা পাপাচার ও শত্রুতা মূলক কার্যকলাপ করে বেড়ায়’- আলোচনা এ বিষয়কে নিয়েই। ঐ ধরনের একজন মানুষ একটি পবিত্রতম মহান লক্ষ্যের পথে যা বিশ্বের সকলা ন্যায়বান স্বীকার করে থাকেন, সবচেয়ে কঠিন সংগ্রামের কষ্ট সহ্য করেন। সবচেয়ে কঠিন সংগ্রাম হচ্ছে নিঃসঙ্গ ও প্রবাসী অবস্থায় সংগ্রাম। বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীদের হৈ হুল্লোড়ও আর সর্ব সাধারণের প্রশংসা, করতালির মাঝে নিহত হওয়া তো তেমন কঠিন কিছু নয়। যখন সত্য ও মিথ্যার দুই পক্ষ মুখোমুখি হয় আর মহানবী (সা.) ও আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) - এর মতো কোনো ব্যক্তি সত্যপন্থী দলের নেতৃত্বে থাকেন এবং বলেন : ‘কে ময়দানে যেতে প্রস্তুত’, তখন তো সবাই যাবে।’ মহানবী (সা.) যারা যুদ্ধের ময়দানে যাচ্ছে তাদের জন্য দোয়া করেন। তাদের মাথায় (আশীর্বাদের) হাত বুলিয়ে দেন এবং বিদায় জানান। মুসলমানরাও তাদের জন্য দোয়া করে। এরপর তারা ময়দানে যায়, জিহাদ করে এবং শহীদ হয়। এটা হচ্ছে একধরনের নিহত হওয়া ও একধরনের জিহাদ। আরও একধরনের জিহাদ আছে যখন মানুষ যুদ্ধের ময়দানে গমন করে, অথচ পুরো সমাজই তাকে অস্বীকার করে অথবা তার ব্যাপারে উদাসীন (গাফেল) ও অমনোযোগী অথবা তার থেকে দূরে থাকে অথবা তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। যারা তাকে অন্তরে অন্তরে প্রশংসা ও স্তুতি জানায় তাদের সংখ্যা ও কম, তারা এমনকি মুখেও তাদের প্রশংসা জানানোর সাহস পায়না। অর্থাৎ ইমাম হোসাইন (আ.) - এর কারবালায় শাহাদাত বরণের ঘটনায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের মতো যারা বনী হাশেম বংশীয় এবং এ পবিত্র বৃক্ষেরই শাখা- তারাও মক্কা অথবা মদীনায় দাড়িয়ে ফরিয়াদ করতে ও ইমাম হোসাইনের নামে স্লোগান দেয়ার সাহস পান না।

এটাই হল নিঃসঙ্গ ও প্রবাসী অবস্থায় সংগ্রাম। সবচেয়ে কঠিন সংগ্রামই হচ্ছে এ ধরণের সংগ্রাম। সবাই শত্রু, সবাই তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এমনকি বন্ধুরাও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নয়

এমনভাবে যে, যখন ইমাম হোসাইন (আ.) একজনকে বলেন, 'এসো আমাকে সাহায্য কর!' তখন সে সাহায্যের বদলে নিজের ঘোড়াটি সামনে এগিয়ে দিয়ে বলে : 'ধরুন, আমার এ ঘোড়া ব্যবহার করুন'। এর চেয়ে বড় নিঃসঙ্গতা এবং এর চেয়ে পরবাসী অবস্থায় সংগ্রাম আর আছে কি? এমতাবস্থায় এই নিঃসঙ্গ অবস্থার সংগ্রামে তার সবচেয়ে প্রিয়জনরা তার চোখের সামনের কুরবানি হচ্ছে। তার পুত্রগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভ্রাতৃবৃন্দ, চাচাত ভাইরা। বনী হাশেমের ফুলগুলো তার সামনে ছিড়ে ছিড়ে ঝরে পড়ছে, এমনকি তার ছয় মাসের শিশু পুত্রও নিহত হচ্ছে। অধিকিন্তু তিনি জানেন যে, তার পবিত্র দেহ থেকে প্রাণ বের হওয়া মাত্রই তার নিরাশ্রয় নিরস্ত্র পরিবার-পরিজন আক্রমণের শিকার হবে।

এ সব ক্ষুধার্ত নেকড়ে কিশোরী ও তরুণীদের চারপাশে হানা দেবে, তাদের অন্তরকে ভীতসন্ত্রস্ত করবে, তাদের ধন-সম্পদ লুটপাট করবে, তাদেরকে বন্দি করবে, তাদের প্রতি অবমাননা করবে, আর হযরত আমীরুল মুমিনীনের মহীয়ষী কন্যা হযরত যায়নাবে কুবরা যিনি ইসলামী বিশ্বের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তার সামনে চরম স্পর্ধা প্রদর্শন করবে। আবু আবদিল্লাহ (আ.) এসব কিছুই জানেন। ভেবে দেখুন যে, এ সংগ্রাম কতটা কঠিন! এসব কিছু ছাড়াও তিনি নিজে এবং তার পরিবার-পরিজন সকলেই তৃষ্ণার্ত; ছোট ছোট শিশু, ছোট ছোট মেয়ে, বয়স্ক, দুগ্ধপোষ্য শিশু সকলেই তৃষ্ণার্ত। এখন সঠিকভাবে কল্পনা করুন যে, এ সংগ্রাম কতখানি কঠিন! এরকম সুমহান, পবিত্র এবং জ্যোতির্ময় ব্যক্তি, যার উজ্জ্বল প্রতিভাস এক ঝলক দেখার জন্য আকাশের ফেরেশতাগণ পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন যে, হোসাইন ইবনে আলী (আ.) –কে দেখবেন এবং তার কাছ থেকে আশীষ গ্রহণ করবেন, মহান নবী ও ওয়ালিগণ তার মাকাম লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, এ ধরণের এত কঠিন ও কষ্টকর সংগ্রামে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। কোন মানুষ রয়েছে যার আবেগ-অনুভূতি এ ঘটনায় দুঃখভারাক্রান্ত না হয়? কোন মানুষ রয়েছে যে এ ঘটনা অনুধাবন করে অথচ এ ঘটনার প্রতি তার হৃদয় আপ্লুত হয় না? এ হল প্রবলবেগী প্রবহমান ঝরনাধারা যা আশুরার দিন থেকে উৎসারিত হয়েছে। সেই সময় থেকে যখন

যায়নাবে কুবরা (আ.) একটি রেওয়ায়েত অনুসারে, কারবালাস্থ যায়নাবীয়াহ টিলার চূড়ায় উঠে মহানবী (সা.) - কে সম্বোধন করে বলে ছিলেন :

يا رسول الله! صلى عليك ملائكته السماء. هذا حسينك مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مصلوب العمامة و الرداء

'হে রাসূলুল্লাহ (সা.) ! আপনার ওপর আকাশের ফেরেশতাগণের দরুদ, এ হলো আপনার হোসাইন, রক্তরঞ্জিত- কর্তিত অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ, লুণ্ঠিত পাগড়ি ও বস্ত্র' তখন থেকেই তিনি ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোকগাথা পড়তে এবং এ ঘটনা উঃচৈস্বরে বলতে শুরু করেন। যে ঘটনাকে গোপন রাখতে চাওয়া হয়েছিল।

তিনি উঃচৈস্বরে ফরিয়াদ করে বলেন, কারবালায় বলেন, কুফায় বলেন, শামে বলেন, মদীনায় বলেন। (তখন থেকেই) এই ঝরনাধারার উদগীরণ হতে শুরু করেছে যা আজও উদগীরণ হচ্ছে। এ হলো আশুরার ঘটনা। যে ব্যক্তি কোনো নেয়ামত পায়নি তাকে উক্ত নেয়ামতের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা হয়না; কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি একটি নেয়ামত প্রাপ্ত হয় তখন তাকে ঐ নেয়ামতের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। এরকম একটি মহান নেয়ামত হলো হোসাইন ইবনে আলী (আ.) - এর পুন্যস্মৃতি স্মরণের নেয়ামত অর্থাৎ শোকানুষ্ঠানের নেয়ামত, মুহররমের নেয়ামত ও আশুরার নেয়ামত যা আমাদের শিয়া সমাজ পেয়েছে। দুঃখজনক হলে ও সত্য যে, আমাদের অ-শিয়া মুসলিম ভাইরা এ নেয়ামত থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত রেখেছেন। তারাও নিজেদেরকে এ মহান নেয়ামতের দ্বারা সমৃদ্ধ করতে পারেন। অবশ্য তাদের মধ্যে কেউ কেউ দেশের আনাচে-কানাচে হযরত আবা আবদিল্লাহ (আ.) - এর জন্য শোক পালন করে থাকেন। তবে প্রচলিত নয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রচলিত। এসব অনুষ্ঠান ও পুণ্যস্মৃতির কিভাবে সদ্ব্যবহার করা উচিত ? কীভাবে এ নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো যায়? এটা এমন এক বিষয় যা আমি প্রশ্নাকারে উত্থাপন করতে চাচ্ছি এবং আপনারা এর জবাব দেবেন। এ সুমহান নেয়ামতসমূহকে ইসলামী বিশ্বাসের প্রবল জোশ ও উদ্যমের উৎসধারার সাথে সংযুক্ত করে দেয়। এ নেয়ামত এমন একটি কাজ করেছে যার ফলে ইতিহাসকাল জুড়ে কর্তৃত্বকারী অত্যাচারীরা আশুরা ও ইমাম হোসাইন

(আ.) - এর মাযারকে ভয় পেয়ে এসেছে। এ ভয় উমাইয়্যা বংশীয় খলীফাদের সময় থেকে শুরু হয়েছে এবং তা আজও অব্যাহত রয়েছে। আর আপনারা এর একটি নমুনা স্বয়ং আমাদের বিপ্লবের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছেন। যখন মুহররম মাস এসেছে তখনই প্রতিক্রিয়াশীল কাফির, ফাসিক ও ফাসেদ পাহলভী সরকার দেখতে পেয়েছে যে, তাদের হাত- পা বাধা পড়ে গেছে, কিছুই করতে সক্ষম নয়। তারা বুঝতে পারত যে, মুহররম এসে গেছে। ঐ অশুভ সরকারের থেকে উদ্ধারকৃত রীপোর্ট ও নথিপত্র সমূহে এমন বেশ কিছু ইঙ্গিত বরং স্পষ্ট ভাষ্য পাওয়া যায় যা প্রতিপন্ন করে যে, মুহররম আসার সাথে সাথে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ত। আর আমাদের মহান নেতা ইমাম খোমেইনী (রহ.) যিনি ছিলেন সুক্ষ্মদর্শী, চলমান বিশ্ব- পরিস্থিতি এবং মানব বিশারদ, তিনি খুব ভালোভাবেই বুঝেছিলেন যে, ইমাম হোসাইন (আ.) - এর লক্ষ্যও উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কীভাবে এ ঘটনার সদ্ব্যবহার করতে হবে, আর সেটাই তিনি করেছেন। তিনি পবিত্র মুহররমকে 'তরবারির ওপর রক্তের বিজয়ের মাস' হিসাবে ঘোষণা করেন এবং এই বিশ্লেষণ ও যুক্তি এবং মুহররমের কল্যাণের দ্বারাই তিনি রক্তকে তরবারির ওপর বিজয়ী করেন। এটা হচ্ছে একটি বাস্তব উদাহরণ যা আপনারা দেখেছেন।

এ নেয়ামতের অবশ্যই সদ্ব্যবহার করা উচিত। যেমন জনগণের উচিত এ নেয়ামতের সদ্ব্যবহার করা ঠিক তেমনি আলেমদেরও উচিত এর সদ্ব্যবহার করা। জনগণ এর সদ্ব্যবহার করবে শোক মজলিসসমূহের সাথে মনে- প্রাণে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে আর শোকানুষ্ঠান আয়োজন করার মাধ্যমে। জনগণ সমাজের বিভিন্ন স্তরে যত বেশি সম্ভব শোকানুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে। এ সব শোকসভা ও অনুষ্ঠানে নিষ্ঠাসহকারে তারা অংশ গ্রহণ করবে। তবে তারা এ সব শোকানুষ্ঠান থেকে সঠিক আধ্যাত্মিক উপকার নেয়ার উদ্দেশ্যেই অংশগ্রহণ করবে। যেন নিছক সময় কাটানো বা সাদামাটাভাবে পারলৌকিক সওয়াব অর্জনের জন্য না হয় যে জানেও না এই পারলৌকিক পুণ্য কোথা থেকে আসবে? নিঃসন্দেহে এ সব শোকানুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার পারলৌকিক সওয়াব রয়েছে। কিন্তু এসব মজলিসের সওয়াব কোন কারণে, সে দিকটি কি? এই সওয়াব অবশ্যই এমন এক দিকের কারণে যে, যদি শোকানুষ্ঠানে ঐ দিকটা না থাকে তাহলে

সওয়াবও থাকবে না। কেউ কেউ এ দিকটার প্রতি মনোযোগী নয়। জনগণের উচিত এসব মজলিসে অংশ গ্রহণ করা, এর গুরুত্ব অনুধাবন এবং এ থেকে যথাযথ উপকার লাভ করা। জনগণের উচিত এ শোকানুষ্ঠানের মজলিসগুলোকে হোসাইন ইবনে আলী (আ.), মহানবীর পবিত্র আহলে বাইত, ইসলামের মূল সারবত্তা ও পবিত্র কুরআনের সাথে তাদের নিজেদের আত্মিক ও আন্তরিক সম্পর্ক ও বন্ধনকে যত দৃঢ় ও মজবুত করা সম্ভব ততখানি দৃঢ় করার মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা। পক্ষান্তরে, যে বিষয়টা শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট তা আরো কঠিন। কারণ, শোকসভাগুলো এভাবে রূপ লাভ করে যে, একদল লোক সমবেত হবে। আর একজন আলেম উক্ত মজলিসে উপস্থিত হয়ে মূল শোকানুষ্ঠান বা আযাদারী উপস্থাপন করবেন যাতে অন্যরা তা থেকে উপকৃত হয়। আপনারা কীভাবে আযাদারী অনুষ্ঠান করবেন ? আমার এ প্রশ্ন তাদের সকলের কাছে যারা এ ব্যাপারে কর্তব্য অনুভব করে থাকেন। আমি বিশ্বাস করি, এসব শোকানুষ্ঠানে তিনটি বিষয় থাকা বাঞ্ছনীয় :

প্রথমত এসব শোকানুষ্ঠান যেন মহান আহলে বাইত (আ.) - এর প্রতি ভক্তি - ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। কারণ, আবেগগত সম্পর্ক এক অতি মূল্যবান সম্পর্ক। তাই আপনাদের এমন কাজ করা উচিত যাতে এ সব শোক মজলিসে অংশ গ্রহণকারীদের ইমাম হোসাইন (আ.) এবং মহানবীর পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা এবং ঐশ্বরিক মারেফাত দিন দিন বৃদ্ধি পায়। আপনারা যদি, খোদা না করুন, এ সব শোক মজলিসে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেন যার ফলে এ মজলিসের শ্রোতা অথবা এ মজলিসের বাইরে যে রয়েছে সে আবেগের দিক থেকে আহলে বাইতের নিকটবর্তী না হয় এবং খোদা না করুন, সে তাদের থেকে দূরে সরে যায় এবং সে যদি দুরত্ব ও বিরক্তি অনুভব করে তাহলে তখন শোক পালনের মজলিস শুধু যে এর সবচেয়ে বড় উপকারিতাকে তো হারাবে তা নয়; বরং তা অন্য অর্থে অপকারী ও ক্ষতিকারকও হয়ে দাঁড়াবে।

এখন আপনারা যারা শোক মজলিসের আয়োজক ও বক্তা, আপনাদের ভেবে দেখতে হবে যে, কী করা উচিত যাতে ইমাম হোসাইন (আ.) ও মহানবী (সা.) - এর আহলে বাইতের প্রতি জনগণের আবেগ- অনুভূতি এ সব শোক মজলিসে উপস্থিত হওয়ার কারণে দিন দিন বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, এ সব শোক মজলিসে আশুরার মূল ঘটনার ব্যাপারে অবশ্যই যেন জনগণের জন্য একটি স্বচ্ছ ও স্পষ্টতর পরিচিতি জন্মায়। এমন যেন না হয় যে, আমরা (আলেমগণ) ইমাম হোসাইন (আ.) - এর শোকানুষ্ঠানে এসে একটি বক্তৃতা দেব অথবা মিম্বরে উঠব এমনভাবে যে এ শোক মজলিসে যদি একজন চিন্তাশীল ও ধীসম্পন্ন ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন - আর আমাদের সমাজে বর্তমানে এরূপ চিন্তাশীল ব্যক্তি অনেক রয়েছেন ইসলামী বিপ্লবেরই কল্যাণে, তিনি নিজে নিজে চিন্তা করবেন যে, আমরা কিসের জন্য এখানে এসেছি এবং আসল ঘটনাটি বা কী? কেন ইমাম হোসাইন (আ.) - এর জন্য ক্রন্দন করা উচিত! আসলে কেনই বা ইমাম হোসাইন (আ.) কারবালায় আগমন করলেন এবং আশুরার শোকাবহ ঘটনার সৃষ্টি করলেন? এমনভাবে হতে হবে যে, কোনো ব্যক্তির মনে যদি এ ধরণের প্রশ্নের উদয় হয় তাহলে আপনারা এর জবাব দিতে থাকেন। অতএব, আপনারা যে শোকগাথা বর্ণনা করে থাকেন অথবা যে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং যে সব বিষয় বয়ান করেন সেগুলোতে যদি এই অর্থে কোনো নির্দেশনা, এমনকি কোনো ইঙ্গিত না থাকে তাহলে শোকানুষ্ঠানের যে তিন মূল স্তম্ভের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর একটির ঘাটতি দেখা দেবে এবং তা হয়তো কাঙ্ক্ষিত উপকারিতা আর দিতে পারবে না। এমনকি খোদা না করুন কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা দ্বারা অপকারও সাধিত হতে পারে।

তৃতীয় যে বিষয়টি এসব শোক মজলিসের জন্য অত্যাবশ্যক তাহলো এগুলো যেন জনগণের ধর্মীয় জ্ঞান ও বিশ্বাসের বৃদ্ধি ঘটায়। আপনারা এ শোক মজলিসে ধর্মসংক্রান্ত এমন একটা কিছু বলবেন যা ঈমান ও জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ হয়। একটি সদুপদেশ, একটি বিশুদ্ধ হাদীস, একটি সঠিক ইতিহাসের শিক্ষণীয় অংশ, পবিত্র কুরআনের কোনো একটি আয়াতের ব্যাখ্যা, ইসলামের কোনো বুযুর্গ আলেম ও পণ্ডিতের থেকে একটি বিষয়ের বর্ণনা – এগুলো হচ্ছে এমন সব বিষয় যা বর্ণিত হতে পারে। এমন যেন না হয় যে, আমরা মিম্বরে শুধু বকবক করলাম অথবা যদি কোন বিষয়ে আলোচনা করলামও বটে কিন্তু সেটা একটা দুর্বল বিষয়, যা ঈমানকে তো বৃদ্ধি করেই না বরং দুর্বল করে দেয়।

আমাকে অবশ্যই আপনাদের কাছে বলতে হবে যে, দুঃখজনক ভাবে কখনো কখনো দেখা যায় এ ধরনের ব্যাপার রয়েছে। কখনো কখনো দেখা যায় যে, শোক মজলিসে বক্তা এমন বিষয় বর্ণনা করেন যা যুক্তির দিক থেকে এবং বুদ্ধিগত ও বর্ণনাগত সনদ- প্রমাণের আলোকে দুর্বল। আবার একজন বিচক্ষণ শ্রোতা ও যুক্তিবাদীর চিন্তা- চেতনায় ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। কিছু কিছু জিনিস কোনো একটি পুস্তকে লেখা হয়েছে এবং এগুলো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হওয়ার কোনো প্রমাণও আমাদের কাছে নেই। হতে পারে তা সত্য, আবার হতে পারে মিথ্যা। এগুলোর মিথ্যা হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু আপনারা যখন ঐ বিষয় বর্ণনা করবেন আর আপনাদেরো শ্রোতা- যে হতে পারে একজন যুবক, একজন শিক্ষার্থী, ধর্মতত্ত্বের একজন ছাত্র, একজন যোদ্ধা ও একজন বিপ্লবী- আল হামদুল্লিাহ, অবশ্য বিপ্লব জনগণের মন ও মানসিকতাকে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করেছে, সে যখন তা আপনাদের কাছ থেকে শুনবে তখন ধর্মের ব্যাপারে তার প্রশ্ন, সংশয় ও ক্ষোভের সৃষ্টি হতে পারে। তার এ ধরণের কথা বলা উচিত নয়। এমন কি যদি এ বিষয়ের সঠিক সনদ- প্রমাণও বিদ্যমান থাকতো, কিন্তু যেহেতু তা পথভ্রষ্টতা ও বিচ্যুতির কারণ, কাজেই তা বলা উচিত নয়। আর যখন এগুলোর বেশিরভাগেই সঠিক সনদই নেই তখন তো আর কথাই নেই। এ ব্যক্তি কারও কাছ থেকে কিছু একটা শুনেছে। একজন বর্ণনা করেছে যে, 'আমি অমুক স্থানে ছিলাম এবং অমুক সফরে অমুক ঘটনা ঘটে ছিল।' বা প্রমাণ সহকারে অথবা বিনা প্রমাণে একটি বিষয় বলল আর শ্রোতাও তা বিশ্বাস করে নিল। ঘটনাচক্রে ঐ শ্রোতা উক্ত ঘটনার কথা পুস্তকে লিখেও ফেলল যা কোনো এক কোণায় পড়ে আছে। কেন আপনাকে বা আমাকে তা বলতে হবে যেগুলো কোন বৃহত্তর সমাবেশে এবং সূক্ষ্মবিচারী ও সচেতন মানুষের সামনে ব্যাখ্যা করা যায় না? যেখানেই যা কিছু লেখা রয়েছে সেটাই কি বলতে হবে ? আজ আমাদের সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, আমরা বিপ্লবের আগে বলতাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকরা, কিন্তু আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যুবকদের জন্য বিশেষভাবে নয় বরং তারা ছাড়া ও আমাদের সমাজে নারী - পুরুষ, ছেলে- মেয়ে সকলেরই মন- মানসিকতা উন্মুক্ত; তারা ব্যাপারগুলোকে বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে দেখে, বুঝতে চায়। এরা সংশয়ের মধ্যে পড়বে। এটা হচ্ছে আমাদের যুগে

একটি সাংস্কৃতিক বাস্তবতা। শত্রুরা নয়, বরং আমার ও আপনার চিন্তাকে অস্বীকারকারীরা সংশয় ছড়ায়।

কেন, এটা কি বলা যায় না কি যে, যে ব্যক্তি আমাদের চিন্তাকে মেনে নেয় না, সে বোবা হয়ে যাক, কথা না বলুক, কোন সংশয়ের সৃষ্টি না করুক? তারা সংশয়ের জন্ম দেয়, কথা বলে, (বিভিন্ন) বিষয় ছড়ায় এবং দোদুল্যমানতা ও দ্বিধার সৃষ্টি করে। এ কারনে আপনারা যা বলবেন তা যেন সংশয়ের অবসান ঘটায়- সংশয়কে বৃদ্ধি না করে। অনেকে এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের দিকে বিন্দু মাত্র ভ্রুক্ষেপ না করেই মিম্বরে বসে এমন বক্তব্য প্রদান করে যা শ্রোতার মন- মগজ থেকে জঠিলতা তো দূর করেই না, বরং শ্রোতার মনে তা আরো জট পাকিয়ে দেয়। আসুন দেখা যাক, যদি আমরা মিম্বরে বসে এমন কোন একটি কথা বললাম যে দশ- পাঁচ জন, এমনকি একজন যুবকও দীনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়লো তারপর চলে গেল, আর আমরা তাকে চিনলামও না; এমতাবস্থায় কীভাবে এ ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব? আসলে কি এ ক্ষতি পূরণ করা যায়? আল্লাহ কি আমাদেরকে ক্ষমা করবেন ? ব্যাপারটা খুবই কঠিন।

অতএব, বক্তৃতায় অবশ্যই উপরিউক্ত তিনটি বিষয় থাকতে হবে। প্রথমত ইমাম হোসাইন (আ.), মহানবী (সা.) ও তার আহলে বাইতের প্রতি ভক্তিপূর্ণ আবেগকে বৃদ্ধি করবে এবং আত্মিক- আবেগপূর্ণ সম্পর্ক ও বন্ধনকে দৃঢ়তর করবে। দ্বিতীয়ত শ্রোতাকে আশুরার এ সুমহান ঘটনা সম্পর্কে উজ্জ্বলতর ও স্পষ্টতর দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করবে এবং তৃতীয়ত ধর্ম বিষয়ে জ্ঞানও বৃদ্ধি করবে আর ঈমানও সৃষ্টি করবে।

এখন আমরা এ কথা বলছি না যে, সকল বক্তৃতায় অবশ্যই সবকিছু থাকতে হবে। আপনারা যদি একটি সহীহ হাদীস কোনো একটি নির্ভর যোগ্য গ্রন্থ থেকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেন তাহলে তা কার্যকর প্রভাব রাখতে পারে। কখনো কখনো একটি হাদীসকে এতটা অতিরঞ্জিত আকারে বর্ণনা করা হয় যে, এর আসল অর্থ আর বজায় থাকে না। আপনারা যদি এই একটি হাদীসকেই সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেন তাহলেই হয়তো বা আমরা যা চাচ্ছি তার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ এ ব্যাখ্যার মধ্যে এসে যেতে পারে। আপনারা যদি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত কোন

নির্ভরযোগ্য তাফসীরের ভিত্তিতে এবং গভীর চিন্তা ও অধ্যয়ন সহকারে বর্ণনা করেন তাহলেই লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যাবে। কারবালার বিপদ ও শোককথা স্মরণ করার জন্য মরহুম মুহাদ্দিস কোমীর "নাফাসুল মাহমূম" গ্রন্থটি খুলে দেখে দেখে পড়বেন। দেখতে পাবেন যে, শ্রোতার জন্য ক্রন্দনের উদ্রেককারী এবং প্রবল হৃদয়াবেগ ও অনুভূতি সৃষ্টি করবে। কি প্রয়োজন রয়েছে যে, আমরা আমাদের খেয়াল ও কল্পনায় শোক মজলিসকে সজ্জিত করার মানসে এমন কোনো কাজ করবো যার ফলে শোক- মজলিস তার প্রকৃত দর্শন থেকে দূরে সরে যাবে ? আমি আসলেই আশংকা করছি যে, পাছে খোদা না করুন, বর্তমান যুগ সন্ধিক্ষণটি- যা হচ্ছে ইসলাম ধর্মের এবং আহলে বাইতের চিন্তা ও মতাদর্শের রেনেসা, আবির্ভাব, বিকাশ ও প্রসারের যুগ, এ যুগে আমাদের সঠিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে না পারি। এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো মানুষকে আল্লাহ ও দীনের নিকটবর্তী করে। এই ট্রাডিশনাল (বা ঐতিহ্যবাহী) শোক পালন জনগণকে দীনের নিকটবর্তী করে। ইমাম খোমেইনী (রহ.) বলেছেন, 'আপনারা সবার ঐতিহ্যগত শোকানুষ্ঠান পালন করবেন।' শোক মজলিসে বসা, শোককথা বর্ণনা করা, ক্রন্দন করা, মাথা ও বুক চাপড়ানো, শোক মিছিল বের করা ইত্যাদি হচ্ছে সেসব বিষয় যেগুলো মহানবী (সা.) - এর পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি আবেগ উথলে দেয়, যা অত্যন্ত ভালো। আবার এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো বিপরীতক্রমে কোন কোন মানুষকে দীনবিমুখ করে দেয়। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, একথা বলতে হচ্ছে, সাম্প্রতিক এ তিন –চার বছরে বেশ কিছু কাজ যা আমার দৃষ্টিতে কোন অশুভ মহল আমাদের সমাজে প্রচলন ঘটাচ্ছে, সেগুলো এমনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে যে, যে কেউ সেগুলো দেখবে তার মনে প্রশ্ন দেখা দেবে।

আগেকার দিনে সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচলন ছিল যে শোকের দিনগুলোতে নিজেদের দেহে তালা লাগাতো। বিজ্ঞ আলেমগণ একাজের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন এবং তা বন্ধ হয়ে যায়। এখন পুনরায় এ কাজ শুরু হয়েছে এবং আমি শুনেছি যে, দেশের (ইরান) আনাচে- কানাচে কেউ কেউ দেহে তালা লাগাচ্ছে। এটা কোন ধরনের কাজ যা কেউ কেউ করছে ? কামা মারাও ঠিক এমনই। কামা মারাও শরীয়তবিরোধী কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত। আমি জানি যে, এখন একদল

বলবে, 'অমুকে যদি কামা মারার কথা না তুলতেন তাহলে ঠিক হতো। আপনার এতে কাজ কী? মারতে দিন।' না জনাব! তা হয় না। এভাবে যে সম্প্রতি এই চার- পাঁচ বছরে এবং (ইরান- ইরাক) যুদ্ধের পর কামা মারার বিষয়টির প্রচলন করে ফেলছে, যদি ইমাম খোমেইনী (রহ.)- এর জীবদ্দশায়ও এমনটা হতো তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি ও এ কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন (উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তাকবীর ধ্বনি)।

এটা একটা গর্হিত কাজ যে, একদল কামা নিয়ে নিজেদের মাথায় আঘাত করবে এবং রক্ত ঝরাবে। এ কাজের অর্থ কী ? কোথায় এ কাজ শোক ও আযাদারীর তাৎপর্য বহন করে ? মাথায় কামা মারা কি আযাদারী পালন ? যদি আপনারা লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, যাদের ওপর কোন শোক নেমে আসে তারা নিজেদের মাথা ও বুক চাপড়ায়। এটাই (হলো) আযাদারী। এটা হলো প্রচলিত শোক পালন। আপনারা কোথায় দেখেছেন যে, কোনো ব্যক্তি তার প্রিয় থেকে ও প্রিয়জনের মৃত্যুতে তরবারি দিয়ে নিজ মস্তিষ্কে আঘাত করবে এবং নিজের মাথা থেকে রক্ত ঝরাবে? এ কাজ কীভাবে আযাদারী হয়? এটা আসলে বানোয়াট। এগুলো হচ্ছে এমন বিষয় যেগুলো ধর্ম- বহির্ভূত। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ এ সব কাজে সন্তুষ্ট নন। অগ্রবর্তী আলেমবর্গ নিরুপায় ছিলেন বিধায় তারা এসব কথা বলতে পারতেন না। কিন্তু আজ ইসলামের সার্বভৌমত্ব ও প্রকাশ্য বিজয়ের দিন। আমাদের এমন কোনো কাজ করা উচিত নয় যার ফলে শ্রেষ্ঠ ইসলামী সমাজ যামানার নেতা ইমাম মাহদী (আ.) [আমাদের প্রাণ তার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক]- এর নামে, ইমাম হোসাইন (আ.)- এর নামে এবং হযরত আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর পবিত্র নামের বরকতে গৌরবান্বিত, তারা বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ এবং অমুসলমানদের দৃষ্টিতে একদল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বিবেক- বুদ্ধিবর্জিত জনগোষ্ঠী বলে গণ্য হন। আমি সত্যিকারে যতই ভেবে দেখেছি ততই উপলদ্ধি করেছি যে, এ বিষয়টি, যা নির্ঘাত একটি শরীয়তবিরোধী কাজ ও বিদআত তা আমাদের প্রিয়জনগণের গোচরীভূত না করে পারি না। এ কাজ করবেন না। আমি অবশ্যই এসব কাজে সন্তুষ্ট নই।

কেউ যদি প্রকাশ্যে কামা মারে তাহলে আমি আন্তরিকভাবে তার প্রতি অসন্তুষ্ট (হব)। এটা আমি নিবেদেন করছি এজন্য যে, একসময় দেশের আনাচে- কানাচে কিছু লোক জড়ো হতো, এ সব কাজ করত। আনাচে কানাচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; কারো চোখের সামনে ছিল না। অর্থাৎ এতদার্থে তা প্রকাশ্যে করা হতো না। এ কারনে, তাদের সাথে কারো কাজ ও ছিল না। এখন সেটা ভালো হোক আর মন্দ হোক। মোটকথা একটি ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখন ঠিক করা হয় যে, কয়েক হাজার লোক হঠাৎ করে তেহরান, কোম, আযারবাইজান বা খোরাসানের মতো শহরগুলোর রাজপথে বের হয়ো প্রকাশ্যে মাথায় কামা দিয়ে আঘাত করবে, তখন এটা অবশ্যই শরীয়ত বিরোধী কাজ হবে। ইমাম হোসাইন (আ.) এ ধরণের শোক পালনে সন্তুষ্ট নন। আমি জানি না যে, কোথা থেকে এ কাজগুলোর উৎপত্তি। আর কোন কোন অভিরুচি এ সব কাজকে আমাদের ইসলামী ও বিপ্লবী সমাজে আমদানি করছে।

সাম্প্রতিককালে যিয়ারত করার ক্ষেত্রেও এক অদ্ভুত ও অভূতপূর্ব এবং বিদঘুটে ধরনের বিদআতের প্রচলন করা হয়েছে। আপনারা লক্ষ্য করুন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও নিষ্পাপ ইমামদের পবিত্র কবর সকলে যিয়ারত করতেন। মহানবী ও ইমাম হোসাইন (আ.) - এর পবিত্র কবর আমাদের ইমামগণ অর্থাৎ ইমাম সাদেক (আ.), ইমাম মূসা ইবনে জাফর (আ.) এবং অন্য সকল ইমাম যিয়ারত করতেন। ইরান ও ইরাকে অবস্থিত আহলে বাইতের পবিত্র কবর সহ আমাদের বড় বড় আলেম ও ফকীহবৃন্দ যিয়ারত করতেন। আপনারা কি কখনও শুনেছেন যে, কোনো আলেম ও ইমাম (আ.) যখন যিয়ারত করতে চাইতেন তখন তারা মাযার প্রাঙ্গণের দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সময় মাটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে বুক ঘষে ঘষে ইমামদের হারামে পৌছতেন ? যদি এ কাজ মুস্তাহাব, প্রশংসনীয় ও গ্রহণযোগ্য হতো তাহলে আমাদের মহান সম্মানিত আলেমগণ একাজ করতেন। কিন্তু তারা তা করেননি। এমনকি বর্ণিত আছে যে, মরহুম আয়াতুল্লাহ আল উযমা বুরুজারদী (রহ.) এত বড় একজন শক্তিমান আলেম, জ্ঞান গভীর ও বুদ্ধিদীপ্ত মুজতাহিদ হয়েও মাযারের চৌকাঠ (মাযারের দরজার চৌকাঠের মাঝের অংশ) চুম্বন করতে নিষেধ করতেন, অথচ এ কাজ হয়তো মুস্তাহাবও হতে পারে। সম্ভবত রেওয়ায়েতে

চৌকাঠ চুম্বন করার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। দোয়ার বই- পুস্তকে রয়েছে। আর আমার মনে পড়ছে যে, রেওয়ায়েতেও রয়েছে চৌকাঠকে চুম্বন করবে। যদিও এটি একটি মুস্তাহাব কাজ, তবু তিনি বলতেন, 'এ কাজ করো না। পাছে অন্যেরা হয়তো ধারণা করবে যে, আমরা ইমামদের পবিত্র কবর সমূহের ওপর সিজদা করি, এভাবে আবার শিয়া মাযহাবের শত্রুরা কোন সন্দেহ –সংশয় সৃষ্টি না করে।' এখন আবার একদল যখন ইমাম আলী ইবনে মূসা আর রেযা (আ.) - এর পবিত্র মাযার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে তখন উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে এবং ২০০ মিটার পথ বুকে ঘষে অতিক্রম করে। এ কাজটা কি ঠিক? না, এ কাজ ভুল এবং ধর্ম ও যিয়ারতের জন্য অবমাননাকর। কে এ সব কাজ জনগণের মধ্যে প্রচলন করছে? এ সব কাজ না আবার শত্রুদের কারসাজি (হয়) ? অবশ্যই জনগণকে এসব কথা বলবেন এবং তাদের মন- মানসিকতাকে আলোকিত করবেন।

ধর্ম ও ইসলাম হলো যুক্তিপূর্ণ। আর ইসলামের সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ অংশ হলো ঐ ব্যাখ্যা যা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে শিয়া মাযহাবের রয়েছে। শিয়া কালামশাস্ত্রবিদগণের প্রত্যেকেই স্ব স্ব্ যুগে কিরণময় সূর্যসম ছিলেন। কেউ বলতে পারত না যে, আপনাদে যুক্তি দুর্বল। কি ইমামদের যুগে যেমন 'মুমিন- ই তাক' ও 'হিশাম ইবনে হাকামে'র মতো ব্যক্তিবর্গ, আর কি ইমামদের পরে যেমন 'বনী নওবখত' ও 'শেখ মুফীদ' এর মতো ব্যক্তিবর্গ, আর কি তদপরবর্তী যুগগুলোতে যেমন 'আল্লামা হিল্লী' প্রমুখের মতো ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যারা সকলেই ছিলেন বিচার - বুদ্ধি ও যুক্তিবাদী। আমরা যুক্তি ও প্রমাণের অনুসারী। আপনারা দেখুন শিয়া মাযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কত যুক্তি ও প্রমাণসমৃদ্ধ গ্রন্থ লিখিত হয়েছে! আমাদের বর্তমান যুগে মরহুম আল্লামা শরফুদ্দীনের গ্রন্থাবলী এবং মরহুম আল্লামা আমীনীর 'আল গাদীর' গ্রন্থটি আপাদমস্তক যুক্তি - প্রমাণে সমৃদ্ধ এবং কংক্রিট ঢালাইয়ের মতো মজবুত। শীয়ায়ীত্ব হচ্ছে এটা; না ঐ সব, যেগুলোর কোনো যুক্তি প্রমাণ নেই, শুধু তাই- নয়, বরং কতকটা কুসংস্কার সদৃশ্য। কেনো এগুলো সমাজে আমদানি করা হচ্ছে? এটা ধর্মীয় পরিমণ্ডল ও দীনী জ্ঞান- বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বড় হুমকি। আকীদা- বিশ্বাসের সীমানা প্রহরীদের এ বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। আমি বলেছি

যে, একদল লোক নিশ্চিত ভাবে যখন এ কথা শুনবে তখন সহানুভূতি সহকারেই বলবে, ভালো হতো অমুক এখন এ কথা না বলতেন।

না, জনাব! আমাকে অবশ্যই এ কথা বলতে হতো। আমাকে অবশ্যই এ কথা বলতে হবে। আমার দায়িত্ব অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। সম্মানিত উলামা ও মুবাল্লিগবৃন্দেরও এ কথা বলা উচিত। আপনারাও অবশ্যই বলবেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় ইমাম খোমেইনী (রহ.) সেই সংস্কারক যিনি যেখানেই বিচ্যুতির কোনো ছাপ দেখতে পেতেন সেখানেই পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে এবং কোনো ছাড় না দিয়েই তার মোকাবিলায় দাড়াতেন। আর যদি এসব জিনিস তার সময়ে থাকত অথবা এ পর্যায়ে প্রচলিত থাকত তাহলে নিঃসন্দেহে তিনিও এ সব কথাই বলতেন। একদল লোক যারা আবার এসব জিনিসের প্রতি ভীষণ ভাবে আসক্ত হয়ে পড়েছে, তারা এসব কথায় ব্যথিত হবে যে, কেন অমুক এসব জিনিস যেগুলোকে আমরা পছন্দ করি, সেগুলোর প্রতি এমন নির্দয় হলেন এবং এভাবে তীব্র ভাষায় কথা বললেন। তাদের অধিকাংশই অবশ্য মুমিন, সত্যবাদী ও কোনো অভিসন্ধি পোষণ করে না। কিন্তু তারা ভুল করছে। এটা হচ্ছে এক মহান দায়িত্ব যা আপনারা সম্মানিত আলেমবর্গ যেখানেই থাকুন না কেন, কাধে তুলে নিতে হবে। ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শোক মজলিস এমন এক অনুষ্ঠান যা অবশ্যই খাঁটি ইসলামী জ্ঞান এবং যে তিনটি বিষয় আমি উল্লেখ করেছি সেগুলোর উৎস হতে হবে।

আশা করি, মহান আল্লাহ আপনাদেরকে যা কিছু তার সন্তুষ্টির কারণ তা শক্তি, সাহস ও শ্রম-সাধনাসহকারে নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করার তৌফিক দিন এবং (ইনশাআল্লাহ) আপনাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে সফল করুন।

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

সূত্র ইসলামী :বিপ্লবের মহান নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী এবং শ্রদ্ধেয় আয়াতুল্লাহদের কাছে আশুরার শোক পালন সংক্রান্ত ইস্তিফতাসমূহ, পৃ১৯- ৫ ., দাফতারে তাবলীগাতে ইসলামী হাওযাই - ই ইলমীয়া-কোম, ইরান কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশকাল মুহররম ১৪১৫ হি।(ফার্সী সাল ১৩৭৩খোরদাদ) .

শাহাদাতের পর

শহীদ ড.আলী শরীয়তী*

[বক্ষ্যমাণ নিবন্ধ হচ্ছে ইরানের অন্যতম বিপ্লবী চিন্তানায়ক ড.আলী শরীয়তীর একটি বক্তৃতা। তার এ বক্তৃতাটি স্বৈরতন্ত্র ও শোষণ মূলক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ইরানের মুসলিম জনগণকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।]

ভাই ও বোনেরা!

এখন আমাদের শহীদরা মৃত্যুকে আলিংগন করেছেন, কিন্তু আমরা যারা জীবিত আছি তারাও মৃত। শহীদরা তাদের বাণী আমাদের সামনে পেশ করেছেন। কিন্তু তাদের সেই উপদেশের প্রতি আমরা কর্ণপাত করছি না, বধির হয়ে রয়েছি। তারা যখন দেখলেন যে, (ইসলামের পথে) বেচে থাকা আর কোনো ক্রমেই সম্ভব নয় তখন তারা সাহসিকতার সাথে লড়াই করে শাহাদাতের পেয়ালা পান করাকেই গৌরবোজ্জ্বল পথ হিসাবে বেছে নিলেন।

আমাদের শহীদ ভাইয়েরা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, আর আমরা লজ্জাকর জীবন নিয়ে বেচে আছি। আমরা এভাবে বেচে আছি শত শত বছর ধরে। আমাদের এ হীন অবস্থা দেখে বিশ্বের জনগণ আমাদের বিদ্রূপ করছে, এটা আমাদের উপলব্ধি করা উচিত। আমাদের হেয় ও শোচনীয় অবস্থা অবমাননা ও গ্লানির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আর সেই আমরাই ইমাম হোসাইন (আ.) ও হযরত যায়নাব (আ.) - এর নাম নিয়ে চিৎকার করছি, যারা হচ্ছেন গৌরব আর মহত্বের অনুপম আদর্শ। আমরা যারা অবমাননা ও গ্লানিকর জীবন যাপন করছি তারাই আবার এসব মহৎপ্রাণ, মহিমান্বিত ও সম্মানিত প্রিয় ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করছি, শোক পালন করছি, এটা ইতিহাসের পাতায় আরেকটা অন্যায় আর অত্যাচারের অধ্যায় সংযোজন মাত্র। আজ শহীদরা তাদের রক্ত দিয়ে আমাদের সম্মুখে তাদের বাণী উপস্থাপন করেছেন। শহীদরা আমাদের মুখোমুখিই বসে আছেন, আর আমরা যারা তাদের সম্মুখে উপবিষ্ট তাদের জেগে ওঠার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছেন। আমাদের সংস্কৃতি, ধর্ম এবং শিয়াদের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, মানবতা অত্যন্ত

শক্তিশালী জীবন সঞ্জীবনী চেতনা সৃষ্টি করেছে যা ইতিহাসকে দিয়েছে প্রাণ আর প্রেরণামূলক উত্তেজনা। আর স্বর্গীয় শিক্ষা মানুষের জীবনে আনে জাগরণ যার ফলে মানুষ তার স্রষ্টা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। সেই প্রিয়তম মহৎ ব্যক্তিত্বগণ আর সেই অনুপম স্বর্গীয় সম্পদের উত্তরাধিকার যারা তারাই আজ নির্যাতিত, হীন গ্লানিকর জীবন কাটাচ্ছেন। তারা আজ লুকিয়ে থাকছেন; নিজের পরিচয় গোপন করে বেড়াচ্ছেন।

আমরা হচ্ছি সেই সঞ্চয় ও সম্পদের অধিকারী যা অর্জিত হয়েছে জিহাদ, শাহাদাত এবং মানবতার সবচাইতে মহত্তর ও মহিমান্বিত মুল্যবোধের লালনে, কুরবানি করার মাধ্যমে। আমরা হলাম এতসব মহৎ সম্পদের অধিকারী। আমাদের দায়িত্ব হবে এমন এক জনগোষ্ঠী বা উম্মাহ গড়ে তোলা যেখানে মানবতার আদর্শ সমুন্নত থাকবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন : 'আমরা তোমাদের মধ্যপন্থী জাতি রূপে সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা অন্যান্য জাতির সামনে সাক্ষী হয়ে দাড়াতে পার এবং আল্লাহর রাসূল ও যেন তোমাদের জন্য সাক্ষ্য দান করেন।' সুতরাং এ মহা মূল্যবান উত্তরাধিকারের কারণে শহীদ যোদ্ধাগণ, নেতৃবর্গ, সেনাপতিগণ, ঈমানদারগণ এবং আল্লাহর কিতাবের প্রতি আমাদের এক মহান দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের সেই দায়িত্ব হচ্ছে একটি আদর্শ সমাজ সৃষ্টি করা যাতে আমরা বিশ্ববাসীর সামনে সাক্ষী হয়ে দাড়াতে পারি এবং আল্লাহর রাসূল গণ এরসাক্ষী হতে পারেন।

আমাদের ওপর এই যে দায়িত্ব এসেছে তা অত্যন্ত কঠিন। মানবতার মধ্যে প্রাণ সঞ্জীবন করা, তাকে জীবন্ত ও সজীব করে তোলা এবং একে গতিশীল করার দায়িত্ব এসে পড়েছে আমাদের ওপর, অথচ আমরা হচ্ছি এমনই যে, সাধারণ ভাবে জীবন চালিয়ে নেয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। হে আমার খোদা! এর মধ্যে কী মহিমা লুক্কায়িত রয়েছে ? আমরা যারা পদস্খলন আর বিভ্রান্তির অতলে আছি, আমরা যারা সাধারণ প্রাণীর মতো রুটিনমাফিক জীবন যাপন করছি, আমাদের পক্ষে কী করে সম্ভব কারবালার সেই মহৎ প্রাণ পুরুষ, মহিলা ও শিশু শহীদদের জন্য চির শোক আর মাতমের অনুষ্ঠান আয়োজন করা? কারবালার শহীদগণ

শাহাদাতের মর্যাদাকে চিরায়ত সুষমামণ্ডিত করে গেছেন এবং তারা ইতিহাসের পাতায়, মহান আল্লাহর সামনে, স্বাধীনতার সামনে সাক্ষী হয়ে রয়েছেন।

আমরা দেখেছি একজন অত্যাচারী ইতিহাসকে শাসন করছে, আমরা দেখেছি একজন হত্যাকারীই এতসব শহীদ সৃষ্টি করেছে। এ হত্যাকারীর খড়গের নিচে বহু শহীদকে জীবন দিতে হয়েছে, সমগ্র ইতিহাস জুড়ে রয়েছে তার সাক্ষ্য, এ হত্যাকারীর বেত্রাঘাতে বহু মহিলার কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। রক্ত- সাগরের বিনিময়ে বহু জনশূন্য জনপদ সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। ইতিহাসের সকল যুগে, সকল জাতিতে ক্ষুধার্ত মানুষ, দাসদাসী, মহিলা ও শিশুদের নিধন করা হয়েছে, যেমন নিধন করা হয়েছে পুরুষ, বীর, চাকর ও শিক্ষকদের।

প্রত্যেকটি বিপ্লবের দু'টি দিক রয়েছে : একটি হচ্ছে রক্ত আর অপরটি হচ্ছে বাণী। শাহাদাতের মানে হচ্ছে সাক্ষ্য প্রদান। তারাই শহীদ- যারা সত্যের জন্য নিজেদের প্রেম ও ভালোবাসার কারণে রক্তস্নাত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। যে সত্য প্রেম মানুষকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করে, পৃথিবীর মানুষ তা হারাতে বসেছিল, পৃথিবীর মানুষ থেকে মানবিক মূল্যবোধ অপসৃত হয়ে যাচ্ছিল, শহীদরা আবার তা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেদের রক্ত ঢেলে দিলেন।

শহীদরা অনন্তে মিলিয়ে যাননি, তারা সদা বর্তমান, তারা জীবিত, তারা মানব জাতির জন্য সাক্ষ্য হয়ে রয়েছেন, তাদের সাক্ষ্য শুধু আল্লাহর সামনেই নয়, বিশ্বের সকল যুগের, সকল শতাব্দীর, সকল সময়ের ও সকল স্থানের মানুষের সামনে। যারা বেচে থাকতে চায় এবং তজ্জন্য যে কোনা গ্লানিকর ও অবমাননাকর পরিস্থিতিকেও মেনে নেয় তারা জীবন্মৃত, ইতিহাসে তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত অপমানকর ও অমর্যাদাকর মৃত্যু। কিন্তু সেসব মহৎপ্রাণ ব্যক্তি যারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন, ইসলামের জন্য ভালোবাসা ও উদারতার কারণে যারা ইমাম হোসাইনের সঙ্গী হয়ে লড়াই করেছেন তাদের মৃত্যু হচ্ছে গৌরবোজ্জল, মহিমান্বিত। তারা বেচে থাকার জন্য শত শত ধর্মীয় যুক্তির আশ্রয় নিতে পারতেন, কিন্তু তার প্রতি তারা কোনোরূপ ভ্রুক্ষেপ করেননি এবং এ ধরণের খোড়াযুক্তির আশ্রয় না নিয়ে মৃত্যুকে বরণ করেছেন। ইতিহাসে কারা বেচে আছেন? যারা শাহাদাত বরণ করেছেন তারা, না যারা ইমাম হোসাইনকে ত্যাগ করে গেছে এবং বেচে

থাকার জন্য ইয়াযীদের আদেশ পালন করতে গিয়ে অত্যন্ত অবমাননাকর ও গ্লানিকর পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছে? আমাদের মাঝে এখন পর্যন্ত কারা জীবিত আছেন? তারাই জীবিত আছেন যারা জীবনকে শুধু একটি চলন্ত বস্তুরূপে মনে করেন না। জীবিত তারাই যারা ইমাম হোসাইনের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পরেছেন এবং নিজেদের সকল সাত্তাকে বিলীন করে দিয়ে ইমাম হোসাইনের অস্তিত্বের প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তারাই জীবিত যারা দেখতে পেরেছেন বেচে থাকার জন্য নিতান্ত সাধারণ জীবন যাপন করা জীবন্মৃত ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং এরূপ হেয় জীবন ত্যাগ করে সত্যের জন্য প্রাণ দিয়েছেন।

কারবালার সেই বীরেরা, সেই শহীদরা আমাদের জন্য এক মহৎ শিক্ষা, মহৎ বাণী রেখে গেছেন। এ বাণী হচ্ছে, অক্ষমতা ও দুর্বলতার কারণে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির দায়িত্ব থেকে রেহাই পাওয়া যায়না। শাহাদাত কখনো এ কথা মেনে নেয় না যে, শত্রুকে পরাস্ত করার মধ্যেই বিজয় নিহিত। শহীদরা শত্রুকে পরাস্ত করতে না পারলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার মাধ্যমেই বিজয় অর্জন করেন, আর শত্রুকে পরাস্ত করতে না পারাটাকে নিজের জন্য অবমাননাকর মনে করেন না।

শহীদরা হচ্ছেন ইতিহাসের হৃৎপিণ্ড বা কেন্দ্রবিন্দু। হৃৎপিণ্ড যেমন সারা শরীরকে রক্ত সরবরাহ করে জীবন্ত রাখে, শহীদরাও ইতিহাসকে তা- ই দেন। যে সমাজ মৃতপ্রায়, প্রাণস্পন্দনহীন হয়ে পড়েছে, যে সমাজে মানুষ তাদের বিশ্বাস হারাতে বসেছে, যে সমাজ আত্মসমর্পণ নীতি অবলম্বন করে নিজের সত্তাকে হারাচ্ছে, যে সমাজের মানুষ নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্মৃত, যে সমাজের মানুষ তার মানবিক সত্তা ও মানবিক মর্যাদা সম্পর্কে অসচেতন, যে সমাজ তার উৎপাদিকা শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, যে সমাজের চালিকাশক্তি রহিত হয়ে গেছে একজন শহীদ সে সমাজের হৃৎপিণ্ড হিসাবে সেই শুষ্ক ও মৃত সমাজে রক্ত সরবরাহ করেন। সমাজের গতিহীন লাশে প্রাণ সঞ্চার করেন।

একজন শহীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোজেজা হচ্ছে এই যে, শাহাদাতের মাধ্যমে তিনি বংশধরদের জন্য একটি নতুন বিশ্বাসের জন্ম দেন। এভাবে একজন শহীদ আমাদের কাছে হয়ে ওঠেন চিরঞ্জীব, চিরাস্থায়ী।

সত্য ও মিথ্যার প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি দিগন্তে শহীদ বর্তমান- সত্য ও মিথ্যার প্রতিটি জিহাদে, প্রতিটি সংঘাতে শহীদ বর্তমান। শহীদের উপস্থিতি সর্বত্র এবং তার এ উপস্থিতির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বের সকল মানুষকে এ বাণী প্রদান করা- হে মানুষ ! যদি তোমরা সত্য আর মিথ্যার লড়াইয়ের ময়দানে উপস্থিত না থাক, তবে তোমরা যে স্থানেই থাক না কনো তার কোনো মূল্য নেই। যদি তোমরা তোমাদের জীবদ্দশায় সত্য ও মিথ্যার লড়াইয়ের ময়দানের সাক্ষ্য বহন করতে না পারো (অর্থাৎ সত্য- মিথ্যার সংঘাতে শরীক না হও), তবে তুমি অন্য যে- কোনো কাজই কর না কেনো তার কোনোই মূল্য নেই। তুমি ইবাদাতে মশগুল থাক অথবা খাদ্যবস্তু গ্রহণে ব্যস্ত থাক, এর মধ্যে কোনোও তারতম্য নেই।

শাহাদাত সত্য ও মিথ্যার চিরস্থায়ী রণক্ষেত্রের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। যারা অনুপস্থিত তাদের পরিণতি কী? যারা (কারবালার ময়দানে) হযরত হোসাইন (আ.) - কে একাকী ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল এবং লড়াইয়ের ময়দানে উপস্থিত ছিল না এবং যারা শাহাদাতের অমর গৌরব অর্জনে তার সাথী হয়নি এদের সকলের পরিণতি একই। যারা হযরত হোসাইন (আ.) - কে কারবালার ময়দানে একাকী ফেলে চলে গিয়েছে এবং ইয়াযীদের নিকট গিয়েও তার চর হিসাবে কাজ করেছে অথবা যারা বেহেশ্ত লাভের আশায় হযরত হোসাইন (আ.) - কে ত্যাগ করে নিরাপত্তা ও শান্তির সঙ্গে ইবাদাতখানায় গিয়ে ইবাদাতে মশগুল হয়েছে, যারা সত্য আর মিথ্যার লড়াইয়ে যে- কোনো প্রকার সমস্যাকে এড়িয়ে যাবার জন্য দৌড়ে গিয়ে ইবাদাতখানা অথবা নিজেদের ঘরের কোণে কেবল আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য আশ্রয় নিয়েছে, অথবা যারা ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার কারণে নিশ্চুপ ছিল এদের সকলেই জিহাদের ময়দান ত্যাগ করেছিলো এবং তাদের পরিণতিও একই।

শহীদ হযরত হোসাইন (আ.) - এর আদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে। সকল শতাব্দীতে, সকল যুগে তার উপস্থিতি বর্তমান, যারা তার পার্শ্বে এসে দাঁড়াবে না তিনি যে কেউ হোন না কেনো- ঈমানদার, নাস্তিক, অপরাধী অথবা ধার্মিক ব্যক্তি তারা সকলেই একই কাতারের।

শিয়া মাযহাবের আদর্শ অনুযায়ী কোনো কাজের প্রকৃতি নির্ভর করে ইমামত (নেতৃত্ব) এবং পরিচালকের ওপর। এ (ইমামত) ব্যতীত কোনো কিছুরই কোনো মূল্য নেই এবং আমরাও দেখেছি ইমামত ব্যতীত কার্যাদি অর্থহীন, মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।

হযরত হোসাইন (আ.) সকল যুগে, সকল বংশধরের মধ্যে, সকল যুদ্ধে, সকল জিহাদে, পৃথিবীর সর্বযুগের সকল রণক্ষেত্রে তার উপস্থিতি ঘোষণা করেছেন। সকল যুগের মানুষ, সকল বংশধরকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে তিনি কারবালায় শাহাদাতকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

আর আপনি ও আমি- আমরা হতভাগা, আমরা আমাদের উপস্থিতির ঘোষণা দিতে পারিনি, সেজন্য অবশ্যই আমাদের রোনাজারী করতে হবে। প্রত্যেক বিপ্লবের দু'টি দিক বা পর্যায় রয়েছে। রক্তদান এবং বাণী প্রচার। হযরত হোসাইন (আ.) ও তার সঙ্গী- সাথীরা বিপ্লবের প্রথম মিশন বা পর্যায় অর্থাৎ রক্তদান সম্পাদন করেছেন।

শাহাদাতের (অর্থাৎ বিপ্লবের) দ্বিতীয় মিশন বা পর্যায়ে বিশ্ববাসীর নিকট শাহাদাতের বাণী প্রচারের দরূহ কার্যটি সম্পাদন করেছেন হযরত যায়নাব –যে মহীয়সী মহিলার অসম সাহসিকতা ও নির্ভীকতা আজও বিশ্বের লোকদের জন্য একটা শিক্ষার বিষয়। হযরত যায়নাবের মিশন তার ভাইয়ের মিশন অপেক্ষা আরও অধিক ভারী এবং দুঃসহ। যারা বাতিলের মোকাবিলায় লড়াই করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পেরেছেন, তারা জীবনের একটি মহত্তর লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছেন মাত্র, কিন্তু যারা বেচে রয়েছেন তাদের দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন। হযরত যায়নাব বেচে রয়েছেন। তাকে অনুসরণ করছে ভৃত্যদের এক বাহিনী। তার সম্মুখে রয়েছে শত্রু বাহিনী। তার ভাইয়ের শাহাদাতের বাণী প্রচারের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে তার ওপর বর্তেছে। তিনি শহরে প্রবেশ করেছেন, রণক্ষেত্র থেকে এসেছেন, পেছনে রেখে এসেছেন শাহাদাতের এক লাল বাগান, আর

লাল ফুলের সাবাস ছড়িয়ে রয়েছে তার পোশাক জুড়ে। তিনি প্রবেশ করছেন অপরাধের নগরীতে, ক্ষমতা, নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের রাজধানীতে।

ক্ষমতাসীন ও নিষ্ঠুর লোকদের দাসত্বের শৃঙ্খলাবদ্ধ চর, হত্যাকারী এবং উপনিবেশ ও স্বৈরাচারের কূলনিধিদের প্রতি তিনি (হযরত যায়নাব) বিজয়ীর বেশে শান্তভাবে ঘোষণা করলেন : 'হে খোদা! আপনি আমাদের পরিবারের প্রতি যে উদারতা ও মহানুভবতা দেখিয়েছেন সে জন্য আপনার প্রতি জানাই শুকরিয়া। আপনি (আমাদের পরিবারকে) দিয়েছেন নবুওয়াতের সম্মান এবং শাহাদাতের সম্মান।' হযরত যায়নাব - এর ওপর দায়িত্ব হচ্ছে যারা সাক্ষ্যদান করেছেন অথচ নীরব হয়ে গেছেন (অর্থাৎ শহীদ হয়েছেন) তাদের বাণী ঘোষণা করা। কেননা, তিনি বেচে রয়েছেন এবং তাকে অবশ্যই শহীদদের জন্য কথা বলতে হবে, যে শহীদদের বাকশক্তি তাদের হত্যাকারীরা চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দিয়েছে।

যদি রক্তদানের পর শহীদদের বাণী প্রচারিত না হয়, তবে ইতিহাসে তাদের বাণী অকথিত থেকে যাবে। যদি রক্ত সকল বংশধরকে বাণী পৌছিয়ে না যায় তবে হত্যাকারী কোনো সময়ে অথবা যুগে তাকে বন্দি করবে। যদি হযরত যায়নাব কারবালার বাণী ঘোষণা করে না যেতেন, তবে কারবালা নীরব হয়ে যত এবং যাদের এ বাণী প্রয়োজন তারা তা পেতনা। যারা কেবল রক্তদানের মধ্যেই তাদের বাণীর কথা বলে যান (প্রচার করার কেউ থাকেনা) তাদের বাণী কারো কাছে পৌছে না।

এ কারণেই হযরত যায়নাবের মিশন এত ভারী ও কঠিন। হযরত যায়নাবের বাণী হচ্ছে সকল মানুষের প্রতি- যারা হযরত হোসাইন (আ.) - এর ইন্তেকালে কান্নাকাটি করছেন তাদের প্রতি, হযরত হোসাইন (আ.) - এর বিশ্বাস বা আদর্শের প্রতি অনুরাগী, শ্রদ্ধাশীল তাদের প্রতি, যারা হযরত হোসাইন (আ.) - এর মতো 'জীবন ঈমান ও জিহাদ ছাড়া আর কিছুই নয়'- এ কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন তাদের প্রতি।

হযরত যায়নাব এর বাণী হচ্ছে- 'আপনারা যারা এ পরিবারের অর্থাৎ হযরত আলী (আ.) – এর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত অথবা এ পরিবারকে সম্মান ও মান্য করেন, আপনারা যারা হযরত

মুহাম্মাদ (সা.) - এর মিশনের প্রতি ঈমান স্থাপন করেছেন, আপনাদের অবশ্যই চিন্তা করতে হবে এবং (সত্যকে) বছে নিতে হবে। আপনারা যে যুগে, যে বংশ পরস্পরায় এবং যে দেশেই থাকুন না কেনো আপনাদের অবশ্যই কারবালার শহীদদের বাণী স্মরণ করতে হবে।'

কারবালার বাণী হচ্ছে, সে- ই ভালোভাবে বাচতে পারে, যে ভালোভাবে মরতে পারে। আপনারা যারা আল্লাহর একত্ব ও কুরআন মজীদের বাণীকে বিশ্বাস করেন এবং সাথে সাথে যারা হযরত আলী (আ.) ও তার পরিবারের পথকে মেনে চলেন এবং যারা আমাদের পরে (দুনিয়াতে) আসবেন, (তারা জানুন) মানবতার প্রতি আমাদের পরিবারের বাণী হচ্ছে, কীভাবে ভালোভাবে বেচে থাকা ও কীভাবে ভালোভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা যায় সে জীবন পদ্ধতি পেশ করা।'

আপনি যদি ধার্মিক হন, তবে আপনার ধর্মের প্রতি আপনার একটা কর্তব্য আছে। একজন মুক্ত মানুষেরও মানবতা মুক্তি সাধনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব রয়েছে। আপনি আপনার সময়ের সাক্ষী হোন, সত্য আর মিথ্যার সংঘাতের সাক্ষ্য বহন করুন। যখনই আমাদের শহীদরা সাক্ষ্য দিয়েছেন (শাহাদাতের মাধ্যমে) তারা হয়েছেন জ্ঞাত, জীবন্ত ও চিরঞ্জীব। তারা হচ্ছেন (সত্যের) এক নমুনা এবং সত্য ও মিথ্যার এবং মানবতার ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সাক্ষ্যদাতা।

একজন শহীদকে এতসব বরণ করে নিতে হয়। প্রত্যেক বিপ্লবেরই এ দু'টি দিক রয়েছে : রক্ত আর বাণী। প্রত্যেক ব্যক্তি যে সত্যকে গ্রহণ করার দায়িত্ব মেনে নিয়েছে, যে জানে শিয়াদের দায়িত্ব গ্রহণের অর্থ কী, যে মানবতার মুক্তি উপলদ্ধি করতে পারে, তাকে অবশ্যই জানতে হবে ইতিহাসের চিরস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে, সর্বত্র যা সর্বস্থানে চলছে- এ যুদ্ধে প্রতিটি স্থানই কারবালা, প্রতিটি মাসই মুহররম, প্রতিটি দিনই হচ্ছে আশুরা। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এটা ঠিক করে নিতে হবে রক্তদান ও বাণী প্রচারের মধ্যে কোনটি সে বেছে নেবে। হযরত হোসাইন (আ.) অথবা যায়নাব এ দু'জনের একজন হতে হবে। হযরত হোসাইন (আ.) - এর মতো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে অথবা যায়নাব –এর মতো বেচে থাকতে হবে। যদি সে জিহাদের ময়দানে অনুপস্থিত থাকতে না চায় এবং নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করতে চায় তবে তাকে হযরত হোসাইন (আ.) - এর মতো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে অথবা যায়নাব - এর মতো বেচে থাকতে হবে।

যারা মৃত্যুবরণ করেছেন (শহীদ হয়েছেন) তারা একটি হোসাইনী কার্য সম্পাদন করেছেন। যারা বেচে আছেন তাদের অবশ্যই যায়নাবী (যায়নাবের মতো) কাজ করতে হবে। তা করা না হলে তারা হবে ইয়াযীদ।

*অনুবাদ :মুহাম্মদ আবুল হোসেন মাহমুদ

হোসাইনী বিপ্লবের তাৎপর্য ও এর প্রভাব

অধ্যাপক রেজাউল করিম মামুন*

ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও মুসলিম- সেমেটিক ঐতিহবাহী এ তিন জাতির পিতা হযারত ইবরাহীম (আ.) যে কারণে নমরুদের বিশাল রাজশক্তির বিরুদ্ধে একাই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, যে কারণে হযারত মুসা (আ.) তার একমাত্র সহোদর ভ্রাতা হারুনকে সাথে নিয়ে ফেরাউনের রাজাপ্রাসাদে দাড়িয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, যে কারণে মহানবী হযারত মুহাম্মাদ (সা.) মক্কার আবু জেহেল, আবু লাহাব ও আবু সুফিয়ানদের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে ছিলেন, সে একই আদর্শিক কারণে রাসূলের নয়নমনি হযারত ইমাম হোসাইন (আ.) ইয়াযীদের রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

কেনো এ বিপ্লব?

সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ আর খোদাদ্রোহিতাকে সমূলে উৎপাটন করাই ছিল এসব কালজয়ী মহাপুরুষদের মূল উদ্দেশ্য খোদাদ্রোহিতার বিরুদ্ধে লড়তে হলে বস্তুগত সাজ-সরঞ্জাম না হলেও চলে। কারণ, স্বয়ং আল্লাহই তাদের সহায়। ইমাম হোসাইনও তাই ইয়াযীদের খোদাদ্রোহী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। চরম অসহায় অবস্থার মাঝেও তিনি আপস করেননি। প্রকৃতপক্ষে তার এরূপ পদক্ষেপ ছিল পূর্ববর্তী সকল নবী - রাসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ। বুদ্ধিজীবীদের মতে, বিদ্রোহ তখনই মানায় যখন বিদ্রোহীদের হাতে পর্যাপ্ত সাজ- সরঞ্জাম এবং শক্তি থাকে। কিন্তু নবী এবং আল্লাহর ওলীদের বেলায় আমরা এ যুক্তির কোনো প্রতিফলন দেখিনা। বরং তারা প্রায় সকলেই তাদের চেয়ে তুলনামূলক বিচারে অনেক বেশি শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। ইমাম হোসাইন (আ.) এ নিয়মের ব্যতিক্রম নন।

ইরানের বিখ্যাত ইসলামী চিন্তানায়ক শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাযা মোতাহহারী (রহ.) বলেন : মানব সমাজে সংঘটিত অজস্র বিপ্লবের মধ্যে ঐশী বিপ্লবকে পৃথক করার দু'টি মাপকাঠি রয়েছে। প্রথমত এ বিপ্লবের লক্ষ্য ও উল্লেখ্য বিচার করলে দেখা যায়- এ সব বিপ্লব মনুষ্যত্বকে উন্নত ও উত্তম করতে, মানবতাকে মুক্তি দিতে, জুলুম ও স্বৈরাচারের মুলোৎপাটন করে মজলুমের অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্য পরিচালিত হয়। ব্যক্তি কিংবা ক্ষুদ্র গোষ্ঠিস্বার্থ কিংবা জাতিগত বিদ্বেষের কারণে এ বিপ্লব নয়। দ্বিতীয়ত এসব বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি বিচার করলে দেখা যায়- এসব বিপ্লবের উদ্ভব হয় অনেকটা অলৌকিকভাবে। চার দিক যখন জুলুম-নিপীড়ন এবং অত্যাচার ও স্বৈরাচারের ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত, ঠিক সেই মূহূর্তে অন্ধকারের বুক চিরে বারুদের মতো জ্বলে ওঠে এসব বিপ্লব। চরম দুর্দশায় নিমজ্জিত হয়ে মানুষ যখন দিশেহারা হয়ে পড়ে তখন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো মানুষের ভাগ্যাকাশে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয় এ সমস্ত ঐশী বিপ্লব। এ চরম দুর্দিনে মানবতাকে মুক্তি দেয়ার মতো দূরদর্শিতা একমাত্র ঐশী পুরুষদেরই থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ ঐ পরিস্থিতিতে একেবারে হাল ছেড়ে দেয়। এমনকি কেউ প্রতিকারের উদ্যোগী হলেও তারা তাকে ভয়ে সমর্থন করতে চায় না। এ ঘটনা আমরা ইমাম হোসাইনের বিপ্লবের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করি। তিনি যখন ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন তখন সমসাময়িক কালের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা এটাকে অবাস্তব ব্যাপার বলে মনে করলেন। এ কারণে তাদের অনেকেই ইমাম হোসাইনের সাথে একাত্মতা প্রকাশে বিরত থাকেন। কিন্তু ইমাম হোসাইনের ভূমিকা ছিল তখন আমাদের এক কবির ভাষায়- 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে'- অবস্থার মতো।

তাই অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অন্য কারও সহযোগিতা থাকবে কি থাকবেনা, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই তিনি নবী -রাসূলদের মতো নিজেই আগুনের ফুল্কির ন্যায় জ্বলে উঠলেন।

বস্তুত কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসাইন (আ.) -এর এ আত্মমুক্তির বিষয়টি ছিল, ইতিহাসের একটি জ্বলন্ত অধ্যায় যা থেকে অনাদিকালের মুক্তিকামী মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে উপকৃত হবে।

হোসাইনী বিপ্লবের মূল লক্ষ্য

হোসাইনী বিপ্লবের মূল লক্ষ্য উপলব্ধি করতে হলে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে :

(وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

অর্থাৎ 'তোমাদের সেই উম্মত হওয়া চাই যারা সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজে বাধা দেবে। যে উম্মতের মধ্যে এ গুণ আছে তারাই তো সফলকাম।' (সূরা আলে- ইমরান : ১০৪)

এ আয়াতের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপের জন্য পবিত্র কুরআনে পুনরায় এরশাদ হচ্ছে :

(كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)

অর্থাৎ 'তোমরই মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ উম্মত,

কিন্তু কেনো এবং কিসের জন্য তোমাদের এ শ্রেষ্ঠত্ব ? এর জবাবে বলা হচ্ছে:

(تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)

অর্থাৎ- 'কেননা, তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজে বাধা দাও।' সূরা আলে- ইমরান : ১১০

বস্তুত এ 'আমর বিল মারুফ ওয়া নেহি আনিল মুনকার'ই তোমাদেরকে মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। অতএব, যে সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেই, সে সমাজ কখনও নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে দাবি করতে পারেনা।

মহানবী (সা.) বলেছেন : 'তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের উপদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে বাধা দান করবে, নতুবা অধর্মরাই তোমাদের কাধে চেপে বসবে।' (ফুরুয়ে কাফী (৫৬/৪ :

ইমাম গাযযালী (র.) 'তার এহইয়াউ উলুমে দ্বীন' কিতাবে এ হাদিসটির একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' পরিত্যাগ করলে সমাজের নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা এতই দুর্দান্ত, পাষণ্ড, বেশরম ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে, ভালো লোকেরা নিরুপায় হয়ে তাদের কাছে কোনো কিছু প্রত্যাশা করে। আর তারা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান ও লাঞ্ছিত করে। তাই এ হাদিসের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) তার উম্মতকে হুশিয়ার করে দিয়ে

বলেন : 'তোমরা যদি মাথা উচু করে বাচতে চাও তবে 'আমর বিল মারুফ ওয়া নেহি আনিল মুনকার' কায়েম কর। নতুবা তোমরা হীন- দুর্বল ও অপমানিত হবে।'

কুরআন- হাদিসের আলোকে হযারত ইমাম হোসাইন (আ.) ইয়াযীদের শাসনের সূচনালগ্ন থেকেই এ অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। তাই ইমাম হোসাইন (আ.) বলেন :

'আমি ক্ষমতা বা যশের লোভে কিংবা ফিতনা- ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য বিদ্রোহ করছি না। আমি আমার নানার উম্মতের মধ্যে সংস্কার করতে চাই। আমি চাই সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করতে এবং অসৎ কাজে বাধা দিতে, সর্বোপরি, আমার নানা এবং পিতা হযারত আলী (আ.) যে পথে চলেছেন, সে পথেই চলতে চাই।' (মাকতালু খাওয়ারাযমী (১৮৮/১ :

কোনো প্রকার পার্থিব সুখ সম্ভোগের নিমিত্তে নিষ্পাপ শিশুগণসহ ইমাম হোসাইন কারবালায় শাহাদাত বরণ করেননি। মুনাফিক ইয়াযীদের বিশাল বাহিনীর সঙ্গে খেলাফতের মোহেও তিনি জিহাদ করেননি। মহানবী (সা.) প্রচারিত ইসলামকে বিশ্ববাসীর কাছে সমাদৃত ও উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করার মহান ব্রত নিয়ে তিনি কারবালায় আত্মদান করেছেন। আশুরা সংকলন), পৃ(৫৯ .

ইয়াযীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ইমাম হোসাইন (আ.) কারবালায় যাননি। যুদ্ধ করার জন্যই যদি তিনি যেতেন, তাহলে শিশু ও বিবিগণকে সাথে নিয়ে কারবালায় যেতেন না। বরং আসল ও নকল মুসলমানের সঠিক পরিচিতি তুলে ধরার জন্যই তার কারবালায় আগমন। কারবালা প্রান্তরে ইমামের শেষ বাক্যাটি বড়ই তাৎপর্যপূণ। ইয়াযীদের সেনাবাহিনীতে সবাই ছিল মুসলমান। অথচ ইমাম তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে ছিলেন : 'তোমাদের মধ্যে কি একজনও মুসলমান নেই?' অর্থাৎ তোমরা সবাই নকল মুসলমান।

ইমাম হোসাইনের এ বাক্যটিই সমগ্র মানব জাতিকে বুঝিয়ে দিয়েছে সকল অন্যায় ও মিথ্যার বিরুদ্ধে জেহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। এ পরম সত্য উপলব্ধি করানোর জন্যই ইমামের এ শাহাদাত।

বস্তুত নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত প্রভৃতিকেই মনে করা হয় ইসলামের মূল ভিত্তি কিন্তু মহানবী (সা.) প্রচারিত ইসলামের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, শরীয়তের ঐ বিধি- বিধানগুলোর

চেয়েও অন্তত ১০ বছর আগে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর নবুওয়াতী জিন্দেগীর সূচনালগ্নেই 'আমর বিল মারুফ ওয়া নেহি আনিল মুনকার'- অর্থাৎ 'ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের' কথা এসেছে। আমাদের রাসূল (সা.) তার নবুওয়াত প্রাপ্তির পর প্রথম ১০ বছর যে ইসলাম প্রচার করেন সে সময় নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের বিধান ছিল না। শরীয়তের এ বিধানগুলো আসে নবুওয়াত লাভের ১০ বছর পর মেরাজের রাত্রে। কিন্তু এর আগে তিনি দীর্ঘ১০ বছর কি করেছিলেন ? কেনো এ সময় মক্কার সমাজপতিদের সাথে তার সংঘাত হয়েছিল ? এর উত্তর হচ্ছে, মহানবী (সা.) প্রথম যে কালেমার বাণী প্রচার করেছিলেন এর মর্মবাণী ছিল মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বকে উৎখাত করে এক আল্লাহর প্রভুত্বের ভিত্তিতে এক নয়া সমাজ বিনির্মাণ করা। মূলত এখানেই ছিল ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ। আর এ কারণেই মক্কাবাসীর সাথে তার সংঘাত হয়ে ছিল। অতএব, ইসলামে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত প্রভৃতি রোকনগুলোর মতো 'আমর বিল মারুফ ও নেহি আনিল মুনকার' অন্যতম মৌলিক ভিত্তি এটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এটা পালন না করলে নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করা যায়না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজের অনেক আলেম ও বুদ্ধিজীবী ইসলামকে এভাবে উপস্থাপন করে থাকেন যে, 'ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ' করতে গিয়ে যদি জান- মালের ওপর হুমকি দেখা দেয়, তবে সেক্ষেত্রে তার উচিত 'আমর বিল মারুফ ওয়া নেহি আনিল মুনকার' বর্জন করে জান- মাল ও ইজ্জত হেফাজত করা। এটা আসলে দুর্বল ঈমানের লক্ষণ।

কারণ হাদীসে আছে- 'তোমরা অন্যায় কাজ হতে দেখলে হাত দিয়ে প্রতিরোধ করো, না হলে মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করো। আর তাও সম্ভব না হলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করো। তবে, এটা হচ্ছে দুর্বল ঈমানের লক্ষণ।'

তাই দেখা যায় রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর নয়নমনি হযারত ইমাম হোসাইন (আ.) অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করতে গিয়েই শাহাদাত বরণ করেছেন। এখানে এসেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, ইমাম হোসাইন (আ.) 'আমর বিল মারুফ ওয়া নেহি আনিল মুনকার'- এর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। নিজের ও পরিবার পরিজনের জীবন উৎসর্গ করে তিনি কুরআনের এ মহান শিক্ষা তথা

ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ রোকনকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। হোসাইনী বিপ্লবের তাৎপর্য ও সার্থকতা এখানেই।

উপসংহার

কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসাইনের শাহাদাত বরণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রামে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। দামেস্কের রাজক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর ইয়াযীদের ছিল বেতনভোগী এক সুসংগঠিত সেনাবাহিনী। পক্ষান্তরে, ইমাম হোসাইন (আ.) -এর এ ধরণের কোনো সেনাবাহিনী ছিল না। কিন্তু এরপরও ইমাম হোসাইন যেভাবে ইয়াযীদের শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছেন আদর্শিক লড়াইয়ের ইতিহাসে তা কেবল নবী - রাসূলের ইতিহাস ছাড়া অন্য কোনো ইতিহাসে খুজে পাওয়া যাবে না। ইয়াযীদের জন্য এটা ছিল রাজক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার লড়াই। পক্ষান্তরে, ইমাম হোসাইনের জন্য এটা ছিল আদর্শের লড়াই। ইমাম হোসাইন যদি নিজের জীবন বচানোর জন্য ইয়াযীদের হাতে বাইআত গ্রহণ করে ইসলামের অন্যতম ভিত ‘‘আমর বিল মারুফ ওয়া নেহি আনিল মুনকারের’ ব্যাপারে কোনো আপসরফায় উপনীত হতেন তাহলে ‘রাজতন্ত্র ও যুবরাজ’ প্রথারা ন্যায় একটি বিজাতীয় আদর্শ ও নিকৃষ্টতম বিদআত সেদিন ইসলামের কাছে প্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়ে যেত। তাই কারবালার প্রান্তরে তিনি তার জীবন দিয়েও ইসলামের এ ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নেহি আনিল মুনকারের’ আদর্শ কে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন।

মহামানবরা দেশ ও জাতির সীমানা পরিয়ে সমগ্র বিশ্বকে কী দিতে চান। তখন তিনি নিজের দেশ কিংবা নিজের জাতির জন্য নয়, সমগ্র মানবতাকে সেবা করতে অসীম বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখে যান। এ ধরনের ব্যক্তিত্বকে কেবল তার নিজের জাতিই সম্মান ও শ্রদ্ধা করে না, বরং বিশ্বের সকল মানুষই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। মানবতা তাকে নিয়ে গর্ব করে। শহীদে কারবালা হযারত ইমাম হোসাইন (আ.) এ ধরণেই এক অমর ব্যক্তিত্ব ও কালজয়ী মহামানব। তার কথা, কাজ, ঘটনা -প্রবাহ, তার বিপ্লবীসত্তা সবকিছুই মানুষকে অনুপ্রেরণা দেয়। আরব-

অনারব, প্রাচ্য- পাশ্চাত্য নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মুক্তিকামী মানুষের কাছেই ইমাম হোসাইন এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হোসাইনী বিপ্লব বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির সোপান হিসাবে পথ দেখিয়ে এসেছে। এর কারণ হলো, এ বিপ্লব ছিলো সম্পূর্ণভাবে ঐশী আদর্শে অনুপ্রাণিত। তদুপরি, এ বিপ্লবের নেতা ছিলেন এমন একজন কালজয়ী মহান বীর পুরুষ যিনি তলোয়ারের ওপরে রক্তের বিজয় এনে সত্যের পতাকা সমুন্নত রেখেছেন। মুসলিম সমাজের শিরায় শিরায় তিনি জাগিয়েছেন নতুন এক প্রাণস্পন্দন।

তাই কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসাইনের এ শাহাদাত তাকে মৃত্যুর মাঝে অমরত্ব দান করেছে। বনি উমাইয়্যা ভেবেছিল ইমাম হোসাইনকে হত্যা করে তারা সবকিছু চুকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু শীঘ্রই তারা বুঝতে ও দেখতে পেল যে, জীবিত হোসাইনের চেয়ে মৃত হোসাইন (আ.) তাদের পথে আরও অনেক বেশি অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছেন। আরব- অনারব নির্বিশেষে বিশ্বের প্রতিটি বিবেকবান মানুষের মনের মণিকোঠায় ইমাম হোসাইন এবং তার সাথীরা এক স্থায়ী আসন লাভ করলেন। অন্যদিকে ইয়াযীদ তার ঐ কীর্তির জন্য বিশ্ববাসীর কাছে চিরদিনের জন্য ঘৃণার প্রতীক হয়ে রইলো। তাই মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহার যথার্থই বলেছেন :

'কাতলে হোসেন আসলে মে মর্গে ইয়াযীদ হ্যায়,

ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালাকে বাদ।'

অর্থাৎ- 'হোসাইনের হত্যাকাণ্ডের মধ্যেই ইয়াযীদের মৃত্যু নিহিত ছিল। প্রতিটি কারবালার পর এভাবেই ইসলামের উত্থান ঘটে।'

***সাবেক অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়**

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে আশুরা আন্দোলনের ভূমিকা

ড.মনজুর আলম*

মানবজাতির জন্য আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.) -কে সৃষ্টি করে দুনিয়াতে সুন্দরভাবে চলার জন্য যে জীবন ব্যাবস্থা দিয়ে পাঠিয়েছেন তার নাম ইসলাম। অল্পদিন পরেই দেখা গেল আদমের এক সন্তান কাবিল আল্লাহর পাঠানো জীবন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এক খোদাদ্রোহী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে ফেললো। সেই থেকে পৃথিবীর ইতিহাসের অধিকাংশ সময়ব্যাপী দেখা যায় কাবিলের সন্তানদেরই (অর্থাৎ কাবিলের আদর্শ অনুসারীদের) জয়জয়কার। মানুষকে বিভ্রান্ত মত ও পথের অনুসরণ থেকে দূরে সরিয়ে এনে প্রকৃত কল্যাণের পথে পরিচালনা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে পাঠিয়েছেন ঐশী দূত, যাদের আরবি ভাষায় বলা হয় নবী ও রাসূল। এসব নবী - রাসূল যে দায়িত্ব পালন করে গেছেন তা হলো মূলত পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব। মানুষ তার আজন্ম শত্রু ইবলিসের প্ররোচনায় আর তার আপন পশু- প্রবৃত্তির তাড়নায় বার বার খোদাকে ভুলে গিয়েছে, আর আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানব জাতির পুনরুজ্জীবনের জন্য পাঠিয়েছেন নবী, রাসূল ও ইমাম।

নবী - রাসূল ও ইমামদের দায়িত্ব ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন মানব জাতিকে বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর ঘুম থেকে পুনরায় জাগ্রত করা। তাদের ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া যে, পশু প্রবৃত্তির দাসত্ব করার জন্য তার সৃষ্টি নয়, পশুর মতোই পেটের পুজা আর বংশ বিস্তার করে যাওয়াটাই তার একমাত্র কাজ নয়। মানুষের পরিচয় হলো সে আল্লাহর খলিফা হিসাবে এক মহান মর্যাদার অধিকারী। তার সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে নিজের মধ্যে খোদায়ী গুণসমূহ পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের লক্ষ্যে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সমস্ত আচার- অনুষ্ঠান, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক এবং আর্থ- সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন এ সব কিছুরই দিক - নির্দেশনা যুগে যুগে বয়ে এনেছেন নবী - রাসূল গণ। তাদের ভূমিকা ছিলো শিক্ষক, সমাজ

সংস্কারক ও বিপ্লবী নেতার- এক কথায় তারা ছিলেন খোদা সম্পর্কে গাফিল মানব সমাজের জন্য ইসলামী পুনরুজ্জীবনের মশালবাহী।

ইসলামী পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে আমার উপলব্ধি আলোচনার পর আশুরা আন্দোলন সম্পর্কে আমার সামান্য উপলব্ধি বর্ণনা করছি।

আশুরা বিপ্লবের তাৎপর্য এক ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, আমার আলোচনায় এ মহান বিষয়ের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়। তবুও আমার চোখে আশুরার যে দিক গুলো তুলনামূলক ভাবে বেশি স্পষ্ট তা'ই সমকালীন প্রেক্ষাপটে আলোচনা করবো।

আমার দৃষ্টিতে আশুরা বিপ্লবের সবচেয়ে বড় দিক হলো এ বিপ্লব আমাদের চোখে তরবারির ওপর রক্তের বিজয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশ্ব তাগুতী শক্তি মনে করে মারণাস্ত্রই হচ্ছে শক্তির একমাত্র উৎস। যখন বিশ্বে ছিলো দুই পরাশক্তি (আমেরিকা ও রাশিয়া), তখন তারা মেতে উঠেছিলো শক্তিশালী থেকে আরো শক্তিশালী মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের প্রতিযোগিতায়। আজ বিশ্বে একটি মাত্র পরাশক্তি রয়েছে, যে পরাশক্তি আজও কেবল একের পর এক শক্তিশালী মারণাস্ত্র উদ্ভাবন ও সংগ্রহে ব্যস্ত। বিশ্বের ছোট ছোট দেশ এসব ভয়াবহ মারণাস্ত্রের কথা শুনে ভাবে পরাশক্তির অধীনতা স্বীকার করা ছাড়া তাদের অন্য উপায় নেই। তাই আমেরিকা যখন নির্লজ্জভাবে ইসরাইলের প্রতিটি অপকর্মের সমর্থন দিয়ে যায়, তখন ছোট ছোট দেশ কোনো রকমে মুখ রক্ষার জন্য ইসরাইলের বিরুদ্ধে মৌখিক একটা দায়সারা গোছের নিন্দা জানিয়ে পরক্ষণেই আমেরিকার পায়ে সিজদাবনত হয়ে জানিয়ে আসে, 'আমরা আসলে আপনারই গোলাম। আমাদের মৌখিক নিন্দা- বিবৃতি ইত্যাদিকে আমল দেবেন না।' বিশ্বের দুর্বল দেশগুলোর এ রকম হতাশাজনক অবস্থায় আশুরার বিপ্লব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বেহেশতে যুবকদের সর্দার ইমাম হোসাইনের রক্তের কাছে তাগুতের পরাজয় বরণের কথা।

অনেকে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করবেন, কারবালায় ইমাম হোসাইন (আ.) তো সঙ্গী- সাথীসহ নিহত হয়েছিলেন, তাকে বিজয়ী বলা যায় কীভাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে হয়তো বলা যায় যে, আজকের ইতিহাসে ইয়াযীদ একটি ঘৃণিত চরিত্র, তার কবরের কোনো চিহ্ন আজ আর নেই, কোনো লোক

আজ তার সন্তানের নাম ইয়াযীদ রাখে না। অন্যদিকে ইমাম হোসাইনের মাযার ও কারবালা আজ বিশ্ব মুসলিমের কাছে অতি শ্রদ্ধেয় এক তীর্থস্থান, ইমাম হোসাইনের মাযারের মতো সুশোভিত ও অলংকৃত মাযার পৃথিবীতে বিরল, তার জন্য পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ অশ্রু বর্ষণ করে। এ বক্তব্যে সাথে আমি একমত নই। আমি মনে করি ইমাম হোসাইনের বিজয় ইতিহাসে এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়নি। এ বিজয় অর্জিত হয়েছে ব্যাপক মারণাস্ত্রসজ্জিত ইয়াযীদের বিশাল বাহিনীর সামনে অকুতোভয়ে এগিয়ে যাবার মাধ্যমে। ইয়াযীদের আশা ছিলো ইমাম হোসাইন তার বিশাল বাহিনী দেখে ভয়ে নতি স্বীকার করবেন, এমনকি আজও গুটিকয় ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন যে, ঐ সময় ইয়াযীদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়াটাই ছিলো বুদ্ধিমানের কাজ। অনেকের পক্ষে আজও বিশ্বাস করা সম্ভব হয় না যে, ইমাম হোসাইন নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কারবালার ময়দানে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আজ আমরা ইমাম হোসাইনের বিভিন্ন উক্তি ও ঘটনাপরম্পরা বিশ্লেষণ করে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, ইমাম হোসাইন চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়েই কারবালায় মাত্র বাহাত্তর জন সঙ্গী নিয়ে ইয়াযীদের সত্তর হাজারেরও বেশি জনবল সম্বলিত বাহিনীর মোকাবিলা করেছিলেন।

ইমাম হোসাইন (আ.) - এর এত বিশাল দুনিয়াবী শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র জনবল নিয়ে সম্পূর্ণ নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে যাবার মাধ্যমেই আশুরা আন্দোলনের এক মহান লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। যে আন্দোলনে ঘোষিত হলো : 'তাগুতের এই জনবল, এই দুনিয়াবী শক্তি, এই মারণাস্ত্র, ঈমানের শক্তির কাছে তুচ্ছ।' এ প্রতিরোধের ঘোষণাই গুড়িয়ে দিল ইয়াযীদের সমস্ত দুনিয়াবী শক্তির দম্ভ। সে দিনের ইয়াযীদের তরবারির ঝলকানি আর আজকের সাম্রাজ্যবাদের ক্রুজ মিসাইল ও প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্রের ভিডিও প্রদর্শনের উদ্দেশ্য একটাই, তা হলো এগুলোর ভয় দেখিয়ে মানুষকে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করা। যে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী এরূপ দুনিয়াবী শক্তি দেখে ভয় পেলো, তাগুতের দাসত্ব স্বীকার করে নিলো তারাই দুর্বল ঈমানের অধিকারী। এতো বেশি লোক এত সহজে তাগুতের অস্ত্রের ঝলকানিতে ভয় পায় যে, তাগুতী শক্তি নিজেকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে বসে। সে মুহূর্তে যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠি ঘোষণা করে সে তাগুতের

দাসত্ব স্বীকার করতে রাজি নয়, তাগুতের হাজারো মারণাস্ত্রের কাছে এতটুকু ভীত না হয়ে সে তার মোকাবিলা করতে রাজি, তখনই তাগুতের সমস্তত দম্ভ চূর্ণ হয়ে যায়। ক্রোধে অন্ধ হয়ে তাগুত হয়তো এ বিদ্রোহীকে হত্যা করতে পারে, কিন্তু অন্তরে সে পরাজয় ও হতাশারা গ্লানি ছাড়া আর কিছুই অনুভব করতে পারে না। আশুরার দিন ইয়াযীদ বাহিনী ইমাম হোসাইন (আ.) - এর রক্তপাত করেছিল এবং তার পবিত্র দেহের ওপর ঘোড়া ছুটিয়ে তার শারীরিক অস্তিত্বের অবমাননা করতে চেষ্টা করেছে সত্য, কিন্তু তারা স্বাধীন আত্মার মর্যাদাকে এতটুকু খাটো করতে পারেনি, বরং গৌরবান্বিত করেছে। এখানেই ইমাম হোসাইনের বিজয়। এ থেকেই পরবর্তীকালে মানুষ উদ্দীপনা পেয়েছে, শিক্ষা গ্রহণ করেছে যে তাগুতী শক্তির হাজারো লোকবল ও হাজারো মারণাস্ত্রের চেয়ে ঈমান- যে ঈমান হোসাইনের মতো নির্দ্বিধায় রক্ত বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত- বেশি শক্তিশালী।

ঠিক যেমনিভাবে ইয়াযীদ তার শক্তির দাপট দেখিয়ে ইমাম হোসাইনকে নতিস্বীকার করাতে চেয়েছিল তেমনিভাবে আজকের যুগের আমেরিকা ও অন্যান্য পরাশক্তি হাইড্রোজেন বোমা, ক্রুজ মিসাইল আর প্রেসিশন বম্বিং- এর ভিডিও দেখিয়ে বিশ্বের মযলুম জনগোষ্ঠীকে দাস বানিয়ে রাখতে চায়। বিশ্বের ক্ষুদ্র দেশগুলো এসব দেখে ভয়ে নতি স্বীকারও করে নেয় পরাশক্তিগুলোর। যখন বিশ্বে দুই পরাশক্তির রাজত্ব (Bipolar World) ছিলো তখন এটা ধরেই নেয়া হতো যে, কোনো দেশ যদি আমেরিকার দাসত্ব ছেড়ে আসতে চায় তাহলে তাকে রাশিয়ার দাসত্ব কবুল করতেই হবে, আর রাশিয়ার বলয়মুক্ত হতে হলে আমেরিকার খপ্পরে ধরা দিতেই হবে। ফলে ১৯৭৯ সালে ইরানের বিপ্লবী জনতা যখন হযরত আয়াতুল্লাহ খোমেইনী (রহ.) - এর নেতৃত্বে ঘোষণা করলো, 'লা শারকীয়া লা গারবিয়া' (প্রাচ্য নয়, পাশ্চাত্য নয়) তখন বিশ্বের তাবৎ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল। শাহের পাশ্চাত্য প্রভুরা যখন দেখলো জনগণ ভীষণদর্শন ট্যাংক, কামান আর রিকয়েললেস রাইফেলকে উপেক্ষা করে বুকের রক্ত বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত তখন তারা বুঝলো তাদের সকল মারণাস্ত্র, সকল সামরিক গবেষণা, সিআইএ' র সকল গোয়েন্দাবৃত্তি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। হেনরী কিসিঞ্জারের মতো

খ্যাতিমান কূটনীতিক ঘোষণা করলেন, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইরানের বিপ্লব আমেরিকার জন্য সবচেয়ে বড়- রাজনৈতিক বিপর্যয়' (Greatest Geopolitical Disaster) ।

কেনো কিসিঞ্জার ইরানের বিপ্লবকে আমেরিকার জন্য এক 'মহাবিপর্যয়' বলে অভিহিত করলেন? ইরানের বিপ্লবীরা কি আমেরিকার এক ইঞ্চি পরিমাণ ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছিল ? এর উত্তর মিলবে কিসিঞ্জারের অন্য আরেকটি উক্তি থেকে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলাকালে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দ্যগল কিসিঞ্জারকে প্রশ্ন করেছিলেন : ভিয়েতনামে যুদ্ধ চালিয়ে তোমাদের লোকসান ছাড়া লাভ তো হচ্ছে না, এর পরেও তোমরা ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য সরিয়ে আনছো না কেন?' কিসিঞ্জার জবাবে বললেন, 'এতে আমাদের বিশ্বাস যোগ্যতা (Credibility) ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' দ্যগল বললেন, 'কোথায় তোমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবার ভয় পাচ্ছ?' কিসিঞ্জার বললেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে'। কূটনৈতিক পরিভাষায় কিসিঞ্জার যা বলতে চাইলেন তা হচ্ছে ভিয়েতনাম থেকে আমরা যদি সৈন্য সরিয়ে আনি তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানরা আমাদের আর ভয় পাবে না অর্থাৎ মুসলমানদেরকে যে শক্তি দেখিয়ে আমরা পদানত রাখতে চাই, সে শক্তি প্রদর্শনের জন্য আমাদের ভিয়েতনামে যথেচ্ছ বোমাবর্ষণ করা দরকার। লক্ষ্য করলে দেখবেন, এ মানসিকতাই ইয়াযিদী মানসিকতা। দ্যগলের সাথে কিসিঞ্জারের এ কথোপকথনের এক দশক পরেই যখন সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত কূটচাল আর ভয়- ভীতিকে উপেক্ষা করে ইমাম হোসাইনের পথ ধরে ইমাম খোমেইনীর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো, 'আল্লাহ আকবার' এবং জনতা ও কাফন পরে রাজপথে নেমে এলো, তখন আমেরিকার সিআইএ, পররাষ্ট্র দফতর, প্রেসিডেন্টের দফতর ইত্যাদির মধ্যেই পারস্পরিক দ্বন্দ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তারা একে অপরকে দায়ী করছিল পরাজয়ের জন্য। কেউ বলছিল সিআইএ'র গোয়েন্দা তথ্যাবলী ভুল ছিল, কেউ বলছিল পররাষ্ট্র দফতরের নীতিতে ভুল ছিল ইত্যাদি। এর কারণ, তারা আজও ইমাম হোসাইনের শিক্ষা উপলব্ধি করতে পারেনি।

ইমাম হোসাইন শিখিয়েছেন বাহ্যিক অর্জন বড় কথা নয়, সত্যের সাক্ষ্যদিতে পারাটাই আসল বিজয়। তাই অনেকে যদিও মনে করেন ইমাম খোমেইনী (রহ.) ও ইরানের বিপ্লবীরা ১৯৭৯

সালের পয়লা ফেব্রুয়ারিতে একটা ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিজয় অর্জন করেছিলেন, সেটা আসলে ভুল ধারণা। বিজয় অর্জিত হয়েছিল তখনই যখন শাহের সর্বাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণ খালি হাতে এগিয়ে গিয়েছিল নির্দ্বিধায়। ইরানের বিরুদ্ধে ইরাক কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের সময় ইমাম খোমেইনী বলেছিলেন, 'আমরা যদি যুদ্ধক্ষেত্রে এগুতে এগুতে বাগদাদ পর্যন্ত অগ্রসর হই তবু তাকে বিজয় বলা যাবে না। আর আমরা যদি পিছু হটতে হটতে একেবারে তেহরানেও এসে ঠেকি তবুও তাকে পরাজয় বলা যাবে না। আমাদের বিজয় আমাদের ওপর ন্যস্ত খোদায়ী দায়িত্ব পালন করার মধ্যেই নিহিত।' এ শিক্ষা আশুরা বিপ্লবেরই শিক্ষা।

আশুরা বিপ্লবের আরেকটি বড় দিক হলো সঠিক ধর্মকে মেকী ধর্মাচরণ থেকে পৃথকীকরণ। বর্ণিত আছে যে, ইয়াযীদের সৈন্যরা আশুরার দিন একে অপরকে বলছিল : 'তাড়াতাড়ি হোসাইনের শির কেটে নাও, আসরের নামাযের সময় পার হয়ে যাচ্ছে' অর্থাৎ তারা ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করতো কিন্তু ধর্মের লক্ষ্য আদর্শকে কতল করতে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত ছিল না। আজকের যুগের ইয়াযীদরাও মাঝে মাঝে ধর্মের পাশোক ধারণ করে ধর্মের শিক্ষাকে ধ্বংস করতে এতটুকু পিছপা নয়। 'আমেরিকান ইসলাম', 'সউদী ইসলাম' ইত্যাদি নানান রূপ ধরে ইসলামের নামে ইসলামী আদর্শকে ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে। হজ্বের মতো সমাবেশে আমেরিকা ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়া নিষিদ্ধ করা হচ্ছে ইসলামেরই নামে। নির্ভেজাল তাওহীদ প্রতিষ্ঠার নামে সৃষ্টি করা হয়েছে বিষাক্ত ওয়াহাবী মতবাদ, যে মতবাদ অনুযায়ী লম্পট রাজাদের বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র জায়েয, ইয়াহুদী- নাসারা শাসিত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি আদেশ-নির্দেশ মেনে চলা জায়েয, কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.) - এর জন্য শোক প্রকাশ করা বিদআত, হে মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশার প্রতিকারকল্পে ইয়াহুদী- নাসারাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়া নাজায়েয। আশুরার বিপ্লব আমাদের শিক্ষা দেয় যে, বাহ্যিক আচার- অনুষ্ঠান পালনকারীরাও ইয়াযীদের দলভুক্ত হতে পারে এবং তাদেরই হাতে ঝরতে পারে আজকের হোসাইনীদের রক্ত।

আজ বড় শয়তানের দেশ আমেরিকার প্রেসিডেন্টও উদ্ধৃত করেন পবিত্র কুরআনের আয়াত, ঠিক যেমনিভাবে ইয়াযীদ কারবালার বন্দিনী হযরত যায়নাবের সামনে উচ্চারণ করেছিল। ইয়াযীদ সেদিন কুরআনের আয়াত, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন' উচ্চারণ করে বোঝাতে চেয়েছিল যে, আল্লাহর ইচ্ছাতেই যায়নাবের (সালামুল্লাহ আলাইহা) সঙ্গী-সাথী দের এ বন্দি দশা এবং আল্লাহর ইচ্ছাতেই ইমাম হোসাইনের পবিত্র দেহ পদদলিত হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টও আজ কুরআনের আয়াত উচ্চারণ করে ফিলিস্তিনিদের দাসখত লেখার অনুষ্ঠানে। যে চুক্তি দিয়ে ইয়াহুদীবাদীদের সমস্ত অপকর্মকে বৈধতা দেয়া হলো, যে চুক্তি দিয়ে ঘোষণা করা হলো লক্ষ্য –কোটি ফিলিস্তিনির হত্যা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ ও জুলুমের মাধ্যমে দেশছাড়া করা সম্পূর্ণ বৈধ, যে চুক্তি দিয়ে মুসলমানদের তৃতীয় কেবলা সান্ত্রাসবাদী জালিম ইয়াহুদী শাসকদের হাতে তুলে দেয়া হলো, যে চুক্তি দিয়ে ফিলিস্তিনিদের দিয়ে ইয়াহুদীদের আনুগত্য করতে বাধ্য করা হলো, সে দাসখতের নাম দেয়া হলো 'শান্তি চুক্তি'। আর দাসখত লেখার অনুষ্ঠানে ওরা কুরআনের আয়াত, 'যদি তারা শান্তির আহবান নিয়ে আসে তোমরাও তাতে রাজি হও' উদ্ধৃত করার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, কুরআনই তোমাদের এ দাসখত লেখাকে সমর্থন করে।

আশুরার আর ও অনেক দিক ও গভীর তাৎপর্য রয়েছে।সকল দিকের উপলদ্ধি আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ধারণ অসন্তুষ্ট। আমি এ এটুকু বলে শেষ করবো যে, যুগে যুগে যখনই মানুষ ইসলাম বিস্মৃত হয়েছে তখনই আল্লাহ মানুষকে সংশোধন করার জন্য নবী, রাসূল ও ইমাম পাঠিয়েছেন। ইমাম হোসাইন (আ.) এমন এক সময়ে আশুরার বিপ্লব সাধন করেছিলেন যখন ইসলামের বাহ্যিক আচার- অনুষ্ঠান বিদ্যমান থাকলেও মানুষ ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে সরে গিয়েছিল। এ বিপ্লব করতে গিয়ে তিনি রক্ত দিয়ে সত্যের সাক্ষ্য দান করে প্রমাণ করলেন যে, রক্ত সকল মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারে। আশুরার এ শিক্ষার আজ ইরানের বিপ্লবে, লেবাননের হিযবুল্লাহ কর্তৃক শক্তিশালী ইসরাইলী বাহিনীর মোকাবিলায় এবং কাশ্মীর, আলজেরিয়া, মিশর-সুদানসহ বিশ্বে ইসলামের মুজাহিদদের প্রেরণার উৎস।

*অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সাউথইষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

কবিতা

মোহররমের চাঁদ এল ঐ

কাজী নজরুল ইসলাম

মোহররমের চাঁদ এল ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়

ওয়া হোসেনা ওয়া হোসেনা তারি মাতম শোনা যায়।।

কাঁদিয়া জয়নাল আবেদীন বেহোশ হ' ল কারবালায়

বেহেশতে লুটিয়া কাঁদে আলি ও মা- ফাতেমায়।।

আজও শুনি কাঁদে যেন কুল মুলুক্ আসমান জমীন

ঝরে মেঘে খুন লালে- লাল শোক- মরু সাহারায়।।

কাশেমের লাশ লয়ে কাঁদে বিবি সকিনা

আসগারের ঐ কচি বুকে তীর দেখে কাঁদে খোদায়।।

কাঁদে বিশ্বের মুসলিম আজি, গাহে তারি মর্সিয়া

ঝরে হাজার বছর ধ' রে অশ্রু তারি শোকে হায়।।

[জুলফিকার]

শহীদে কারবালা

ফররুখ আহমদ

' সকলে শহীদ হৈল দস্তকারবালাতে'

ফোরাতের তীরে তীরে কাঁদে আজও সংখ্যাহীণ প্রাণ;
উদভ্রান্ত ঘূর্ণিরর মত শান্তি চায় মাতমে - কান্নায়,
যেখানে মৃত্যুর মুখে তৃষ্ণাতপ্ত মরুর হাওয়ায়
জিগরের খুন দিল কারবালার বীর শহীদান।
স্মৃতির পাথর পটে সে কাহিনী রয়েছে অম্লান
উজ্জ্বল রক্তের রঙে, মোছেনি তা মরু সাহারায়,
লোভের পঙ্কিল পথে অথবা রাত্রির তমসায়
যেখানে জ্বালালো দীপ সত্যাশ্রয়ী আদম সন্তান।
নির্ভীক মুসার পণ, খলিলের সুদৃঢ় ঈমান
যেখানে দেখেছি দীপ্ত, মসীকৃষ্ণ রাত্রির ছায়ায়
কুতুব তারার মত প্রোজ্জ্বল আপন মহিমায়
যেখানে দেখেছি চেয়ে সর্বত্যাগী হুসেনের দান,
যেখানে শুনেছে প্রাণ মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদের গান
পুঁথির পাতায় নয় জীবনের প্রতিটি পৃষ্ঠায়।।

শহীদে কারবালা

শাহাদাৎ হোসেন

দামামার দমদম তুযের্ব্যর বাজনা
থেমে গেছে, স্তব্ধ সে মৃত্যুর সাহানা।
ছায়াময়ী সন্ধ্যা সে নামে ধীরে বিশ্বে
নিভে যায় আলো- রেখা আঁধারের দৃশ্যে।
রক্তে নহর বয় কারবালা- বক্ষে
অশ্রুর ধারা ঝরে প্রকৃতির চক্ষে।
সন্ধ্যার আসমান উঠিয়াছে রাঙিয়া
শহীদের খুন যেন দিয়েছে কে ঢালিয়া।
ওকে বীর ধেয়ে যায় ফোরাতের কুলেতে
উন্মাদ পিপাসায় কর চাপি বুকেতে ?
মণি- দীপ ও যে গো হজরৎ বংশের
দুষমনে খেদায়ে করে ধরি' শমশের—
ফোরাতের বারি পানে শীতলিতে পরাণী
চলে দ্রুত, ঘর্ম্মেতে সিক্ত সে পেশানী।
ও কি পুন! স্বাদুনীরে অঞ্জলি ভরিয়া—
মুখে তুলি পান বিনা দিল যে ও ফেলিয়া।
কূলে উঠি ওই অঙ্গের বসনে
উন্মোচি' একে একে ভূতলের শয়নে
ঢালে দেহ বীরবর বীরসাজ ত্যজিয়া
শ্রান্ত কি কেশরী ও পড়িয়াছে ঢলিয়া

জম্বুক সংগ্রামে? হুঙ্কারি নিমেষে

কে রে তুই নির্ম্মম ধেয়ে এলি কি বেশে?

কি করিস! কি করিস! রে ঘাতক কেমনে

বসিলি রে নির্ভয়ে ও ছাতির আসনে!

কোনা প্রাণে নির্ম্মম নূরাণী ও অঙ্গে

বসিলি রে উল্লাসে দানবের ভঙ্গে ?

ও কি পুন খঞ্জরে রক্তের ফিনকি!

মনে নাই রে- ঘাতক হাসরের দিন কি?

ওই শোন্ ক্রন্দনে বেজে ওঠে দুনিয়া-

হায়! হায়! হা হোসেন! আসমান চুনিয়া-

খুন ঝরে প্রান্তরে জান্নাত নিঙাড়ি,

কল্লোলে কাঁদে নদী সৈকতে আছাড়ি। ..

নূরনবী হজরৎ নিশিদিন যাহারে

চুমিতেন বুকে ধরি, সস্নেহে আদরে,

সেই আজি প্রান্তরে রক্তের শয়নে

আছে শুয়ে পাণ্ডুর জ্যোতি- লেখা নয়নে।

করিলি কি নির্দয়! ফুৎকারে নিভালি

প্রোজ্জ্বল দীপখানি, ইসলামে ডুবালি!

[কলকাতা, ১৩২৭]

ইমামের শাহাদাত

হোসেন মাহমুদ

ধু ধু মরুভূমি, আকাশে জ্বলন্ত সূর্য সারাদিন ঢালে অসহ্য উত্তাপ
নেই কোন সবুজের আভাস ডাকে না পাখি শুধু বৈরী বালির বিস্তার
অনাহার তৃষ্ণায় ধুকে মরছে অবরুদ্ধ একদল নিরীহ মানুষ
তাদের অপরাধ- তারা সাথী এক সত্যনিষ্ঠ ন্যায়বান মানুষের।
ইমাম হোসেন সিজদা থেকে তোলেন মাথা, এবার তার শেষ প্রস্তুতি
নিষ্ঠুর অত্যাচারী এজিদ হয়েছে এখন মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা
হায়! দুর্ভাগ্য এই কওমের যে, এক স্বৈরাচারী আজ তাদের শাসক
যে কি না কবর রচনা করেছে ইসলামী সাম্যের মহান ধারার।
তার অশুভ শক্তির প্রবল দাপটে সবাই থরথর কম্পমান
সম্পূর্ণ ভূলুণ্ঠিত আজ পবিত্র স্থান মক্কা ও মদীনার মর্যাদা
ভয় ত্রাসের সেই অন্ধকারে সত্যের মত দীপ্ত শুধু হোসেন
কে না জানে তিনি রাসূলের প্রিয় দৌহিত্র, পুত্র আলী ও ফাতেমার
এ চরম দুর্দিনে তিনিই একমাত্র আশা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর।
দশ মুহররম। শিশুদের আহাজারি- পানি! পানি! বুকে যন্ত্রণা বাড়ে
সত্যের বাধ ভাঙ্গে, ইমাম অশ্বরূঢ়, আজই হবে শেষ ফয়সালা।
দুলদুল দুলকি চালে পৌছে যায় ফোরাতের তীরে, শত্রুরা অপেক্ষায়
তাকে দেখেই শুরু করে তীর বর্ষণ, কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই তার
হাতের খোলা তলোয়ার শুধু ঝলসায়, যেন বিদ্যুতের চকিত চমক
শত্রুরা ঘিরে ফেলে তাকে, কিন্তু সত্যের সামনে কি করে টিকবে মিথ্যা?
রণহুঙ্কার, অস্ত্রের ঝনঝন, আঘাত ও প্রত্যাঘাত, এক শত্রু মরে

পরক্ষণেই আসে আরেকজন, তবু তিনি পৌছে যান ফোরাতের তীরে।
হায় পানি, তোমার অন্য নাম জীবন! তিনি আজলায় তুলে নেন পানি
মুখে দিতে গিয়েই মনে পড়ে যায় কাতার কচি শিশুদের মুখ
আঙ্গলের ফাক গলে পড়ে যায় পানি, কিছুতেই হয়না পান করা।
হোসেন উঠে দাড়াতেই শত্রুসৈন্যের দল পুনরায় ঘিরে ধরে তাকে
আবার লড়াই। কিন্তু আর কত? সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে তার
আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত দেহ, অবসন্ন তিনি লুটিয়ে পড়েন ভূমিতে
তার চোখের সামনে ভুলুণ্ঠিত খিলাফত। দূরে শিবিরে ওঠে কান্নার রোল
সব আশাই শেষ, সত্য ও ন্যায়ের শ্রেষ্ঠ পতাকাবাহী চলে যাচ্ছেন
আজ আশুরায় শাহাদাতের পিয়ালা ঠোটে, খোলে জান্নাতের দরোজা।
এই তো সময়! পশুর অধর্ম সীমার তৎপর হয়ে ওঠে মুহূর্তেই
আর নিষ্কম্প হাতে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইমামের পবিত্র মস্তক
একদিকে মর্মভেদী বিলাপ ও আহাজারিতে বিদীর্ণ আকাশ –বাতাস
অন্যদিকে রক্তের নদীতে নেয়ে নাচে হাসে শত্রুরা উন্মত্ত উল্লাসে
পৃথিবী নীরবে চেয়ে দেখে মানব ইতিহাসের এই করুণ ট্রাজেডি। [অংশ বিশেষ]

কাঁদে ফোরাতের নীর

সিরাজুল হক

এখনো শোকে মুহ্যমান নিশ্চল সেই ফোরাতের নীর,

এখনো তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে

কোটি মানুষের সেই ফোরাতের তীরে।

ওই মোনা যায় আমার ইমামের আহাজারি!

এখনো ধ্বনিত- প্রতিধ্বনিত ফোরাতের কূলে কূলে,

আর বিলোড়িত কারবালার উষ্ণ বালুকণা –

পবিত্র খুনে হয়েছে রঞ্জিত

কোন এক আশুরার দিনে।

বর্ষে বর্ষে আসে সেই দশই মুহররম, আসে

শোণিত- সিক্ত পতাকার বেশে,

আর হিংস্র ভয়াল থাবা শিমরের সহসা

আমার ব্যথাতুর পাজরে এসে বিধে।

গিয়েছে শিমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে,

নিপাত গিয়েছে তার গুরু ইবনে জিয়াদ

আর ওমর বিন সাদ

ইয়াজিদের অনুসৃত পথে,

সেতো প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড নরকের।

আমার ইমামের স্মৃতি লেখা আছে

স্বর্গের রাজতোরণে সোনালী- রক্তিম আখরে

চিরদিন : "শহীদকুল শিরমনি- বেহেশতে

শহীদানের সরদার” তিনি।

ওগো, ফোরাতের নীর আজো কাঁপে

বিষাদের ছাপ লেগে আছে তার নীলাভ অবয়বে-

বিষাক্ত তীরের আঘাতে যেন জরর্জরিত

বনের শোকার্ত পক্ষীকূল!

আজও শোকার্ত কারবালার ‘লু- হাওয়া’ বয়

হেথা চারদিকে- তপ্ত নিঃশ্বাসের মতো,

আমার ইমামের শোকে বিহবল অবিরত-

কুফা নগরী, আর

দামেস্কে ইয়াজিদের স্বপ্নপুরী-

দ্বিখণ্ডিত শির তার স্থাপিত হয়েছিল যেখানে।

ইয়াজিদের রঙিন স্বপ্ন সে দিন

হয়েছিল বিচুর্ণ- বিলীন,

অভিশপ্ত আজ সে বিশ্ব লোকে,

জালিমের পরিণাম কত যে করুণ

দেখে নিল এ বিশ্ববাসী আরেকবার

দামেস্কের রাজপুরীতে!

মজলুমের প্রতীক, সত্য ন্যায় আর সংগ্রামের প্রতীক

আবু আবদুল্লাহ আল হোসাইন- মহাবীর,

কারবালার মাটি গুমরে কাঁদে, কাঁদে ফোরাতের নীর

কাঁদে শহীদের ঝাণ্ডাবাহী লক্ষ মানুষ

আজও দিকে দিকে এই পৃথিবীর।

সে চেতনায় অবগাহন

আবদুল মুকীত চৌধুরী

এক.

বলে, এ যে ‘রাহুর দশা’: ষোলকলার রাত!

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে, মিথ্যা বাজীমাত!

গলাধাক্কা অর্ধচন্দ্রে দিন যাপনের গ্লানি-

বলে, ‘দুষ্টগ্রহের ফেরে’ গোলক- জাড়া ঘানি!

কনুই- গুতো –লাথি খেয়ে বুদ্ধুগুলো ভাবে,

কী আনন্দ! সরাসরি বেহেশতেই যাবে !

আগ্রাসীদের আস্ফালনে পৃথিবী গোটা টলে

কালো রাতের যাত্রী সময় কুকড়ে হেটে চলে।

কাঠের পুতুল, কুড়ের বাদশা কড়ায়- গণ্ডায়

দেখো, কেমন আক্কেল- এর সেলামী দি’ যায়!

আত্মঘাতী গুতোগুতির এ মেষকুলে কবে

ভিটেয় ঘুঘু চরার আগে সুবুদ্ধিটা হবে !

আকাট মুর্খগুলো যেন আমড়া কাঠের ঢেকি

কলুর বলদ, চিনির বলদ- গোড়ায় গলদ, সে কী ?

দুই.

গলদটা সেই শুরুতেই এজিদী উত্থান,

মিশিয়ে দিলো ধুলোয় সেদিন খোদার দীনের মান।

খুন ঝরালো, ঘৃণ ধরালো নবীর পতাকায়

আঘাত হানে সেই বিধানে শোকের কারবালায় !

ইমাম –বিহীন সে মিম্বরে জাগে রোদন তার

আকুল আর্তি জাগে খোদা : বাচাও অধিকার।

রাষ্ট্র বিদায়, সাম্য বিদায় - মানুষ ‘প্রভু’ হয়,

ইসলাম কি মানতে পারে এমন বিপর্যয়?

তিন.

সে জিজ্ঞাসার খুজতে জবাব শতক শতক পার:

সে চেতনায় অবগাহন চাই যে পুনর্বার।

শাহাদাতের উজ্জীবনী ছড়ায় আলোর বান

জেগে ওঠার এই তো সময়, রেঙেছে আসমান!

আশুরার দ্বি- প্রহর

মো.মোবারক আলী মোল্লা

দ্বি- প্রহর গড়াইয়া বিকাল হইল রক্তরাঙা রোজ আশুর

আকবর, আজগার, কাশেমও শহীদ, শহীদ বাহাত্তুর।

অবশেষে যখন রহিল না কেহ অসুস্থ জয়নুল ছাড়া,

চাপি দুল দুলে যুদ্ধ সাজ পরি ছুটালেন তিনি ঘোড়া।

শত- সহস্র কাফের কমবখত হারাইল তাদেরা প্রাণ,

ছেড়ে নদী তীর অবশিষ্ট যারা ত্বরিৎ করে পলায়ন।

মুক্ত হইলো ফোরাতের কূল, দেখিলেন স্বচ্ছ নীর,

বাড়িল পিপাসা নামিলেন তিনি ঘোড়া হতে নদী তীর।

দু’হাতে উঠালেন পিয়াসের বারি তুলিবেন যখন মুখে,

একে একে বুঝি হইলো স্মরণ ব্যথা তাই বাজে বুকে।

ক্ষণকাল তিনি দড়াইয়া সেথা ফিরে এলেন নীর ছেড়ে,

শোকে মুহ্যমান পিপাসায় কাতর চলিলেন ধীরে ধীরে।

নিদারুণ শোকে শোকাতুর তিনি চলার শক্তি নাই,

পড়িলেন ঢলি তপ্ত মরুতে দুলদুল দেখিয়া তাই;

হ্রেষারব তুলি ছুটিল শিবিরে অশ্রু ভরা দু- নয়ন,

শূন্য পৃষ্ঠ হেরিয়া বুঝিল আশার বাতি নিভিল যে এখন।

অসহায় যত পরিগণ কাঁদে লুটায়ে ধুলাতে হায়,

রওজা মোবারক কাপে থরথর সুদূর মদীনায়।

কাঁদে আজও তাই বিশ্ব মুসলিম ঢালিয়া হৃদয়ের প্রীতি,

দুনিয়া জাহান বুকে লয়ে কাঁদে আজও কারবালার স্মৃতি।

আজ এ আশুরায়

আ. শ. ম. বাবর আলী

মিথ্যের সাথে সন্ধি নয় কখনো,

সত্যের সাথে সখ্য।

সত্যকে শক্তি করে

যে করে জীবনের ভিত রচনা,

সে জীবনের মূল্য অনেক।

যে মূল্য অতিক্রম করে যায়

মৃত্যুকে পৌছে দিয়ে

মহত্বের শীর্ষ তোরণে।

কারবালা !

তেমনি এক মহান সত্যের পিরামিড

যেখানে উড়লো

সত্যের আবাদী পতাকা

অসত্য আর অন্যায়

প্রতিরোধ সংগ্রামের

মানব আর মানবতার

বিশ্ব নযীর।

সে পতাকার শ্রেষ্ঠ ধারক

হাসান- হোসেন

বুকের মানিক আহা

মোর নবীজীর!

পবিত্র হলো ফোরাতের পানি

তোমাদের শহীদী রক্তের ছোয়ায়।

অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রামে

তোমরাই প্রেরণা হলে

আজ এ আশুরায়।

মুহররমের চাঁদ

আমিন আল আসাদ

আকাশে ঐ উঠলো দেখো

মুহররমের চাঁদ

ইমাম হোসেনের শোকে

কাঁদ রে তোরা কাদ।

এই চাঁদেরই দশ তারিখে

ফোরাত নদীর তীরে

কারবালা মাঠ লাল হয়েছে

রক্তেরই আবীরে।

এজিদ সীমার পাষণ্ডরা

ছুড়লো যখন তীর

সেই তীরেতে জীবন দিলেন

আল্লাহ প্রেমিক বীর।

ইমাম এবং তার সাথীরা

শহীদ হলেন হেসে

সত্য পথে লড়াই করে

দ্বীনকে ভালোবেসে।

এজিদ সীমার পাষণ্ডরা

আজো লেগেই আছে;

বীর মুজাহিদ ইমাম হোসেন

অনুসারীদের নাশে।

নবীর নাতি হোসেন সাথী

আছে বিশ্ব মাঝে

করছে লড়াই ঢালছে লহু

সকাল দুপুর সাঝে।

জানার ইচ্ছে

বুলবুল সরওয়ার

ফোরাতে এখন কার পদধ্বনি? কে জাগে দজলা- তীরে?

আজলায় কার সুপেয় জলের ধারা?

নাম কি তাহার? জন্ম কাহার ঘরে?

জানতে ইচ্ছে করে রে বন্ধু, জানতে ইচ্ছে করে।

যাদের স্মৃতিতে হোসেন, তারা সব ঘুমায় কেমন করে !

শত্রু ভাবছো মাতমকারীকে, বলছো সংযোজন

মানি হে বন্ধু, মানি;

অর্থই আজ মন্দিরে 'দেবী'- মহাজগতের রাণী!

তার ঘুম নিঝুম

কবর কবিতা এই থেকে উঠে বুকেতে পাচ্ছে উম।

হায় রে দুনিয়া! কবিরা ঘুমায়, স্বদেশ ঘুমায়, ঘুমায় স্বপ্ন ঘোরে

কাবা কি জাগবে? কবে থেকে –খুব জানতে ইচ্ছে করে !

ইমাম হোসাইন (আ.) - এর মাযারের ইতিহাস

কারবালা অন্য যে কোন শহর থেকে স্বতন্ত্র। এর নাম সকল মুসলমানের স্মৃতিতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। বিশ্ববাসী এ নাম স্মরণ করে নিদারুণ দুঃখ ও ব্যাথা নিয়ে। কারণ, তারা শহীদদের সর্দার ইমাম হোসাইন (আ.) - এর ইতিহাস ও ইসলামের জন্য তার আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে।

কারবালায় দর্শনার্থীদের স্রোত কখনও বন্ধ হয়নি। উমাইয়্যা ও আব্বাসী খলিফারা হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) - এর মাযার নির্মাণে বার বার বাধা দেয়া সত্বেও এক সময় ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ইমামের মাযার নির্মাণে সফল হয়।

বর্তমানে কারবালা প্রত্যক্ষ করছে এক নতুন বিপদ। ইমাম হোসাইন (আ.) ও তার সাথীদের মাযার আজ ধ্বংস ও অবহেলার শিকার। দর্শনার্থীদের সেখানে পৌছতে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

দু'টি প্রধান রাস্তা দর্শনার্থীদের কারবালা নিয়ে যায়। একটি হচ্ছে ইরাকের রাজধানী বাগদাদ থেকে মসুল- এর ভেতর দিয়ে এবং আরেকটি হচ্ছে ধর্মীয় নগরী নাজাফ থেকে।

কারবালা পৌছার পর দর্শনার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করবে মাযারের মহিমান্বিত মিনার ও গম্বুজগুলো।

দর্শনার্থীরা শহরের প্রবেশ মুখে এসে দাড়াতেই দেখতে পাবে একটি সীমানা প্রাচীর যা কাচের কারুকাজ সম্বলিত কাঠের দরজাগুলোকে ঘিরে আছে। কেউ যখন এর কোনো একদরজা দিয়ে প্রবেশ করবে সে নিজেকে একটি প্রাঙ্গণে দেখতে পাবে যার চারদিকে রয়েছে ছোটছোট কক্ষ।

পবিত্র কবরস্থানটি প্রাঙ্গণের মাঝখানে অবস্থিত; যার চতুর্দিকে রয়েছে স্বর্ণের তৈরী অত্যন্ত সুন্দর আলোকোজ্জ্বল জানালাসমূহ যা সত্যিই দেখার মতো।

কারবালার আদি ইতিহাস ও এর অর্থ

‘কারবালা’ শব্দটির উৎস নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। কেউ বলছেন ‘কারবালা ’শব্দটি ‘কারবালাতো’ ভাষার সাথে সম্পর্কিত। আবার কেউ ‘কারবালা’ শব্দের অর্থ এর বানান ও ভাষা পর্যালোচনা করে উপস্থাপন করেছেন। তারা উপসংহারে পৌছেছেন যে, আরবি ‘কার্বাবেল’ থেকে এর উৎপত্তি যা প্রাচীন ব্যবিলনীয় কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি- যার মধ্যে ছিলো নিনেভা, আল- গাদীরিয়া, কারবেলা, আল- নাওয়াউইস এবং আল হীর; শেষোক্ত গ্রামটি বর্তমানে ‘আল- হাইর’ নামে পরিচিত যেখানে ইমাম হোসাইন (আ.) - এর মাযার অবস্থিত।

গবেষক ইয়াকুত আল- হামাভী বলেছেন যে, ‘কারবালা’ শব্দটির বেশ কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এর একটি হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে ইমাম হোসাইন (আ.) –কে শহীদ করা হয় যা নরম মাটি ‘আল- কারবালাত’ দিয়ে তৈরী।

অন্যান্য লেখকগণ এ নামকে মরুভূমিকে রক্তাক্তকারী ভয়াবহ ঘটনার সাথে যুক্ত দেখেছেন। আর তাই বলা হচ্ছে, ‘কারবালা’ শব্দটি দু’টি আরবি শব্দের সমষ্টি, একটি হচ্ছে ‘কারব’ যার অর্থ হচ্ছে শোক দুঃখ এবং ‘বালা’ যার অর্থ দুর্দশা। এ সম্পর্কের কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। কারণ, ইমাম হোসাইন (আ.) সেখানে আসার অনেক আগ থেকেই জায়গাটি ‘কারবালা’ হিসাবে পরিচিত ছিলো।

শাহাদাত ও জনপ্রিয়তা

কারবালা প্রথমে একটি বসতিহীন জায়গা ছিলো এবং সেখানে নির্মিত কোনো কিছু ছিলো না যদিও যথেষ্ট পানি ও উর্বর জমি ছিল।

৬১ হিজরীর ১০ মুহররম ইমাম হোসাইন (আ.) - এর শাহাদাতের পর এর নিকটে বসবাসকারী গোত্রগুলো এবং দূরের মানুষ ইমামের পবিত্র কবর যিয়ারতের জন্য এখানে আসতে থাকে। এদের মধ্যে অনেকেই এখানে থেকে যায় এবং অনেকে আত্মীয়- স্বজনদের অনুরোধ করে যেন তারা তাদের মৃত্যুর পর তাদেরকে কারবালায় দাফন করে।

আব্বাসী শাসক হারুনুর রশীদ ও মুতাওয়াক্কিল প্রমুখ একের পর এক এ এলাকার উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। তারপরও জায়গাটি শহরে পরিণত হয়েছে।

ইমাম হোসাইন (আ.) - এর কবর যিয়ারতের পুরস্কার

হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) - এর কবর যিয়ারতে বিরাট আত্মিক কল্যাণ রয়েছে। নবী করীম (সা.) তার নাতি ইমাম হোসাইন (আ.) সম্পর্কে বলেছেন, 'হোসাইন আমা থেকে এবং আমি হোসাইন থেকে।' বেশ কিছু বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ইমাম হোসাইন (আ.) - এর কবর যিয়ারত করলে পৃথিবীর এবং মৃত্যুর পরের দুঃখ কষ্ট থেকে মানুষ মুক্তি লাভ করে। তাই পৃথিবীর সব জায়গা থেকে মুসলমানরা সারা বছর ইমাম হোসাইন (আ.) - এর মাযার যিয়ারতের জন্য কারবালা আগমন করে, বিশেষ করে মুহররমের প্রথম দশ দিন এবং ২০ সফর তার শাহাদাতের চল্লিশতম দিনে।

ইরাকীদের একটি সাধারণ ঐতিহ্য হচ্ছে মুহররমে নাজাফ থেকে কারবালায় হেটে আসা যা তাদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সাথে মজবুত বন্ধনেরই প্রতিফলন - যার জন্য ইমাম হোসাইন (আ.) সংগ্রাম এবং শাহাদাত বরণ করেছেন।

ইমাম হোসাইন (আ.) - এর রওযা

ঐতিহাসিক ইবনে কুলুওয়াইহ উল্লেখ করেছেন, যারা ইমাম হোসাইনকে কবর দিয়েছিল তারা তার কবরের ওপর চিহ্নসহ একটি আকর্ষণীয় ও মজবুত ভবন তৈরী করেছিলো। আরো উচু ও বড় ভবন তৈরী শুরু হয় প্রথম আব্বাসী খলীফা আবুল আব্বাস আস- সাফফার শাসনামলে। কিন্তু হারুনুর রশীদ ইমামের কবর যিযারতের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

খলিফা মামুনের সময় ইমামের কবরের ওপর রওযা নির্মাণ হয় এবং ২৩৬ হিজরী পর্যন্ত চলে। এরপর মুতাওয়াক্কিলের নির্দেশে ইমামের কবর ধ্বংস করা হয় এবং কবর খুড়ে এর গর্তকে পানি দিয়ে ভরে দেওয়া হয়। তারপর মুতাওয়াক্কিলের পুত্র তার উত্তরাধিকারী হিসাবে ক্ষমতা লাভ করে

জনগণকে কবর যিয়ারতের অনুমতি দিলে তখন থেকেই কবর এলাকায় নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজ ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে ঐতিহাসিক ইবনে আছীর বলেছেন যে, ৩৭১ হিজরীতে আযদুদ দাওলা আলে বুইয়া বিশাল আকারের নির্মাণ কাজের জন্য প্রথম এর ভিত্তি স্থাপন করেন এবং স্থানটিকে উদারভাবে সজ্জিত করেন। তিনি মাযার প্রাঙ্গণকে ঘিরে বাড়িঘর ও মার্কেট নির্মাণ করেন এবং কারবালোকে দেয়াল উচু দিয়ে ঘিরে দেন যা এটিকে একটি দুর্গে পরিণত করে।

৪০৭ হিজরীতে অলঙ্করণের কাঠের ওপরে দু'টি জ্বলন্ত মোমবাতি পড়ে যাবার কারণে মাযারা প্রাঙ্গণে আগুন ধরে যায়। মন্ত্রী হাসান ইবনে ফযল এ ক্ষতিগ্রস্থ অংশটি পুনঃনির্মাণ করেন।

ইতিহাসে বেশ কয়েকজন শাসকের নাম উল্লেখ রয়েছে যারা মাযার প্রাঙ্গণটি প্রশস্তকরণ, সৌন্দর্যবর্ধন এবং প্রাঙ্গণটিকে ভালো অবস্থায় রাখার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইরানের কাজার বংশীয় বাদশাহ ফাতহ আলী শাহ যিনি ১২৫০ হিজরীতে দু'টি গম্বুজ নির্মাণের আদেশ দেন; একটি ইমাম হোসাইন (আ.) ও অপরটি তার ভাই আবুল ফযল আব্বাসের কবরের ওপর। প্রথম গম্বুজটি ২৭ মিটার উচু এবং পুরোপুরি স্বর্ণ দিয়ে ঢাকা। নিচে ১২টি জানালা এটাকে ঘিরে আছে, ভেতরের দিকে যার একটি অপরটি থেকে ১.২৫ মিটার দূরে এবং বাইরে ১.৩ মিটার দূরে।

মাযারটির দৈর্ঘ্য ৭৫ মিটার এবং প্রস্থে ৫৯ মিটার। এর রয়েছে ১০টি দরজা ও ৬৫ কক্ষ (আইভান), যা ভেতর ও বাইরে চমৎকারভাবে সজ্জিত। এগুলো শ্রেণীকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ইমামের পবিত্র কবরের ওপর সৌধে রয়েছে বেশ কয়েকটি দরজা। সবচেয়ে বিখ্যাতটির নাম হচ্ছে 'আল- ক্বিবলা', অপর নাম 'বাবুয যাহাব' (স্বর্ণদ্বার)। এর ভেতরে ডান দিকে হাবীব ইবনে মাযাহের আল- আসাদীর কবর রয়েছে। হাবীব শিশুকাল থেকেই ইমাম হোসাইন (আ.) - এর একজন সাথী ছিলেন। তিনি কারবালায় শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা লাভকারীদের একজন।

হযরত আব্বাস (আ.) - এর কবর

আবুল ফযল আব্বাস (আ.) ছিলেন ইমাম হোসাইন (আ.) - এর সৎ ভাই। তিনি কারবালার রণাঙ্গনে ইমামের পতাকাবাহী ছিলেন। তিনি তার সাহসিকতা ও আনুগত্যের জন্য বিখ্যাত, যেমন ছিলেন তার পিতা শেরে খোদা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)।

হযরত আব্বাসের কবর ইমাম হোসাইন (আ.) - এর কবরের মতোই বিশেষ যত্ন লাভ করেছে। ১০৩২ হিজরীতে শাহ তাহমাসেব তার কবরের গম্বুজটির সৌন্দর্য বর্ধনের আদেশ দেন। তিনি কবরের সমাধিগাত্রে একটি জানালা নির্মাণ করেন এবং প্রাঙ্গণটিকে সুবিন্যস্ত করেন। এ ধরনের আরো কিছু কাজ অন্যান্য শাসকরাও করেছেন।

কারবালা ইমাম হোসাইন (আ.) ও তার ভাইয়ের কবরই শুধু বক্ষে ধারণ করেনি, ধারণ করেছে কারবালার ৭২ শহীদের সকলেরই কবর। তাদের একটি গণকবরে দাফন করা হয় যা মাটি দিয়ে পূর্ণ করে সমতল পর্যায়ে আনা হয়। এ গণকবরটি ইমাম হোসাইন (আ.) - এর পায়ের কাছে অবস্থিত। ইমাম হোসাইন (আ.) - এর পাশেই রয়েছে তার দুই ছেলে আলী আকবর ও ছ'মাসের শিশু আলী আসগারের কবর।

ইমাম হোসাইন (আ.) - এর মাযার উন্নয়নের ধারাবাহিক ইতিহাস

৬১ হিজরী ০১ আগস্ট ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে : ইমাম হোসাইন (আ.) - কে এ পবিত্র স্থানে সমাহিত করা হয়।

৬৫ হিজরীর ১৮ আগস্ট ৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে : মুখতার ইবনে আবু উবাইদা সাকাফী ইমামের কবরের চারদিকে একটি দেয়াল নির্মাণ করেন। তা দেখতে ছিল মসজিদের মতো এবং কবরের ওপরে একটি গম্বুজ তৈরী করা হয়। এতে প্রবেশের দু'টি পথ ছিলো।

১৩২ হিজরী ১২ আগস্ট ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে : এ মসজিদের আংশিক ছাদ তৈরী করা হয় এবং প্রথম আব্বাসী খলীফা আল আব্বাস আস- সাফফার শাসনামলে আরো দু'টি প্রবেশপথ তৈরী করা হয়।

১৪০ হিজরী ৩১ মার্চ ৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে : খলিফা মানসুরের শাসনামলে এর ছাদ ধ্বংস করা হয়।

১৫৮ হিজরী ১১ নভেম্বর ৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে : খলিফা মাহ্দীর শাসনামলে ছাদ পুনরায় নির্মাণ করা হয়।

১৭১ হিজরী ২২ জুন ৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে : হারুনুর রশীদের শাসনামলে গম্বুজ ও ছাদটি ধ্বংস করা হয়।

১৯৩ হিজরী ২৫ অক্টেবর ৮০৮ খ্রিস্টাব্দে : আমিনের শাসনামলে ভবনটি পুনঃনির্মাণ করা হয়।

২৩৬ হিজরী ১৫ জুলাই ৮৫০ খ্রিস্টাব্দে : মুতাওয়াক্কিলের আদেশে ভবনটি ধ্বংস করে ফেলা হয় এবং সেখানকার জমিতে চাষাবাদের আদেশ দেয়া হয়।

২৪৭ হিজরী ১৭ মার্চ ৮৬১ খ্রিস্টাব্দে : মুনতাসির কবরের ওপর একটি ছাদ নির্মাণ করেন এবং যিয়ারতকারীদের জন্য চিহ্ন হিসাবে এর কাছে একটি লোহার স্তম্ভ নির্মাণ করেন।

২৭৩ হিজরী ৮ জুন ৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে : ছাদটি আবার ধ্বংস করে ফেলা হয়।

২৮০ হিজরী ২৩ মার্চ ৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে : আলাভীদের প্রতিনিধি এর মাঝখানে একটি গম্বুজ নির্মাণ করেন এবং দু'পাশে দু'টি ছাদসহ আরো দু'টি প্রবেশপথসমেত একটি দেয়াল তৈরী করেন।

৩০৭ হিজরী ১৯ আগষ্ট ৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে : 'আযদ ইবনে বুইয়া গম্বুজটি ও সীমানা প্রাচীর পুনঃনির্মাণ করেন এবং সমাধির চারদিকে একটি সেগুন কাঠের ঘর তৈরী করে দেন। তিনি মাযারের চারদিকে ঘর তৈরী করেন এবং শহরের সীমানা প্রাচীর তৈরী করেন। একই সময়ে ইমরান ইবনে শাহীন রওযার পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

৪০৭ হিজরী ১০ জুন ১০১৬ খ্রিস্টাব্দে : স্থাপনাগুলো আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রধানমন্ত্রী হাসান ইবনে ফযল সেগুলো পুনঃনির্মাণ করেন।

৬২০ হিজরী ৪ ফেব্রুয়ারী ১২২৩ খ্রিস্টাব্দে : নাসির লেদীনিল্লাহ রওযার আবরণসমূহ পুনঃনির্মাণ করেন।

৭৫৭ হিজরী ১৮ সেপ্টেম্বর ১৩৬৫ খ্রিস্টাব্দে : সুলতান ওয়াইস ইবনে হাসান জালাইবী গম্বুজটিকে নতুন আকার দান করেন এবং সীমানা প্রাচীরকে আরো উচু করেন।

৭৮০ হিজরী ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে : আহমাদ ইবনে ওয়াইস দু'টি স্বর্ণে ঢাকা মিনার নির্মাণ করেন এবং প্রাঙ্গণকে আরো বড় করেন।

১০৩২ হিজরী ৫ নভেম্বর ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে : শাহ আব্বাস সাফাভী কবরের চারদিকে তামা ও ব্রোঞ্জের রেলিং তৈরী করেন এবং গম্বুজকে টাইল্স দিয়ে সজ্জিত করেন।

১০৪৮ হিজরী ১৫ মে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে : সুলতান চতুর্থ মুরাদ রওযা মোবারক যিয়ারত করেন এবং গম্বুজকে সাদা রং করেন।

১১৫৫ হিজরী ৮ মার্চ ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে : নাদির শাহ রওযা মোবারক যিয়ারতে যান এবং এই ভবনের সৌন্দর্য বর্ধন করেন। তিনি মাযারের কোষাগারে মূল্যবান উপহার জমা দেন।

১২১১ হিজরী ৭ জুলাই ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে : শাহ অগা মোহাম্মদ খান কাজার মাযারের গম্বুজটি সোনা দিয়ে ঢেকে দেন।

১২১৬ হিজরী ১৪ মে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে : ওয়াহাবীরা কারবালা আক্রমণ করে মাযারের রেলিং ও হলকক্ষ নষ্ট করে দেয় এবং মাযার লুট করে।

১২৩২ হিজরী ২১ নভেম্বর ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে : ফাতহ আলী শাহ কাজার মাযারের রেলিং মেরামত করেন এবং তা রূপা দিয়ে ঢেকে দেন। তিনি হলকক্ষের কেন্দ্রও সোনা দিয়ে ঢেকে দেন এবং ওয়াহাবী লুটেরাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ অংশগুলো মেরামত করেন।

১২৮৩ হিজরী ১৬ মে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে : নাসিরুদ্দীন শাহ কাজার মাযারের প্রাঙ্গণে বড় করেন।

১৩৫৮ হিজরী ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে : ড. সাইয়্যেদ তাহের সাইফুদ্দীন 'দাউদী বোহরা' সম্প্রদায়ের ৫১তম দা'ঈউল- মুতলাক এক সেট রূপার রেলিং উপহার দেন যা রওযায় স্থাপন করা হয়।

১৩৬০ হিজরী ২৯ জানুয়ারী ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে : ডা. সাইয়্যেদ তাহের সাইফুদ্দীন পশ্চিমের মিনারটি পুনঃনির্মাণ করেন।

১৩৬৭ হিজরী ২০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে : কারবালার প্রশাসক সাইয়্যেদ আবদুর রাসূল খালাসী মাযারকে ঘিরে একটি রাস্তা নির্মাণ এবং মাযার প্রাঙ্গণকে আরো প্রশস্ত করার জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে মাযারের নিকটবর্তী বাড়িগুলো কিনে নেন।

আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদে প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের সৎ প্রচেষ্টাগুলো দীর্ঘস্থায়ী করেন এবং আমাদের তার দয়া ও হেফাজত লাভের তাওফীক দান করেন। তিনি তো শানেন এবং জবাবও দেন।

(সূত্র: ইন্টারনেট)

অনুবাদ :মুহাম্মদ ইরফানুল হক

বরেণ্য ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে আশুরা

মহাত্মা গান্ধী

(ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা)

‘আমি ইমাম হোসাইন তথা ইসলামের এ মহান শহীদের জীবনী মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি এবং কারবালার পৃষ্ঠাগুলোর প্রতি অধিক মনোনিবেশ করেছি। আমার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, ভারত যদি একটি বিজয়ী রাষ্ট্র হতে চায় তাহলে ইমাম হোসাইনের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।’

মুহাম্মদ আলী জিন্দাহ

(পাকিস্তানের জনক)

‘ইমাম হোসাইন (আ.) ত্যাগ দুঃসাহসের যে পরিচয় দিয়েছেন তার চেয়ে সাহসিকতার উৎকৃষ্ট নজির বিশ্বে দ্বিতীয়টি নেই। আমার মতে, সকল মুসলমানের উচিত ইরাকের মাটিতে আত্মোৎসর্গকারী এ শহীদের আদর্শকে অনুসরণ করা।’

চার্লস ডিকেন্স

(ইংল্যান্ডের বিখ্যাত লেখক)

‘যদি ইমাম হোসাইন - এর উদ্দেশ্য পার্থিব কামনা- বাসনা চরিতার্থ করার জন্য যুদ্ধ করা হতো তাহলে আমি বুঝতে পারতাম না যে, কেনো তার বোন, স্ত্রী এবং শিশুরা তার সঙ্গে ছিলেন। অতএব, বুদ্ধিবৃত্তি নির্দেশ করে যে, তিনি শুধু ইসলামের খাতিরেই ত্যাগ স্বীকার করেছেন।’

টমাস কার্লাইল

(ইংরেজ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক (

কারবালা ট্রাজেডি থেকে আমরা সর্বোত্তম যে শিক্ষা গ্রহণ করি সেটা হলো এই যে, ইমাম হোসাইন এবং তার সঙ্গীরা আল্লাহর প্রতি মজবুত ঈমান পোষণ করতেন। তারা তাদের কর্ম দ্বারা স্পষ্ট করেছেন যে, যেখানে হক ও বাতিলের মুখোমুখি হওয়ার প্রশ্ন দেখা দেয় সেখানে সংখ্যার আধিক্য কোনো বিচার্য বিষয় নয়। আর ইমাম হোসাইন মুষ্টিমেয় কয়েক জনকে নিয়ে যে বিজয় লাভ করেছেন তা আমার মধ্যে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে।'

অ্যাডওয়ার্ড ব্রাউন

(বিখ্যাত ইংরেজ প্রাচ্যবিদ)

এমন কোনো অন্তর পাওয়া যাবে কি যে, যখন কারবালা সম্পর্কে বক্তব্য শোনে তখন দুঃখ ও বেদনাহত হয় না? এমনকি কোনো অমুসলিমও এই ইসলামী যুদ্ধকে ও তার পতাকাতলে যে আত্মিক পবিত্রতা সাধিত হয়েছে তা অস্বীকার করতে পারে না।'

ফ্রেড্রিক জেমস

(বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক)

ইমাম হোসাইন ও অপরাপর বীর শহীদের শিক্ষা হলো এটাই যে, দুনিয়ায় চিরন্তন করুণা এবং মমতার মূলনীতি বিদ্যমান যা অপরিবর্তনীয়। অনুরূপভাবে প্রতিপন্ন করে যে, যখন কেউ এ গুণসমূহের জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এবং এ পথে অবিচলতা প্রদর্শন করবে তখন উক্ত মূলনীতিসমূহ দুনিয়ায় চিরন্তন ও চিরস্থায়ী থাকবে।'

ওয়াশিংটন আর্ভিং

(বিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক)

‘ইমাম হোসাইনের জন্য ইয়াযীদের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করে জীবন রক্ষা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু ইমামের নেতৃত্ব ও আন্দোলনমুখী দায়িত্বভার তাকে ইয়াযীদকে খলিফা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের অনুমতি প্রদান করেনি। তিনি বনী উমাইয়্যার কবল থেকে ইসলামকে মুক্ত করার জন্য অচিরেই যে কোন কষ্ট ও নিপীড়নকে বরণ করে নেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। শুষ্ক মরু প্রান্তরের সূচালো সূর্য তাপের নিচে এবং আরবের উত্তপ্ত বালুরাশির মাঝে হোসাইন - এর আত্মা অবিনশ্বর হয়ে আছে।’

টমাস মাসারিক

(বিখ্যাত ইংরেজ লেখক)

‘যদিও আমাদের পাদ্রীরাও হযরত মসীহর শোকগাথা বর্ণনা দ্বারা লোকদেরকে প্রভাবিত করেন, কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.) - এর অনুসারীদের মধ্যে যে আবেগ ও উচ্ছাস দেখা যায় তা হযরত মসীহর অনুসারীদের মাঝে পাওয়া যাবে না। আর এর কারণ মনে হয় এটাই যে, ইমাম হোসাইন - এর শোকের বিপরীতে হযরত মসীর শোক যেন বিশালদেহী এক পর্বতের সামনে ক্ষুদ্র একটা খড়কুটোসম।

মরিস ডু কিবরী

(বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ও পর্যটক)

‘ইমাম হোসাইন –এর শোক মজলিসে বলা হয় যে, তিনি মানুষের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইসলামের উচ্চ মহিমাকে সমুন্নত রাখার জন্য জান, মাল এবং সন্তানদেরকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি ইয়াযীদের সাম্রাজ্যবাদ ও ছল- চাতুরিকে মেনে নেননি। সুতরাং আসুন, আমরাও তার এ পন্থাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি এবং সাম্রাজ্যবাদীদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হই। আর সম্মানের মৃত্যুকে অবমাননার জীবনের ওপরে প্রাধান্য দেই।’

মরবীন

(জার্মান প্রাচ্যবিদ)

'ইমাম হোসাইন প্রিয়তম স্বজনদেরকে উৎসর্গ করা এবং স্বীয় অসহায় ও সত্য পন্থাকে প্রমাণিত করার মাধ্যমে দুনিয়াকে ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের শিক্ষা দিয়েছেন এবং ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের নামকে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর বিশ্বে একে উচ্চকণ্ঠী করেছেন। ইসলামী জগতের এ সাহসী সেনা দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, অত্যাচার, অবিচার ও নিপীড়ন স্থায়ী নয়। আর অত্যাচারের ভিত্তি বাহ্যত যতই মজবুত হোক না কেনো, সত্যের বিপরীতে তা বাতাসে উড়ন্ত খড়কুটোর ন্যায়।'

বিনতুশ শাতী

(মিশরীয় লেখক)

'ইমাম হোসাইন (আ.) - এর ভগ্নী হযরত যায়নাব ইবনে যিয়াদ ও বনী উমাইয়্যার জন্য তাদের বিজয়ের স্বাদকে বিস্বাদ করে দেন এবং তাদের বিজয়ের পান - পেয়ালায় বিষের ফোটা ফেলে দেন। আশুরা পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলী, যেমন মুখতার ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের বিদ্রোহ এবং উমাইয়্যা শাসনের পতন ও আব্বাসীদের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং শিয়া মাজহাবের শিকড় গাড়তে কারবালার বীরাঙ্গনা নারী হযরত যায়নাব অনুপ্রেরণাদায়ক অবদান রাখেন।

লিয়াকত আলী খান

(পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী)

'সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের জন্য মুহররমের এ দিনটির বড় অর্থ রয়েছে। এ দিনে ইসলামের সবচেয়ে দুঃখজনক ও ট্রাজেডিপূর্ণ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। ইমাম হোসাইন (আ.) - এর শাহাদাত দুঃখময় হওয়ার পাশাপাশি ইসলামের প্রকৃত আত্মার পরম বিজয় ছিল। কেননা, এটা ঐশ্বরিক ইচ্ছার প্রতি নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণ বলে পরিগণিত হতো। এ শিক্ষা আমাদেরকে শেখায় যে, সমস্যা

ও বিপদসমূহ যেমনই হোক না কেনো সেগুলোর পরোয়া করা উচিত নয় এবং সত্য ও ন্যায় থেকে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়।'

জর্জ জুরদাক

(খ্রিষ্টান পন্ডিত ও সাহিত্যিক)

'ইয়াযীদ যখন ইমাম হোসাইনকে হত্যার জন্য জনগণকে উৎসাহিত্ করতো এবং রক্তপাত ঘটাতে নির্দেশ প্রদান করতো তখন তারা বলতো, কত টাকা দেবেন? কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.) - এর সঙ্গীরা তাকে বলতেন, আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আমাদেরকে যদি সত্তর বার হত্যা করা হয় তাহলে পুনর্বার আপনার পক্ষে যুদ্ধ করতে এবং নিহত হতে চাইবো।'

আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ

(মিশরীয় লেখক ও সাহিত্যিক)

'ইমাম হোসাইন (আ.) - এর আন্দোলন দীনী দাওয়াত কিংবা রাজনৈতিক আন্দোলন সমূহের অঙ্গনে এ পর্যন্ত সংঘটিত আন্দোলন সমূহের মধ্যে একটি নজিরবিহীন ঐতিহাসিক আন্দোলন। এ আন্দোলনের পর উমাইয়্যা সরকার একজন মানুষের স্বাভাবিক আয়ুষ্কালের পরিমাণেও টেকেনি। ইমাম হোসাইন (আ.) - এর শাহাদাত থেকে তাদের পতন হওয়ার সময় কাল ছিল ৬০ বছরের সামান্য কিছু বেশি।'

আহমাদ মাহমুদ সুবহী

(মিশরীয় ইতিহাসবিদ)

'যদিও হোসাইন ইবনে আলী (আ.) সামরিক কিংবা রাজনৈতিক অঙ্গনে পরাজিত হন, কিন্তু ইতিহাস এমন কোনো পরাজয়ের সন্ধান রাখে না, যা ইমাম হোসাইন (আ.) - এর রক্তের ন্যায় বিজিতদের অনুকূলে এসে থাকবে। ইমাম হোসাইন (আ.) - এর রক্ত ইবনে যুবাইরের বিপ্লব এবং

মুখতারের বিদ্রোহ ও অন্যান্য আন্দোলনের জন্ম দেয়। অবস্থা এতদূর গড়ায় যে, উমাইয়্যা শাসনের পতন ঘটে। আর হোসাইন (আ.) - এর রক্তের বদলা গ্রহণের স্লোগান এমন মুখরিত হয়ে ওঠে যে, ঐসব মসনদ ও হুকুমত কাপতে শুরু করে।’

অ্যান্টন বারা

(খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী গবেষক)

‘যদি হোসাইন (আ.) আমাদের থেকে হতেন তাহলে প্রত্যেক দেশেই তার জন্য পতাকা উড়াতাম এবং প্রত্যেক গ্রামেই তার জন্য মিম্বার স্থাপন করতাম। আর মানুষকে হোসাইন (আ.) - এর নামে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি আহবান জানাতাম।’

নিকলসন

(প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ)

‘বনী উমাইয়্যা ছিল অবাধ্য ও স্বৈরাচারী। ইসলামের বিধি- বিধানকে তারা উপেক্ষা করেছে এবং মুসলমানদেরকে লাঞ্ছিত করেছে। আমরা যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখবো, দীন আনুষ্ঠানিকতাসর্বশ্ব শাহানশাহীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং দীনী শাসন শাহী শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছে। এ কারনে ইতিহাস ন্যায্যত নির্দেশ করে যে, হোসাইন (আ.) - এর রক্তের দায় বনী উমাইয়্যার ওপরে।’

স্যার পর্সী সায়েক্স

(ইংরেজ প্রাচ্যবিদ)

‘সত্যিকার অর্থে এ মুষ্টিমেয় কয়েকজন যে সাহস ও বীরত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তা এমন উচ্চমানের ছিল যে, এই দীর্ঘ শতাব্দীকাল ধরে যারাই এ ব্যাপারে শুনেছে মনের অজান্তেই

প্রশংসায় মুখ খুলেছে। হাতে গোনা এ কয়েকজন সাহসী পুরুষ কারবালার প্রতিরক্ষাকারীদের ন্যায় নিজেদের সমুন্নত নামকে চিরকালের জন্য অক্ষয় করে রেখেছেন।’

থমলাস ট্যান্ডাল

(ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সাবেক চেয়ারম্যান)

‘ইমাম হোসাইন –এর শাহাদাতের ন্যায় এসব উন্নত আত্মত্যাগ মানবের চিন্তার স্তরকে উৎকর্ষ দান করেছে এবং এর স্মৃতি চিরকাল অম্লান থাকাই সমুচিত।’

মুহাম্মদ জগলুল পাশা

(মিশরের সাবেক রাজনৈতিক নেতা)

‘ইমাম হোসাইন (আ.) এ কাজের দ্বারা স্বীয় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ফরয পালন করেছেন। এ ধরনের শোক মজলিসসমূহ মানুষের মধ্যে শাহাদাতের মানসিকতা গড়ে তোলে এবং সত্যও ন্যায়ের পথে তাদের অভিপ্রায়কে বলীয়ান করে।’

আবদুর রহমান শারকাভী

(মিশরীয় লেখক)

‘হোসাইন (আ.) হলেন ধর্ম ও স্বাধীনতার পথে শহীদ। কেবল শিয়ারাই হোসাইন (আ.) - এর নামে গর্ববোধ করবে তা নয়, বরং দুনিয়ার সকল স্বাধীন মানুষেরই উচিত এ মর্যাদাপূর্ণ নামের অহংকার করা।’

ত্বহা হোসাইন

(মিশরীয় পণ্ডিত ও সাহিত্যিক)

‘হোসাইন (আ.) সুযোগ সৃষ্টির জন্য এবং জিহাদকে পুনরারম্ভ করা, আর তার পিতা যে স্থানে তা রেখে গিয়েছিলেন সেখান থেকে অব্যাহত রাখার জন্য আকাঙ্ক্ষার আগুনে পুড়তেন। তিনি মু'আবিয়া ও তার আমলাদের ব্যাপারে মুখ খোলেন এমনভাবে যে, মু'আবিয়া তাকে হুমকি দেন। ইমাম হোসাইন (আ.) তার দলকে বাধ্য করেন সত্য পাক্ষাবলম্বনে কঠিন হতে।’

আবদুল মজিদ জাওদাহু আল- সাহাহার

(মিশরীয় লেখক)

‘হোসাইন (আ.) ইয়াযীদের হাতে বাইআত করতে পারতেন না এবং তার শাসনের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করতে পারতেন না। কারণ, তাহলে অনাচার, ব্যভিচারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হতো এবং তা অন্যায় ও বিদ্রোহের ভিতকে মজবুত করতো। আর বাতিল শাসনকে গ্রহণীয় করে তুলতো। ইমাম হোসাইন (আ.) এসব কাজে রাজি হতেন না, যদিও তার পরিবার- পরিজন বন্দিত্ব বরণ করে, আর তিনি ও তার সঙ্গীরা নিহত হন।’

আল্লামা তানতাভী

(মিশরীয় পণ্ডিত)

‘হোসাইনী কাহিনী স্বাধীনচেতাদেরকে আল্লাহর রাহে আত্মোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর মৃত্যুকে বরণ করে নেয়াকে সর্বোত্তম কামনা হিসাবে গণ্য করায়। তখন প্রাণোৎসর্গের স্থলে ছুটে যাওয়ার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় নামে।’

আল- উবায়দী

(মুসেলের মুফতি)

‘কারবালা বিপর্যয় মানবেতিহাসে এক বিরল ঘটনা। হোসাইন ইবনে আলী (আ.) মহান আল্লাহর নির্দেশমতে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর ভাষ্যমতে মজলুমের অধিকার রক্ষা এবং সাধারণের স্বার্থ

সংরক্ষণকে স্বীয় কর্তব্য হিসাবে গণ্য করেন। আর এক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণে তিনি কোনো শৈথিল্য দেখাননি। ঐ মহান কুরবানিস্থলে তিনি স্বীয় অস্তিত্বকে উৎসর্গ করেন এবং এ কারণে মহান প্রতিপালকের নিকট 'শহীদ সাম্রাট' হিসাবে পরিগণিত হন। আর যুগ-যুগান্তরে তিনি 'সংস্কারকামীদের নেতা' হিসাবে গণ্য হন। তিনি যা চেয়েছিলেন বরং তার চেয়ে অধিক কিছু জয় করেছিলেন।'

ফার্সি থেকে অনুবাদ :আবদুল কুদ্দুস বাদশা

ইমাম হোসাইন (আ.) - এর

শাহাদাত ও আশুরা সম্পর্কে বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য

‘হযরত ইমাম হোসাইন সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য শহীদ হয়ে অকল্যাণ থেকে মুসলমানদের মুক্ত করে তাদের নাজাত এনেছিলেন। এদিন তাই মুসলমানদের জন্য আত্ম জিজ্ঞাসার দিন এবং একটি মহিমার মধ্যে ইসলামকে নতুন করে আবিস্কার করার দিন।’

সৈয়দ আলী আহসান

সাবেক জাতীয় অধ্যাপক

‘ইমাম হোসাইনের জীবনাদর্শ, তার দর্শন, তার আত্মোৎসর্গের কাহিনী আমরা প্রতি বছরই আশুরার দিনে স্মরণ করে থাকি। কিন্তু আসলে সমগ্র মুসলিম জাতি এ মহান ব্যক্তির আত্মোৎসর্গের ফলেই একটা সঠিক দিক নির্দেশনা পেয়েছিলো। স্বার্থসিদ্ধি, অর্থ সম্পদ বা পার্থিব ভোগ- বিলাস তথা প্রলোভন দেখিয়ে ছিল ইয়াযীদ। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে আল্লাহর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে নিজ জীবনকে উৎসর্গ করেন তার আদর্শের জন্য, ধর্মের জন্য, ইসলামের গৌরবের জন্য।’

প্রফেসর এম শামশুল হক

সাবেক উপদেষ্টা

‘ইমাম হোসাইন (আ.) অজস্র খোদাপ্রেমিকের অন্তরে ঈমান ও ইসলামকে জারি রেখেছেন। কারবালায় শাহাদাতের মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রকৃত সংরক্ষকের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন। ইমাম হোসাইন (আ.) দীর্ঘজীবী হোন আমাদের অন্তর ও চেতনায়।’

প্রফেসর ড.মুইন উদ্দিন আহমদ খান

সাবেক উপাচার্য, সাউথইষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

খোরাফায়ে রাশেদীনের পর যে মর্মান্তিক ঘটনা ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে তা হলো হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) - এর শাহাদাতের ঘটনা। তার এ শাহাদাত পৃথিবীর মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত উজ্জ্বল আদর্শ ও দিক - নির্দেশনা হয়ে থাকবে। অন্যায়ের সামনে মাথা নত না করা এবং জীবন দিয়ে হলে ও এর প্রতিবাদ করা মুমিনের কর্তব্য। ঈমান আর অন্যায়ের সাথে আপস, এ দুই স্বভাব একজন মুমিনের মধ্যে থাকতে পারেনা এ সত্য তিনি তার পবিত্র রক্তের ভাষায় পৃথিবীর মানুষের জন্য লিখে গেছেন।

পৃথিবীতে সকল যুগেই ইয়াযীদ থাকবে, ইবনে যিয়াদও থাকবে। তাদের হাতে আল্লাহর দীন নিরাপদ থাকবে না। রাজনৈতিক কৌশল অথবা জোর করে ক্ষমতা দখল করলেই তাকে মেনে নেয়া যায় না। এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয। তার সে স্মরণীয় বাণী 'জালেমের সাথে সহাবস্থান করে জীবিত থাকার একটি মহাপাপ।' তিনি দেখিয়েছেন মুমিনের জীবনে সর্বোত্তম কামনা শাহাদাত। এখানেই জীবনের সফলতা। আর জান্নাতে যাওয়ার এটাই হলো সঠিক পথ। হে আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মাদ (সা.) ও তার বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ কর, যেভাবে ইবরাহীম (আ.) ও তার বংশধরদের ওপর রহমত করেছিলে।

মাওলানা মুহাম্মদ মুহিববুল্লাহ

পীর সাহেব, খানকায়ে বশিরিয়া, ভোলা।

'আশুরার সংস্কৃতির পুনর্জীবনে হযরত ইমাম হোসাইনের নেতৃত্ব্ আলী আকবর, আলী আসগার ও অন্যান্য শহীদ যে আদর্শ রেখে গেছেন তা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানকে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাহাড়ের ন্যায় অটল থাকতে অনুপ্রাণিত করবে। অপরাধের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, মহাবিপদে ধৈর্য ধারণ করে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া, তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ, খোদার বিধানকে সমুন্নত রাখতে জীবন কুরবান করতে প্রস্তুত থাকা এবং অকুতোভয়ে খোদাদ্রোহী শক্তিকে পরাভূত করার যে সংস্কৃতি আশুরার

ঘটনা প্রবাহে নিহিত তার পুনর্জীবন ঘটেছে কারবালার শহীদগণের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) ইচ্ছে করলে ইয়াযীদের আনুগত্য স্বীকার করে পার্থিব বিত্ত-বৈভেবের, মধ্যে থেকে বিলাসী জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু আহলে বাইতের একজন মরদে মুজাহিদ হয়ে তিনি তা করতে যাননি, বরং খোদা ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি বিধানের মহান লক্ষ্যে তিনি পার্থিব জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের শিকড় উপড়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর হয়ে জীবন দান করেছেন। শাহাদাতের পূর্ণ পেয়ালা পান করে হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) - সহ কারবালার শহীদগণ যুগে যুগে আশুরা সংস্কৃতির পুনর্জীবন ও বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত করতে থাকবেন এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।'

ড. এ.কে. এম. ইয়াকুব আলী

সাবেক অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

'কারবালার ঘটনায় ইয়াযীদ বাহিনীর বাহ্যিক বিজয় ঘটলেও আসলে তা ছিল ইমাম হোসাইনের বিজয়। কারবালার দুঃখজনক ঘটনা আমাদের জন্য সাফল্যের চাবিকাঠি। এ দিন সত্যের জয় হয়েছে, মিথ্যা অপসারিত হয়েছে। আমাদের স্কুল- কলেজের পাঠ্যসূচিতে ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের শিক্ষা ও কারবালার ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।'

সৈয়দ আশরাফ আলী

সাবেক মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন

'বিলাসিতার জীবন গ্রহণ না করে শাহাদাতের জীবন অবলম্বন করে ইমাম হোসাইন (আ.) এটাই প্রমাণ করেছেন যে, তিনি যথার্থ অর্থেই আহলে বাইতের ইমাম ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত ইসমাইল (আ.) –কে কুরবানি করে একা একটি প্রতীক হয়েছিলেন, কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.) পুরো পরিবার- পরিজন নিয়ে আত্মোৎসর্গ করে একটি গোটা জাতির প্রতীকে পরিণত হয়েছেন।'

অধ্যাপক আ.ন.ম.আবদুল মান্নান খান

সাবেক অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

‘কারবালা প্রান্তরে মাত্র ৭২ জন সাথী নিয়ে ইমাম হোসাইন (আ.) - এর শাহাদাত বরণ ইসলামী ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ইসলামের জন্য নবী দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (আ.) - এর শাহাদাত বরণ মানব ইতিহাসে চিরঞ্জীব ও চিরজাগরুক। তিনি ইসলামের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকার করে প্রকৃতপক্ষে ইসলামকেই গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য এক জীবন্ত আদর্শ হিসাবে রেখে গেছেন। ইমাম হোসাইনের আপসহীন ভূমিকাই মুসলিম উম্মাহকে যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে আসছে। ইমাম হোসাইন (আ.) প্রমাণ করে গেছেন হকের জন্য জান দেয়া সম্ভব তবুও তাগুতি শক্তির সাথে আপস করা সম্ভব নয়।’

হাফেজ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

আমীর, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন

‘ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তো বটেই, এমনকি সাধারণ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও কারবালার ঘটনা পৃথিবীর সবচেয়ে বিয়োগান্ত ঘটনা, নিষ্ঠুর ও পাশবিক। এ ঘটনাই মূল নায়ক হযরত ইমাম হোসাইন (আ.)। তার সুউচ্চ মর্যাদা সম্বন্ধে স্বয়ং বিশ্বনবী (সা.) বলেছেন যে, তিনি হচ্ছেন চিরাস্থায়ী জগতের চিরকালীন শান্তি, সফলতা ও কল্যাণের স্থান জান্নাতে সব যুবকের সর্দার। ইমাম হোসাইন (আ.) ছিলেন তার নানাজীর আদর্শের নিশানবর্দার। কোনো ভীতি বা প্রলোভন তাকে ইসলামের মহান আদর্শ থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত করতে পারেনি। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে তার এ আপসহীন, প্রশ্নাতীত ও সামগ্রিক আত্মত্যাগ কেয়ামত পর্যন্ত সত্যকামী মানুষের জন্য অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।’

অধ্যাপক ড.আনিসুজ্জামান

দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

‘কারবালার দু’পীঠ আছে। একটি আলোকময় আর একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইমাম হোসাইন (আ.) সত্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য সাথিগণসহ কারবালার প্রান্তরে শহীদ হয়েছেন। এটি আলোকময় দিক। ইয়াযীদের দল সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে ক্ষণিকের জন্য বাহ্যিকভাবে বিজয়ী হলেও এ দিকটি হলো অন্ধকারাচ্ছন্ন। সারা বিশ্বের মানুষ তাদের ঘৃণার সাথে স্মরণ এবং অভিসম্পাত করে। ইমাম হোসাইন ও তার সাথিগণকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। ইমাম হোসাইন (আ.) শাহাদাতের পর আরও বেশি জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। ইয়াযীদের দল তাকে শহীদ করে ভেবেছিল সব কিছু মিটে গেল। কিন্তু জীবিত হোসাইন হতে মৃত হোসাইন আরও বেশি মারাত্মক হয়ে তাদের পতনকে আর ত্বরান্বিত করে দিয়েছেন। অনুভূতিসম্পন্ন প্রতিটি মানবের মণিকোঠায় তিনি জীবন্ত থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার উদ্যম যোগাচ্ছেন। তার বোন হযরত যায়নাব (আ.) সত্যিই বলেছেন- ‘তোমরা আমার ভাইকে হত্যা করতে পারবে না। ’ইমাম হোসাইন (আ.) - এর শাহাদাতের ফলে ইয়াযিদী ইসলামের বিরুদ্ধে মুহাম্মাদী ইসলামের আত্মিক ও বাস্তব উভয় প্রকার বিজয় সংঘটিত হয়েছিল। ইসলাম প্রচার যেমন প্রতিটি মুসলমানদের ওপর ফরয তদ্রূপ ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের স্মরণে শোকানুষ্ঠান পালন করাও প্রতিটি নবীপ্রেমিক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য।’

মাওলানা মোহাম্মদ কুতুবউদ্দীন হোসাইনী চিশতী

‘হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) হলেন মহানবী (সা.) - এর আহলে বাইতের এমন এব ব্যক্তিত্ব যিনি সরকারে দো- আলম আল্লাহর হাবীবের আদর ও শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন – যার জন্য বেহেশ্ত হতে খাবার ও পোশোক নাযিল হয়েছিল। যিনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের নির্ভীক সৈনিক। যার দুঃখে স্বয়ং মহান আল্লাহ ও তার প্রিয়নবী (সা.) ব্যথিত হন। খাঁটি মুহাম্মাদী ইসলামকে অবিকৃত ও সমুন্নত রাখতে, আল্লাহকে দেয়া নানা নবীজির প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে পৃথিবীতে মহানবীর এ সুগন্ধি ফুল, কলিজার টুকরা, বেহেশ্তের সর্দার ও হাউজে কাউছারের পানি বন্টনকারী ইমাম

সংগী- আত্মীয়স্বজনসহ ঐতিহাসিক কারবালার উত্তপ্ত মরু প্রান্তরে তিনদিনের ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত অবস্থায় শরীরে অসংখ্য আঘাত নিয়ে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। তার এই শাহাদাতের দু'টি দিক রয়েছে। একটি জাহিরী ও অন্যটি বাতিনী। জাহিরী দিক হলো- ইমাম হোসাইন (আ.) শহীদ হয়ে সত্য- মিথ্যার (হক ও বাতিলের) পার্থক্য নির্ণয় করে দিয়েছেন। মুহাম্মাদী ইসলাম ভোগের নয়, ত্যাগের – এক বাস্তব প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন। ইয়াজিদী নয়- হোসাইনী আদর্শকে সমুন্নত রেখে বাস্তবে রূপ দিতে না পারলে আমাদের মুসলমানিত্ব ইয়াযিদী মুসলমানিত্বে পরিণত হবে। আর তখন আমরা পাক- পাঞ্জাতনের নেকদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হব। তাই মহান আল্লাহর দরবারে এ প্রার্থনা করছি- হোসাইনী আদর্শ তথা মুহাম্মাদী আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আহলে বাইতের মুহাব্বাত বুকে নিয়ে যেন আমাদের মরণ হয়। এজন্য কেউ আমাকে শিয়া বা রাফিযী যা- ই বলুক না কেনো এতে আমার কোনো দুঃখ নেই। 'ইসলাম জিন্দা হোতা হায় হার কারবালা কি বাদ।'

গোলাম নবী হোসাইনী চিশতী

হোসাইনী দরবার শরিফ, সুলতানশী, হবিগঞ্জ

'মহানবী (সা.) - এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (আ.) সারা জীবন অসত্যের মোকাবিলায় সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি রাজতন্ত্রের পরিবর্তে খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য ইয়াযীদের শাসনের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে ছিলেন। তিনি একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আমি আশা করি আমরা সবাই ইমাম হোসাইন (আ.) - এর আদর্শ ও শিক্ষাকে অনুসরণ করবো।'

প্রফেসর মুহাম্মদ ইসলাম গনি

সাবেক অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা- ই- আলিয়া, ঢাকা

'আজকের মুসলিম বিশ্বের এই যে করুণ ও বেহাল অবস্থা, এর মূলে রয়েছে ইসলামবিহীন মুসলিম নেতৃত্ব, যার সুচনা হয়েছিল ইয়াযীদের হাতে। এরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলে ধরেছিলেন

হযরত ইমাম হোসাইন (আ.)। ইসলামী আদর্শের পথে ফিরে যাবার যে সংগ্রামে ইমাম হোসাইন কারবালায় চরম আত্মত্যাগ করেছিলেন, সে সংগ্রাম পর্যদস্ত হয়ে গেছে বলে যারা আত্মতুষ্টি লাভ করেছিল বিশ্বের সেই ইসলাম বিরোধী শক্তি এবং মুসলিম সমাজে আশীর্বাদপুষ্ট গোষ্ঠি পরবর্তীকালে আতংকের সাথে লক্ষ্য করে যে, ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের মাধ্যমে ইসলামের পতন ঘটার পরিবর্তে ইসলামের নব উত্থানের পথই প্রশস্ত হয়েছে। বর্তমান যুগে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর যে নবজাগরণ লক্ষ্য করা যাচ্চে, তাতে প্রমাণিত হয় কারবালায় ইমাম হোসাইনের রক্তদান ব্যর্থ হয়নি।'

অধ্যাপক আবদুল গফুর

ফিচার সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব

'মহান আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় হাবীবের নাতি, বেহেশতে যুবকদের সর্দার ইমাম হোসাইন (আ.) - এর তাজা খুনের বিনিময়ে কুরআন- সুন্নাহকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তাই যারা কুরআন- সুন্নাহর ধারক ও হকের পথে অবিচল ইমাম হোসাইন (আ.) ও কারবালার কথা শুনলেই তাদের চোখে পানি আসে। আর যারা মুনাফিক তারাই বিভিন্ন যুক্তি খাড়া করে কারবালার ঘটনাকে গুরুত্বহীন করার অপপ্রয়াস চালায়।

বিশ্বের যেখানেই ইসলামের জাগরণ ও বিপ্লবী আওয়াজ উঠেছে সেখানেই ইমাম হোসাইন (আ.)-এর তাজা খুন কথা বলেছে। আমরা যদি কুরআন- সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করতে চাই তাহলে প্রয়োজন ঘরে ঘরে ইমাম হোসাইন (আ.) ও কারবালার শহীদানের ইতিহাস তুলে ধরা এবং সপরিবারে ও সম্মিলিতভাবে সে পথে অগ্রসর হওয়া।'

ড.মাওলানা এ.কে. এম.মাহবুবুর রহমান

অধ্যক্ষ, ফরিদগঞ্জ মাজিদিয়া কামিল মাদ্রাসা

‘আশুরা কোনো গোষ্ঠিগত ব্যাপার নয়। আশুরা ইসলামের বিজয় সূচিত করার দুর্বার চেতনার উন্মেষ ঘটায়। নবীর তরিকা পুনর্জীবিত করার বৈপ্লবিক চেতনা সৃষ্টি করে। জড়বাদীরা যাকে ভয় পায়। হুকুমতের মসনদে উপবিষ্ট ইসলামবৈরী শাসকরা মৃত্যুঘন্টা বেজে ওঠার পুর্বাভাস মনে করে।’

মাসুদ মজুমদার

সিনিয়র সাংবাদিক

‘ইমাম হোসাইনের শাহাদাত পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। তার শাহাদাত এত বেশি তাৎপর্যপূর্ণ যে, এর মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রথম ইসলামী বিপ্লবের শুভ সূচনা হলো। ইয়াযীদের আমলে মুসলিম জাহানে নেমে এসেছিল আইয়ামে জাহেলীয়াতের অন্ধকার। ইমাম হোসাইন সেই অন্ধকার দূরীভূত করার জন্য আশুরার সেই ঐতিহাসিক দিনে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবের ডাক দিয়ে গেছেন, ইসলামী পুনর্জাগরণের ইশারা করে গেছেন। তিনি ইয়াযিদী ইসলাম আর মুহাম্মাদী ইসলামের পার্থক্য তুলে ধরেছেন; মুমূর্ষ ইসলামের দেহে রক্ত সঞ্চালিত করে তাকে উঠে দাড়াতে সাহায্য করেছেন। ইমাম হোসাইন ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে প্রচণ্ড এক ঝাকুনি দিয়ে জাগ্রত করেছেন, মুসলমানদের চেতনার গভীরে জাগিয়ে দিয়েছেন আবারা প্রাণস্পন্দন।’

মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ

সিনিয়র সাংবাদিক

ইসলাম তার অনুসারীদের কাছ থেকে এক চিরন্তন সত্যের সহজ স্বীকৃতি এবং কতিপয় নৈতিক কর্তব্যের অনুশীলন দাবি করেছিল। অন্যান্য দিক দিয়ে ইসলাম তাদেরকে দিয়েছিল বিচার–বুদ্ধি প্রয়োগের ব্যাপকতম স্বাধীনতা। ঐশী একত্ববাদের নামে এই ধর্ম সকল ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরেছিল গণতান্ত্রিক সাম্যের অঙ্গীকার। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক ধর্মের নির্যাতিত

বিরুদ্ধবাদীরা নবী করীম (সা.) - এর পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন, যিনি পুরোহিততন্ত্রের অক্টোপাস থেকে মানুষের বিচার –বুদ্ধির মুক্তি দিয়েছিলেন। আবেস্তা ধর্মশাস্ত্রবিদ, জারথুস্ত্রবাদী স্বাধীন চিন্তাবিদ, ম্যানিকিয়াস, খ্রিষ্টান, ইয়াহুদী ও মাজী- সকলেই নতুন জীবনব্যবস্থার আবির্ভাবকে খোশ আমদেদ জানিয়েছিলেন, যা ধর্মীয় ঐকের স্বপ্ন সার্তক করে তুলেছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, সে ধর্মীয় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব উমাইয়্যা শাসনের গাড়াপত্তনে এবং কারবালায় ইমাম হোসাইন (রা.) - এর সঙ্গী- সাথীসহ নির্মমভাবে শহীদ হওয়ার মাধ্যমে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। পরিণামে উম্মতে মুহাম্মাদীয়া (সা.) - এর ভাগ্যে জুটেছে অনৈক্য ও পরাধীনতা।

সৈয়দ আমীর আলী

ভারতীয় উপমহাদেশে মার্সিয়ার উৎপত্তি ক্রমবিকাশ ও সাহিত্য অবদান

এ্যাডভোকেট মোঃ জাকির হোসেন*

মার্সিয়া সাহিত্য

শোক, দুঃখ, কান্না ও অশ্রু বিসর্জন মানুষের সহজাত স্বভাব। মানব শিশু কান্নার মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে। মানব জীবনে সুখ- দুঃখ নিত্য দিনের সহচর।

দুঃখ, শোক, মাতম মানব জীবনকে গতিময় করে। বেচে থাকার শক্তি, উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়। মানুষের প্রতি, মানবতার প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত করে। কোনো লোক যখন তার পরম পাওয়ার বা ভালোবাসার কোনো বস্তুকে চিরতরে হারিয়ে ফেলে কিংবা কোনো প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটে তখন মানুষ কেবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়েনা, সে বুক- মাথা চাপাড়ায় এবং শোকগাথা গাইতে থাকে। কেননা, প্রিয়জনের বিয়োগ জ্বালা, প্রিয়জনকে হারানোর বেদনার কারণে সৃষ্ট অদৃশ্য শোককান্নাকে সে রুখতে পারে না। এমনকি ইচ্ছে না থাকলেও অনুভূতির ভাবাবেগে মানুষ নিজের অজান্তেই কেদে ফেলে। মানুষের শোক প্রকাশের এরূপ ধারাকে মাতম বলা হয়ে থাকে। মাতমের সাহিত্যিক বহিঃপ্রকাশে রচিত সাহিত্যকর্মকে মার্সিয়া বলা হয়।

মার্সিয়ার সংজ্ঞা, উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ

কোনো ট্র্যাজিক বা শোকময় ঘটনা সম্পর্কে প্রশংসাসূচক গান, স্মৃতিচারণমূলক গাথা অথবা কাব্য রচনা হলো মার্সিয়া সাহিত্য। মার্সিয়া আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ শোক করা, মাতম করা, ক্রন্দন করা- বিলাপ করা। মানব সভ্যতার আদি থেকে পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ বিলাপের মাধ্যমে শোক প্রকাশের রীতি প্রচলিত ছিল। কারবালা ট্র্যাজেডিকে ঘিরে পূর্ব যুগে গৌরবময় স্মৃতিচারণমূলক পনের হতে বিশটি শেস্নাক বা শোকগাথা লিখিত হলে তা মার্সিয়ার অন্তর্ভুক্ত হতো। কিন্তু পরে মার্সিয়ার অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

৬১ হিজরীতে কারবালার মরু প্রান্তরে হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) এবং অন্যান্য বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে লিখিত প্রশংসাসূচক কবিতাই বিশেষভাবে মার্সিয়া নামে অভিহিত হয়।

হযরত ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন এবং অন্যান্য শহীদানের আত্মত্যাগের বীরত্ব গাথা প্রসঙ্গে শোকগীতিই মার্সিয়ার রূপ পরিগ্রহ করে। প্রখ্যাত কবি নিযামী মার্সিয়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, কোনো মৃত ব্যক্তির জীবনের গুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে ছন্দে রচিত বিলাপ অথবা দুঃখ প্রকাশের নাম মার্সিয়া। পাশ্চাত্য মনীষী Hughes বলেছেন, মার্সিয়া কারও শুভযাত্রা উপলক্ষে বিষাদগীতি। বিশেষ করে মুহররম মাসে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনের আত্মবিসর্জন সম্পর্কে কবিত্ব ছন্দে যে শোকগাথা গীত হয় তা- ই মার্সিয়া। কারবালার শহীদদের স্মরণে মুহররম মাসে মজলিস অনুষ্ঠানে মার্সিয়া পঠিত হয়।

তাজিয়াসহ আহলে বাইতের অনুসারীরা শোক মিছিলের সময় পথ চলতে চলতে মার্সিয়া আবৃত্তি করে থাকে। মার্সিয়ার ইংরেজি প্রতিশব্দ Elegy বা Mournful poem বা Funeral Song। এই শোকগাথা বিশ্ব সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

যুদ্ধের বর্ণনাকে আশ্রয় করে আরবে প্রথম মার্সিয়া সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। আরবে মার্সিয়া রচনার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ের বিষাদময়ভাব প্রকাশ করে পরস্পরের মনের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করা হতো। তামসিক যুগে মার্সিয়া সাহিত্যের চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল বটে কিন্তু ইসলামী যুগে তা পূর্বাপেক্ষা ব্যাপকতর পৃষ্ঠপোষকতা পায় এবং বিকাশ লাভ করে। আত্মীয়ের মৃত্যুতে মানুষের মনে যে গভীর বেদনা ও ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তা কাব্য ও কবিতা রচনার মূলভিত্তি। আর এই ভিত্তিমূলেই প্রতিষ্ঠা পায় মার্সিয়া। পৃথিবীর সব দেশেই বেদনাবোধ হতে কাব্যসাহিত্য রূপ লাভ ঘটেছে। ইসলাম পরবর্তী যুগে যারা মার্সিয়া লিখতেন তাদের অন্যতম হলেন খানস এবং মোতামিন বিন নূব্যয়রা।

তবে কিছু কিছু আরব দেশীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায় এ সময়ে কোনো কোনো মার্সিয়ায় গভীর বিষাদের ভাব স্পষ্ট। অন্তরে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে এ মার্সিয়া কবিতাগুলো সাহিত্যে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। হযরত উসমানের মৃত্যু উপলক্ষে কাফ বিন মালিক নামক একজন আরব কবি

আরবি ভাষায় মার্সিয়া কবিতা রচনা করেছিলেন। এরপর ইমাম আলী শহীদ হওয়ার পর আবি আসওয়াদ দুওয়ালী নামক অপর একজন কবি আরবি ভাষায় একখানি মার্সিয়া কাব্য রচনা করেন। এর মাত্র বিশ বছরের মধ্যে কারবালার ট্র্যাজেডি ঘটে। কারবালার ভয়াবহ কলংকজনক ট্র্যাজেডির সময় যদি আরব জাতির পূর্বের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকত তাহলে সবিজ্ঞ কবিগণ এমন করুণ ভাষায় আরবি মার্সিয়া রচনা করতেন যে, এর প্রভাবে সমগ্র বিশ্বে শোকের অনলশিখা প্রজ্বলিত হতো। কিন্তু ইতোমধ্যে আরব জাতির মধ্যে পূর্বের বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট পরিমাণে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

বনী উমাইয়্যা রাজবংশের পতনের পর আব্বাসী রাজবংশীয় শাসকগণ কাব্য সাহিত্যের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধন করেন। কিন্তু এ সময়ে রাজ পুরুষদের প্রশংসাসূচক কাসিদা লিখে কবিগণ পুরস্কার লাভ করতেন। ফলে মার্সিয়া সাহিত্যের অচলাবস্থার পরিবর্তন হলো না। তবে মা আন ও জাফর বার্মাকীর বদান্যতার ফলে তাদের মৃত্যুর পর যে মার্সিয়া কাব্য লিখিত হয়েছিল তাতে গভীর শোকের আভাস পাওয়া যায়।

পারস্যের মহাকবি ফেরদৌসী তার শাহনামায় সোহরাবের মৃত্যুর পর তার মাতার জবানীতে যে শোকগাথা বর্ণনা করেছেনে তা বিশেষভাবে মার্সিয়া সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। কবি খররুখী, কবি শেখ সা'দী, ভারতের আমীর খসরু ফার্সি ভাষায় মার্সিয়া রচনা করে মার্সিয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ তুসী কারবালার যুদ্ধে ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের ঘটনা অবলম্বনে মার্সিয়া কাব্য রচনা করেন। কবি সানায়ী একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, কবি নজিরী ও উরফী ১৬ শতাব্দীতে নতুন ধরনের মার্সিয়া রচনায় ব্রতী হন। কবি মোল্লা মুহতাশিম কাশানী সাফাবী বংশের প্রশংসা করে কাসীদা রচনা করেন।

সাফাবী বংশের সূচনালগ্নে মার্সিয়া সাহিত্য পুনরায় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং এ সময় কবি মুকবিল এককভাবে কয়েকখানা মার্সিয়া কাব্য রচনা করেন। তিনি কারবালার লোমহর্ষক বর্ণনা তার মার্সিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরেন। বিংশ শতাব্দীর পারস্য কবি কানী হৃদয়স্পর্শী ভাষায়

কারবালার কাহিনী অবলম্বনে মার্সিয়া রচনা করেন। তার মার্সিয়াগুলো অতিব করুণ ও শ্রুতিমধুর। কানীর ও মার্সিয়া সম্বন্ধে একথা স্বীকৃত যে, তিনি তার সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। তার মার্সিয়ার গঠন প্রণালী ও ভাষা শৈলী প্রয়োগ স্বতন্ত্র। তার রচনায় ইমাম হোসাইনের শাহাদাত বৃত্তান্ত অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাবে ফুটে উঠেছে।

পারস্য হতে অনেক কবি ও সাহিত্যিকের ভারত আগমনের ফলে ভারতেও মার্সিয়া সাহিত্য ও কাব্য রচনার নতুন দিগন্ত সম্প্রসারিত হয়।

উপমহাদেশে ফার্সি মার্সিয়া সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

উপমহাদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর দিল্লী রাজধানী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায় এবং রাজদরবারের ভাষা হিসাবে ফার্সি মর্যাদা লাভ করে। ফার্সী ভাষা রাজদরবারের ভাষা হিসাবে স্থান লাভ করায় ভারতীয় সাহিত্যে ফার্সি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে এবং জ্ঞান- বিজ্ঞান প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

এ প্রসঙ্গে ড. হাবিবুল্লাহ বলেন, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণবশত ইরানের সাভাবী রাজবংশের রাজাদের সাথে তৈমুর বংশীয় সুন্নী মুঘলদের চিরন্তন শত্রুতা থাকায় এ অঞ্চলের কবিগণ অনুকূল পরিবেশের অভাবে মার্সিয়া রচনায় উৎসাহী হননি।

এর ফলে উত্তর ভারতে ফার্সি সাহিত্যে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে মার্সিয়া রচিত হয়নি। পাক্ষান্তরে, দিল্লীর মুঘল শাসকগণের শত্রু দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর শিয়া নরপতিগণের সহানুভূতি ও উৎসাহে শিয়া মাযহাবের প্রচারক ও কবি- সাহিত্যিকগণ দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে পড়েন। ফলে শিয়া চিন্তাধারাপুষ্ট সাহিত্য রচনার সম্প্রসারণ ঘটে।

সম্রাট বাবর লোদী বংশের শেষ সম্রাটকে পরাজিত করে ১৫২৬ সালে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তার পুত্র হুমামান ভারত হতে শের শাহ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ১৫৪৪ সালে সাময়িকভাবে পারস্য সম্রাট তাহমাসপের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পারস্য বা ইরান হতে তার

সামরিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা লাভ ইরান ও ভারতের মধ্যে শিল্প- সাহিত্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের এক নব যুগের সূচনা করে।

সম্রাট হুমায়নের ভারত প্রত্যাবর্তনের সময় বহু ইরানী কবি- সাহিত্যিকের সংশ্রবের ফলে ফার্সি ভাষা শরীফদের ভাষায় স্থান লাভ করে। মুঘল আমলে ভারতের সর্বত্র ফার্সি সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা হতে থাকে। মুঘল যুগের পূর্বেও ভারতে ফার্সি ভাষা প্রচলিত ছিল। এর আগমন ঘটে আফগানিস্তান ও তুর্কিস্তান হতে। কিন্তু মুঘল আমলে ফার্সি ভাষার মূল উৎসস্থল ইরান থেকে এ ভাষা ও সাহিত্যের প্রবাহ শুরু হয়। এ সময় দিল্লী ও দিল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের কবি- সাহিত্যিকগণ ব্যাপকভাবে সাহিত্য চর্চা করেন। প্রথম তারা ফার্সি ও পরে উর্দু ভাষার কাব্য চর্চা করেন। সে সময় দাক্ষিণাত্যের শিয়া রাষ্ট্রগুলোতে মার্সিয়া কাব্য চর্চা পুরা দমে শুরু হলেও উত্তর ভারতের শিয়া কবি ও সাহিত্যিকগণ সাম্রাটের ভয়ে ধর্ম সম্বন্ধীয় কোনো কাব্য রচনা করতে সাহসী হননি। বরং মুঘল রাজদরবারের কবিগণ কাসীদা রচনা করে সম্রাট ও শাসকবর্গের সন্তোষ বিধান করতেন। এর কারণ মূলত অর্থনৈতিক। কেননা, মৃত ব্যক্তির গুণকীর্তন অপেক্ষা জীবিত ব্যক্তির প্রশংসা কীর্তনের প্রতি তাদের আগ্রহ অনেক বেশি ছিল। সম্রাট শাহজাহানের রাজদরবারের কবি হাজী মুহাম্মদ জান কুদসী স্বীয় যুবক পুত্রের অকাল মৃত্যুতে এক মার্সিয়া রচনা করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের শাসক দ্বিতীয় আদিল শাহ এই শাসনকালে (১৫৮০- ১৬২৬.খ্রি.) তার দরবারের কবি মোল্লাহ যুহুরী আদিল শাহের নির্দেশে মার্সিয়া কাব্য রচনা করেন।

মুঘল যুগের সূচনালগ্নে কিছুসংখ্যক লেখক ও কবির রচনার নমুনা ঐতিহাসিক রদায়ুন কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। আমীর খসরু (১২৩৫- ১৩২৫.খ্রি.) এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলে জানা যায়। বুগরা খান যখন বাংলাদেশের শাসন কর্তা নিযুক্ত হয়ে আসেন তখন আমীর খসরু তার সঙ্গে বাংলাদেশে আসেন। এরপর খসরু বাংলাদেশ হতে দিল্লী যান। রাজধানী দিল্লীতে গিয়ে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে প্রতিষ্ঠা পান এবং সুখ্যাতি অর্জন করেন।

ফার্সি ভাষায় তিনি অসংখ্য কাসীদা, গজল ও মসনবী রচনা করেন। তবে ফার্সি ভাষায় তিনি কোনো মার্সিয়া রচনা করেছিলেন কিনা জানা যায়নি।

জামালী নামে সুলতান সিকান্দার লোদীর অতিপ্রিয় একজন কবি ছিলেন। সুলতান সিকান্দার লোদী ১৪৮৮ থেকে ১৫১৭ সাল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিলেন। সুলতানের মৃত্যু ঘটলে কবি জামালী মর্মস্পর্শী ভাষায় একটি মার্সিয়া রচনা করেন।

উপমহাদেশে উর্দু মার্সিয়া সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

উপমহাদেশের উর্দু সাহিত্যের সূতিকাগার হিসাবে ঐতিহাসিকগণ দাক্ষিনাত্যকে অভিহিত করেছেন। উর্দু সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে এখান থেকেই। উর্দু ভাষায় মার্সিয়া কাব্যের উৎপত্তির মূলে দাক্ষিণাত্যের উর্দু কবিগণের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পারস্যে যেমন শীয়া সাফাবী রাজবংশের সূচনা হয় তেমনি ভারতের দাক্ষিণাত্যে শীয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সম্রাট বাবর কর্তৃক ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অর্ধশত বছর পূর্বেই দাক্ষিণাত্যে মার্সিয়া কাব্য রচনার প্রচলন হয়। উপমহাদেশে ফার্সি, উর্দু এবং বাংলা ভাষায় মার্সিয়া সাহিত্য ধারার প্রবর্তন যে ইরানি বণিক, দরবেশ ও পণ্ডিত মহলের অনুপ্রেরণায়ই হয়েছে তাতে কোনো দ্বিমত নেই।

ভারতের দাক্ষিনাত্যে বর্তমান হায়দারাবাদে প্রথম উর্দু ভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু হয়। সেখানে উর্দু ছিল শিক্ষিত জনসাধারণের ব্যবহৃত ভাষা। ১৩৬৪ সালে দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে দাক্ষিনাত্যের বাহমানী রাজবংশের শাসকের বিদ্রোহের ফলে স্বাধীনতা অর্জিত হয়। ফলে দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলো প্রাচীন উর্দু বা দাকিনীকে রাজভাষারূপে গ্রহণ করে। এর বিশ বছর পূর্বে মুহাম্মাদ বিন তুঘলকের সৈন্যবাহিনী দাক্ষিনাত্যে উর্দুর প্রবর্তন করে। তার দাক্ষিণাত্যের রাজভাষা রূপে তা গৃহীত হয়। উর্দু সাহিত্যের সূচনা দাক্ষিণাত্যের কবি ওয়ালী (১৬৬৮- ১৭৪৪ খ্রি.) হতে; তবে তখনকার ভাষা ছিল দাকিনী। কবি ওয়ালী কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা অবলম্বনে মসনবী রচনা করেন; কিন্তু কোনো মার্সিয়া লিখেননি। উপমহাদেশে মার্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি

কে তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও খাজা মীর দার্দ- এর (১১৩৩- ১১৯৯.খ্রি.) পূর্বেই মার্সিয়া কাব্য রচনার প্রচলন ছিল। এর পূর্বে মার্সিয়া ছিল চার পংক্তি বিশিষ্ট কবিতা, কিন্তু মীর্যা সওদা সর্বপ্রথম ১৭৫০ সালে ছয় পংক্তির মার্সিয়া রচনা রীতির প্রচলন করেন। তার সাহিত্য প্রতিভা ও কবিত্ব শক্তির প্রভাবে পরবর্তীকালে মীর আনিস ও মীর্যা দবীরের যুগে মার্সিয়া সাহিত্য উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করে। মীর্যা সওদা দীওয়ান ও মসনবী ব্যতীত সালাম ও রচনা করেন। মীর ত্বকীও (১৭১২- ১৮১০.খ্রি.) মার্সিয়া লিখে ছিলেন।

উর্দু কবিগণের জীবন চরিত সংগ্রহকার মীর ত্বকী ও মীর হাসান সে যুগের অনেক মার্সিয়া লেখকের নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে মীর আমানী, মীর আল আলী দারাখশান সিকান্দার, কাদির, গোমান, আসেমী, নদীম, সবর প্রমুখ অন্যতম। বর্তমান কালের এক গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে, দাক্ষিণাত্যের গোলকুণ্ডা রাজ্যের শাসনকর্তা মুহাম্মাদ কুলী কুতুব শাহ (১৫৮০- ১৬১১:খ্রি.) উর্দু ভাষার প্রথম বিশিষ্ট কবি। তিনি মার্সিয়া শ্রেণীর বহু কবিতা লিখেছেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের রাজন্যবর্গ মার্সিয়া কাব্য সাহিত্যের কবিদের শুধু পৃষ্ঠপোষকতা করেই ক্ষান্ত হননি; তারা শিয়া মাযহাবভুক্ত হওয়ায় নিজেরাও মার্সিয়া সাহিত্য ও কাব্যাদি রচনা করতে আত্মনিয়োগ করাকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। বিজাপুরের আদিল শাহী শাসকগণের দান ও পৃষ্ঠপোষকতায় এ উপমহাদেশে সর্বপ্রথম মুহররমের মজলিস অনুষ্ঠান চালু হয়। সেই সাথে এ শাহী ও নিযামশাহী শাসকগণের রাজত্বের সময় মার্সিয়া কাব্য রচনাধারা যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়। প্রথম প্রথম এ সকল মজলিস অনুষ্ঠানে ইরানী কবি মুহতাশিম কাশানীর ফার্সি ভাষায় লিখিত মার্সিয়া পাঠ করা হতো। কিন্তু পরে উর্দু ভাষায় তা রচিত হয়। পরবর্তীতে মার্সিয়া কবিতা আবৃত্তির জন্য এক বিশেষ গোষ্ঠি গড়ে ওঠে এবং বহু মার্সিয়া কাব্য রচিত হতে থাকে। এ সময় 'রওজাতুস শুহাদা' নামক বিখ্যাত মার্সিয়া খানি ফজলে আলী কর্তৃক উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়। অনুদিত এ গ্রন্থের নাম কারবালার কথা। এ গ্রন্থে ইমাম হোসাইনের শাহাদাত এবং কারবালার অপরাপর ঘটনা মার্সিয়া কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সম্রাট আকবরের সময় দাক্ষিণাত্যের শিয়া রাজা আদিল শাহ ও কুতব শাহ' নিজ নিজ রাজ্যে মুহররমের মিছিল এবং মাতম অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন।

মজলিসের সময় ঐ সকল স্থানে চৌদ্দটি (আহলে বাইতের চৌদ্দ জন নিষ্পাপ ব্যক্তির সাম্মানে) স্তম্ভ প্রোথিত হতো। গোলাকুণ্ডা শহরকে আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হতো। মার্সিয়া পাঠকগণ রাজধানীতে শহীদগণের প্রশংসাসূচক কবিতা, মার্সিয়া এবং নওহা পাঠ করত। দশ মুহররম সুলতান স্বয়ং কালো রঙের পাশোক পরে খালি পায়ে পতাকা, পাঞ্জাসহ মিছিলে যোগদান করতেন। বীজাপুরে শাহী আম্বরখানার নাম ছিল হাসেইনী মহল। দাক্ষিণাত্যের কবি নসরতী তার কাসীদায় হোসেইনী মহলের সৌন্দর্যের বর্ণনা প্রদান করেছেন। ভারতীয় দাকিনী ভাষায় কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার বর্ণনামূলকা প্রাচীন একখানা গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। এটির নিযাম শাহী রাজ্যের কবি আশরাফ কর্তৃক লিখিত হয়েছিল। অতঃপর যে মার্সিয়া কাব্য বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে, তা গোলকুণ্ডার প্রসিদ্ধ কবি ওয়াজহী রচিত। তৎপর অন্যান্য কবি মার্সিয়া কাব্য রচনা করেন। তাদের মধ্যে গোলকুণ্ডের কবি গাওয়াসী, লতীফ কাযেম, আফজল, শাহ কুলী খান, শাহী নুরী এবং বীজাপুরের মির্যা ও হাশিমীর নাম উল্লেখযোগ্য। মির্যা সারাজীবন মার্সিয়া কবিতা রচনা করে গেছেন বলে জানা যায়।

১৬৫০ সালে গোলকুণ্ডার কবি আহম্মাদ কারবালা ঘটনা নিয়ে 'মুসিবাত- ই- আহলে বাইত' নামক একখানি মসনবী কাব্য রচনা করেন। মুহাম্মাদ হানিফার উপাখ্যান নিয়েও দু'খানা মহাকাব্য রচিত হয়।

মীর জমীরের সময় উর্দু ভাষায় মার্সিয়া সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ রূপলাভ করে। মীর জমীর সর্বপ্রথম মিম্বরে বসে মার্সিয়া পাঠ করার রীতি প্রচলন করেন। তার পূর্ববর্তী কবিগণ যে পদ্ধতিতে মার্সিয়া রচনা করতেন তা চল্লিশ পাঞ্চাশ বন্দের বেশি দীর্ঘ হতো না।

উল্লেখ্য যে, 'রওজাতুস শুহাদা' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির তিনটি কপির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এর দুই কপি লণ্ডনের ইন্ডিয়া অফিসে এবং এক কপি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। মির্যা ও হাশিমীর রচিত মার্সিয়া কাব্যের পাণ্ডুলিপি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে।

এরপর মীর খালিকের (১৭৭৪- ১৮০৪:খ্রি.) সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মীর খালীকের চার ভাইয়ের তিন ভাইই কবি ছিলেন। খালক, খালীক এবং মহসীন এ তিন ভাই মার্সিয়া কবিতা লিখে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। মীর খালীকের পুত্র মীর বাবর আলী (১৮০২- ১৮৭৪:খ্রি.) মার্সিয়া কাব্যের সর্বাধিক উন্নতি বিধান করেন। দাক্ষিণাত্য অপেক্ষা দিল্লী ও লক্ষৌতে এসে মার্সিয়া সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়েছে। লক্ষৌতে শহরের অধিকাংশ আমীর ও ওমরাহ শিয়া মাযহাবভুক্ত ছিলেন। এ কারনে তারা কারবালার বীর শহীদদের দুঃখ- কষ্টের কথা অত্যন্ত ভক্তি- শ্রদ্ধার সাথে আলোচনা করতেন এবং ক্রন্দন ও শোক প্রকাশ করাকে ধর্মীয় কার্যের অংশ হিসাবে গণ্য করতেন। শুধু তা- ই নয়, অন্যান্য কবিদেরও তারা মার্সিয়া সাহিত্য রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। লক্ষৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ (১৮৪৭- ৫৬ :খ্রি.) নিজেও কবি ছিলেন। তিনি জিলদে মিরাসী, দফতর - ই- গম ও বহর- ই- আলম এবং সরমায়া- ই- ঈমান নামক তিন খানা মার্সিয়া কাব্য রচনা করেন।

১৮৫৬ সালে তিনি কলকাতা আসেন এবং ১৮৮৭ সালে তার মৃত্যু ঘটে। মার্সিয়া সাহিত্যের যথার্থ উন্নতি ও বিকাশের সময় লক্ষৌ শহরে মুহররমের শোক প্রকাশের সময়কাল ১০ দিনের পরিবর্তে ৪০ দিন নির্দিষ্ট হয়। নবাব ওয়াজেদ আলী স্বয়ং মার্সিয়া কাব্য রচনা করতেন এবং তা মজলিস অনুষ্ঠানে পঠিত হতো। এ সময় কালের মার্সিয়া সাহিত্যে দু'জন বিশিষ্ট কবির সন্ধান পাওয়া যায়। তারা হলেন মীর আনীস এবং মীর্যা দবীর। তারা উভয়ই মার্সিয়া সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি ছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের যেমন দুই কবি চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, তেমনি উর্দু ভাষায় মার্সিয়া কাব্য সাহিত্যের দুই শ্রেষ্ঠ কবি মীর্যা দবীর ও মীর আনিস। এই দুই প্রতিভাদীপ্ত কবির কাব্য সাধনার ফলে উর্দু মার্সিয়া কাব্যের চরম উন্নতি সাধিত হয় এবং মার্সিয়া সাহিত্য বিশেষভাবে লাভবান হয়।

বাংলায় মার্সিয়া সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

বাঙালি সংস্কৃতিতে মার্সিয়া সাহিত্য অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী সাহিত্য হিসাবে পরিগণিত হয়ে আছে। বাঙালি মুসলমানদের জীবনের সাথে কারবালার কাহিনী ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

কারবালার মরু প্রান্তরে মহানবী রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর প্রিয়তম দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (আ.) - এর সপরিবারে এই আত্মদানের ঘটনা এমন করুণ ও হৃদয়বিদারক যে, তা যুগে যুগে সাহিত্যিকদের কাব্য ও সাহিত্য রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছে। কারবালার যুদ্ধের মাধ্যমে ইমাম হোসাইন (আ.) - এর আত্মদান চিরদিন মানুষকে ত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ করবে। বাংলা সাহিত্যে কারবালার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সে কাল থেকেই এ দেশের মুসলমান তথা জনসাধারণের মধ্যে প্রতি বছর মুহররম মাসে শোক পালন করার রীতি চলে আসছে এবং এ বিষয়ে পুথি- কস্তক লেখার রেওয়াজ চালু হয়েছে। কারবালার ঘটনা বা মুহররমের ঘটনা নিয়ে মধ্যযুগে এবং পরবর্তীকালে যে সব পুথি ও বই লেখা হয়েছে. সেগুলোর নাম 'জঙ্গনামা'। মকতুল হুসায়ন, শহীদ- ই- কারবালা, সংগ্রাম হুসন, এমাম এনের কেচ্ছা, শাহাদাৎ নামা, হানিফার লড়াই, বড় জঙ্গনামা, গুলজার- ই- শাহদাৎ, দাস্তান শহীদে ইকবরালী, জঙ্গে কারবালা ইত্যাদি।

ইংরেজ আমলে কারবালার করুণ কাহিনী নিয়ে বিস্তর কাব্য ও সাহিত্য রচিত হয়েছে। এ বিষয়ে মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্দুর সাহিত্যমান অতুলনীয়। যদিও এতে প্রচুর ইতিহাস বিকৃতি রয়েছে। তাছাড়া বাংলা কাব্যে কতিপয় কবি এ বিষয়ে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আবুল মা আলী, মুহম্মদ হামিদ আলী, কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মীর রহমাত আলী, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলে কারবালার ঘটনা নিয়ে মুহররম মাসে মুসলমানের একাংশ যে বিষাদময় গীতিকা গেয়ে থাকে তার নাম জারি গান। প্রকৃতপক্ষে মুহররমের মর্মস্পর্শী ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফার্সিও উর্দু ভাষার মতো বাংলা ভাষায় যে সাহিত্য করুণভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, জারিগান তারই এক বিশিষ্ট রূপ।

এই উপমহাদেশে কারবালার ঘটনা নিয়ে সাহিত্য নির্মাণের সূচনা হয় পনের শতকের শেষার্ধ্বে তখন কারবালার ঘটনা নিয়ে লেখা মার্সিয়া পড়া হতো। হিন্দু- মুসলমান সবাই মুহররমের মিছিল

করত। মাতম করতো এবং এ মাতম উপলক্ষে ইরানী কবি কাশানীর ফার্সি হফতবন্ধ পড়া হতো। কিন্তু অনতিকাল পরে দাকিনী ভাষায় (প্রাচীন উর্দু ভাষায়) কারবালার করুণ ঘটনা নিয়ে এক প্রকার মার্সিয়া কবিতা রচিত হতে লাগল। আহমদে নগরের কবি আশরাফ প্রথম বারের মতো মার্সিয়া লিখতে শুরু করেন। দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারত ও অন্যান্য স্থানে কারবালা ঘটনা অবলম্বনে বিষাদময় কবিতা লেখার প্রচলন হয় এবং ধীরে ধীরে তার বিস্তৃতি ঘটে। বাংলা ভাষায় কারবালার ঘটনা নিয়ে সর্বপ্রথম কে সাহিত্য রচনার সূচনা করেন সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। তবে এ পর্যন্ত যতদূর তথ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তাতে শায়খ ফয়জুল্লাহ কারবালা সম্বন্ধে জয়নবের চৌতিশা রচনা করেন যা এ সম্পর্কিত প্রথম বাংলা কবিতা বলে গণ্য করা হয়। সমসাময়িক কালে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ও অর্থমন্ত্রী বাহরাম খান 'মাকতাল হোসেন' রচনা করেন। মাকতাল হোসেন- এ ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের ঘটনার বর্ণনা স্থান পায়। চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামের অধিবাসী মুহম্মদ খান এ সম্পর্কিত কয়েকখানি কবিতা রচনা করেন। রংপুরের ঘোড়াঘাট সরকারের অধীন ঝাড় বিশিলা গ্রামের কবি হায়াৎ মামুদ কাশেমের লড়াই নিয়ে 'জঙ্গনামা' নামে কাব্য রচনা করে মার্সিয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি হামিদ কারবালা ঘটনা নিয়ে 'সংগ্রাম' রচনা করেন। ব্রিটিশ আমলে ফকীর গরীবুল্লাহ 'জঙ্গনামা' রচনা করেন। গরীবুল্লাহর 'জঙ্গনামা' অত্যন্ত জনপ্রিয় কাব্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। আঠার শতকে রাঢ় অঞ্চলে কারবালার ঘটনা হিন্দু- মুসলমান লেখক ও পাঠকদের মধ্য প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করে। কবি রাধাচরণ এ 'এমাম এনের কেচ্ছা' রচনা করেন।

উনিশশ তাকে চট্টগ্রামের কবি মোহাম্মদ হামিদ উল্লাহ খানে রচিত গুলজার- ই- শাহাদাৎ বা শাহাদা স্থান কাব্য খানি আগাগোড়া সাধু ভাষায় রচিত হয়। সুনামগঞ্জের লক্ষণ শ্রী পরগনা অধিবাসী ওয়াহিদ আলী পাচশ' পৃষ্ঠার এক কাব্য 'বড় জঙ্গনামা' রচনা করেন। অতঃপর বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং কবি- সাহিত্যিকগণ কারবালার ঘটনা নিয়ে সাহিত্য সৃজনে পাশ্চাত্য ভাবের আমদানি ঘটান। এ কবিদের মধ্যে মুহাম্মদ হামিদ আলী, মতীয়ুর

রহমান খান, কায়কোবাদ, আব্দুল বারী, আব্দুল মুনায়েম, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আজিজুল হাকিম, মুহম্মদ ইব্রাহিম প্রমুখের নাম উল্লেখ যোগ্য।

মুহাম্মাদ হামিদ আলীর পুরো নাম আবুল মা আলী মুহাম্মদ হামেদ আলী। তার বাড়ি ছিল চট্টগ্রামের রাউজান থানার অধীন সুলতানপুর গ্রামে। তার জন্ম ১৮৬৫ সালে। তিনি 'জয়নলোদ্ধার' এবং 'কাসেম বধ' কাব্য রচনা করেন। কাব্য দু'খানি মুসলমান পাঠকদের কাছে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। 'কাসেম বধ' কাব্যের বিষয় কারবালার ভীষণ যুদ্ধ, নবী পরিজনের শোচনীয় দুর্গতি ও সখিনার মর্মভেদী বিলাপ। কবি নবীন চন্দ্র সনের মহাকাব্য প্রকাশের সময়কাল ১৮৯৬ সাল। এ মহাকাব্য রচনার যুগে কবি হামিদ আলী ক্লাসিক্যাল রীতিতে এ কাব্য লিখেন।

মতীয়ূর রহমান খান এবং কবি কায়কোবাদের আবির্ভাব একই সময়ে। মানিকগঞ্জ জেলার পারিল গ্রামে মতীয়ূর রহমানের জন্ম হয়। তিনি শক্তিকতা করতেন। তিনি 'এজিদ বধ' ও 'মাসলেম বধ' নামক দু'খানি কাব্য রচনা করেন। 'এজিদ বধ' কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে একটি মাত্র উপসর্গে রচিত একটি প্রকাণ্ড খণ্ড কবিতা। কবিতার প্রথমাংশে হোসাইন পরিবারের প্রতি ইয়াযীদের রূঢ় আচরণ এবং ইয়াযীদের রাজসভার বর্ণনা স্থান পেয়েছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কারবালার ঘটনা নিয়ে কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কবি কায়কোবাদ অনন্য স্থান দখল করে আছেন। তার পূর্ব নাম মুহাম্মদ কাযেম আল কুরায়শী। ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি 'মহরম শহীদ'নামে তিন খণ্ডে সমাপ্ত কাব্য রচনা করেন।

কবি আব্দুল বারী ১৮৭৭ সালে নোয়াখালী জেলার মাইজদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'কারবালা' কাব্য রচনা করেন। ২১০ পৃষ্ঠার কাব্যে তিনি হোসাইন শিবির সন্নিবেশ, যুদ্ধ ও আত্মত্যাগের বিবরণ তুলে ধরেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজী শক্তিশালী লেখক, কবি ও বক্তা ছিলেন। কারবালা ট্র্যাজেডি নিয়ে তিনি রচনা করেন 'মহাশিখা' কাব্য।

আব্দুলল মুনায়েম ১৮৮৭ সালে চট্টগ্রাম জেলার ফতেপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম হাসান, আলী আসগর, আব্দুল ওহাব, মহাবীর কাসেম ও ইমাম হোসাইন এই পাচ শহীদকে নিয়ে ‘পঞ্চ শহীদ’ কাব্য রচনা করেন।

পাবনা শহরের কৃষ্ণপুরের অধিবাসী ছিলেন কবি মোহাম্মদ ইব্রাহিম। ১৮৮২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কারবালার ঘটনা অবলম্বনে তিনি ‘শহীদের খুন’ রচনা করেন।

কবি আজিজুল হাকিম ঢাকা জেলার রায়পুর থানার হাসনাবাদ গ্রামে ১৯০৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। কারবালা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি ‘মরু সেনা’ রচনা করেন।

মীর রহমত আলী নরসিংদী জেলার রসূলপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তার লেখা ‘মহরম কাব্য’ বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজীবন দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের জগতে এক অনন্য কীর্তি স্থাপন করেছেন। কারবালাকে কেন্দ্র করে তিনি যে ক’টি কবিতা ও গান লিখেছেন তা অসাধারণ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ছাড়া কারবালা ট্র্যাজেডি পল্লীর অগণিত মানুষের কাছে প্রতিভাত হয় বেদনার অথৈ সমুদ্র হিসাবে। মুহররমকে উপলক্ষ করে বাংলার প্রত্যন্ত জনপদে রচিত হয়েছে অসংখ্য জারীগান ও কবিয়ালদের কবিত্ব গাথা।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সম্রাট হুমায়ুনের সাথে ইরানী সৈনিক শিল্পী ও সাহিত্যিকগণের সংস্পর্শ বাংলাদেশের সাহিত্য, সাংস্কৃতিক সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। এ ছাড়া এ সময়ে ইরানের রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে বহু শীয়া মতাবলম্বী নর- নারী বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ এবং মুঘল সম্রাটগণ কর্তৃক বহু শীয়া আমির- এবং সুবাদার সুবে বাংলার শাসক নির্বাচিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গের সুন্নি নর- নারী শিয়া ধর্মীয়ভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এ প্রভাবের কারণে মার্সিয়া সাহিত্যের বিস্তার ঘটে।

১৮৫৭ সালে দিল্লীর সর্বশেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর সিপাহী বিদ্রোহের সাথে জড়িত আছেন- এ অভিযোগে ইংরেজরা তাকে বন্দি করে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করে। বাহাদুর শাহ শিয়া

ছিলেন। (Religious Quest of India,Oxford University Press-1930,Page No-61) বাহাদুর শাহ কাব্য ও কবিতার সমঝদার ছিলেন এবং তিনি কবি- সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সে সময় মার্সিয়া সাহিত্যের যথেষ্ট অনুশীলন হতো। কিন্তু বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেওয়ার পরেই দিল্লী হতে শিয়া কবিগণ কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ গমন করেন এবং আস্তে আস্তে বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েন। শিয়া কবিদের সংস্পর্শে এ দেশীয় কবি- সাহিত্যিকগণ মার্সিয়া রচনায় উৎসাহী হয়ে পড়েন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হতে যে সব কবি- সাহিত্যিক কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ আগমন করেছিলেন তাদের মধ্যে মার্সিয়া কাব্যের অধিকাংশ কবি শিয়া ছিলেন। কলকাতা ও মুর্শিদাবাদে মুহররম উপলক্ষে তারা কাব্য রচনা করতেন। এভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই লক্ষৌ ও দিল্লীর পরিবর্তে কলকাতা মার্সিয়া সাহিত্যের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়।

মুঘল আমলে ঢাকা শহরে শিয়াগণের বসতি স্থাপিত হয়। ফলে ঢাকাতেও বেশ কয়েকখানি মার্সিয়া কাব্য রচিত হয়েছিল। পারস্যের জগদ্বিখ্যাত কবি ফেরদৌসীর শাহনামার অনুকরণে ঢাকার কবি সৈয়দ গোলাম আলী আল মুসাড় ১৮৪৬ সালে কারবালার মর্মবিদারক কাহিনী অবলম্বনে একখানি ফার্সি কাব্য রচনা করেন।

১৭৬৩ সালে বাংলার সর্বশেষ নবাব মীর কাশিমের সাথে ইংরেজদের বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মীর কাশিম পরাজিত হয়ে অযোধ্যার শাসনকর্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাতে ইংরেজরা ভীষণ ক্ষুদ্ধ হয়। অযোধ্যার তৎকালীন শাসক নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের আশ্রয়ে বহু কবির জীবিকা নির্বাহ হতো। তিনি অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন বলে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করেন নি। ফলে ইংরেজ সেনাপতি বিনা যুদ্ধে জয়লাভ করে নবাবকে বন্দি করে। পরে তাকে কলকাতায় আনা হয়। এ সময় অযোধ্যার অন্তর্গত লক্ষৌ শহর হতে মার্সিয়া সাহিত্যের কবিগণ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েন। এ সকল কবির কেউ কেউ নবাবের সঙ্গে মাটিয়াবুরুজ অঞ্চল, কতক মুর্শিদাবাদ এবং কতক রামপুরের নবাব দরবারে আসেন ও তারা পুণরায় মার্সিয়া সাহিত্য চর্চা করতে থাকেন। যে সকল কবি মাটিয়াবুরুজে এসে নবাবের সাথে মিলিত হয়েছেন নবাব তাদের সম্মানজনক খেতাব ও উপঢৌকন দিয়েছেন। সপ্তগ্রহ নামে নবাবের একটি কবি পরিষদ ছিলো।

এ পরিষদের সাতজন বিশিষ্ট কবিকে 'সপ্তগ্রহ' বলা হতো। তারা হলেন : ফতেহ উদ দৌলা বকসীউল মুলক বাকি, মাহতাব-উদ-দৌলা কাউকাব উল-মুলক সিতারা জঙ্গে দারাখশান, নওয়াব মুহম্মদ তাকি খান লক্ষৌবি, মীর্যা আলী, মীর্যা মসীতা, মীর্যা মুজাফফর আলী লক্ষৌবি, বলায়েত আলী কাশ্মীরি।

এ সময় মার্সিয়া ধারার কবিতা রচনার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অবস্থার সূচনা ঘটে। নবাব সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় আরো অনেকে মার্সিয়া কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন সৈয়দ আগা হুসেন, খাজা আরশাদ আলী খান, মীর্যা আলী জান, আমীর আলী খান, সৈয়দ ইনশাআল্লাহ খান প্রমুখ।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কবিগণের অধিকাংশ নবাব আলীবর্দী খান ও তদীয় দৌহিত্র নবাব সিরাজউদ্দৌলার আমলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদে আগমন করে কাব্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ সকল কবি প্রধানত ফার্সিও উর্দু ভাষায় মার্সিয়া রচনা করতেন। বিখ্যাত ফার্সি কাব্য 'মকতুল হুসেন' কাব্যের অনুভাবেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিগণ বাংলা ভাষায় মার্সিয়া কাব্য রচনায় যত্নবান হন। তাদের মধ্যে মুহম্মদ খান, হায়াৎ মামুদ, ফকীর গরীবুল্লাহ, রাধাচরণ গোপ, হামিদ অন্যতম।

কলকাতর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু উর্দু কাব্য কারবালার করুণ ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হয়। উর্দু ভাষাতেও মার্সিয়া কাব্য রচনার রেওয়াজ বহুকাল যাবত চলেছিল। আনাসেরে শাহাদাতায়েন, লতায়েফ আশরাফি এবং আবুল কাসিম মীর্যার জঙ্গনামা উর্দু ভাষায় লিখিত হয়েছিল। ফার্সীও উর্দু ভাষার ধর্মীয় বোধ ও প্রেরণা হতেই বাংলাদেশের বহু মুসলমান কবি-সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় মার্সিয়া রচনা করেন। এ সাহিত্যধারা সম্পর্কে সাহিত্যিক আব্দুল কাদির বলেন : 'ধর্মীয় পুস্তকাদি ছাড়া আর এক ধরনের পুথিতে উর্দু, ফার্সির আধিক্য দেখা যায়। সে সমস্ত পুথি সাহিত্যের অধিকাংশই রচিত হয়েছে মুহররমের মর্মান্তিক ঘটনাকে উপলক্ষ করে। ইমাম হোসাইনের নিদারুণ হত্যা কাহিনীর ভিত্তিতে বাঙ্গালায় যে বিরাট পুথি সাহিত্য গড়ে উঠেছে, আমি তার নামকরণ করেছি 'মার্সিয়া সাহিত্য'। মহাজন পদাবলী, নাথ

গীতিকা, মঙ্গলকাব্য চৈতন্য সাহিত্য প্রভৃতি যেমন উপাদান ও প্রকাশ রূপের দিকে দিয়ে পরস্পর হতে পৃথক, তেমনি বাঙালার এই মার্সিয়া সাহিত্য বিষয়বস্তু ও বাকভঙ্গিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।'

মার্সিয়া কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কবিগণ চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলে সুবাদার অথবা শাসন কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও উৎসাহ লাভ করতেন বলে মনে হয়। অন্যান্য অঞ্চল মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থানরূপে পরিগণিত হবার বহু পূর্বেই চট্টগ্রামে মুসলমানদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। তখন হতেই এখানে সমুমদ্রগামী বণিক ও ধর্মপ্রচারকগণ ঘাটি নির্মাণ করেছিলেন। ফলে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে যে মুসলিম শাসকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে তার মূলে চট্টগ্রামের অবদান অনেক খানি।

চট্টগ্রামের ন্যায় অন্যান্য কেন্দ্রস্থলে এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহে ফার্সিও উর্দু ভাষায় কাব্য চর্চাও যথেষ্ট হতো। মুহররমের সময় কবিগণের রচিত মার্সিয়া কাব্য ও কবিতা পাঠ হতো। বাংলাদেশের শিয়া শাসক বা নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায় ইমামবাড়াগুলোতে মজলিস অনুষ্ঠান জাকজমকের সাথে পালিত হতো। এ কারণে কারবালা কাহিনী রাজধানীসহ তৎসন্নিহিত অঞ্চলের মানুষের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং জনমনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। কোনো কারণে রাজ্যের শাসক ও কর্তৃপক্ষ রদবদল হলেও দেশের মুসলিম জনসাধারণ বংশ পরস্পরায় কারবালার করুণ ও মর্মস্পর্শী কাহিনীর প্রতি চিরদিনই হৃদয়ের টান অনুভব করে এসেছে। শুধু তা-ই নয় ধর্মীয় কারণে ইমাম হোসাইন (আ.) -এর আত্মত্যাগ সম্পর্কিত কাহিনী মুসলিম নর-নারীর নিকট চিরদিন গভীর শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে। দীর্ঘকাল যাবত মুসলমানরা হিন্দুগণের পুরান পচালী শুনে সাহিত্য রস পিপাসা মিটিয়েছেন।

পরবর্তীকালে তাদের সমাজ মানসে পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। তারা নিজেদের ঐতিহ্য নির্ভর কাব্য কাহিনী পাঠ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো এবং এ প্রয়োজনের তাগিদেই ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতিভিত্তিক সাহিত্যের সূত্রপাত। এ সাহিত্যের অন্যতম শাখা হিসাবেই বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কবিগণ মুসলিম ঐতিহ্য নির্ভর কাহিনী গ্রহণ করলেন বটে কিন্তু কাব্যের কাঠামোর কোনো

পরিবর্তন করলেন না। কাব্য কাঠামো বাঙালি হিন্দু কবি রচিত পুরান পচালীর ন্যায় রয়ে গেল। মুসলমান কবিগণ পুরান এর প্রভাব অতিক্রম করতে পারেনি।

যা হোক এ সকল সাহিত্যের মধ্যে দু'টি ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ধারা : সপ্তদশ- অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'হরি বংশ' প্রভৃতির অনুসরণে 'নবী বংশ' এবং 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', 'পাণ্ডব বিজয়' প্রভৃতির অনুসরণে 'রসূল বিজয়', 'মুহাম্মদ বিজয়', কাসাসুল আম্বিয়া প্রভৃতি পয়গম্বরদের কাহিনী মূলক কাব্যাদি রচনা। দ্বিতীয় ধারা : হযরত রাসূলুল্লাহর পরবর্তী খলিফাগণের বিজয় অভিযানের বীরত্ব ব্যঞ্জক কথা ও ইমাম হোসাইনের কারবালার যুদ্ধের করুণ কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে সাহিত্য রচনা।

দ্বিতীয় ধারার কাব্যগুলোর সাধারণ নাম 'জঙ্গনামা'। 'জঙ্গনামা'র বিষয়ব অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী। বাঙালি মুসলমানদের নিকট এ কাব্যের কদর হয়েছিল অত্যন্ত বেশি। প্রকৃতপক্ষে এ জঙ্গনামা বা বাংলা মার্সিয়ার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানরা তাদের প্রাণের কথা প্রতিধ্বনিত হতে শুনলেন এবং এর মাধ্যমে তাদের অতীত ঐতিহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শিখলেন। বাংলা মার্সিয়া কাব্যগুলো প্রধানত অনুবাদ সাহিত্য হিসাবেই গড়ে ওঠে। বাঙালি কবিগণ যদিও মূলত ফার্সি ও উর্দু কাব্যের ভাব- কল্পনা ও ছায়া আশ্রয় করে তাদের কাব্যাদি রচনা করেছিলেন তথাপি এগুলোর মধ্যে যথেষ্ট মৌলিকতা ছিল। ফলে এ কাব্যগুলো এক প্রকার অভিনব সৃষ্টি হয়ে দাড়িয়ে ছিল। সুদূর আরব ও পারস্যের মানুষের কাহিনী কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে কবিগণ যে শিল্পরস ও পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তা অনকক্ষেত্রে অবাস্তব ও উদ্ভট হয়েছে। এতে মনে হয় বাঙালি কবিগণ মাটির প্রভাব অতিক্রম করতে পারেনি।

বাংলা ভাষায় 'জয়নবের চৌতিশা' নামীয় একখানা মার্সিয়া কাব্য পাওয়া গিয়েছে। এটি ষোড়শ শতাব্দীর কবি শেখ ফয়জুল্লাহ রচিত। আপাতত অন্য কোন পুথি আবিস্কৃত না হওয়ায় এ কাব্যখানিকে মার্সিয়া সাহিত্যে প্রাচীনতম রচনা হিসাবে গ্রহণ করো যায়। এতে কারবালার করুণ কাহিনীর সাথে ইমাম হোসাইনের বোন বিবি যায়নাবের বিলাপ বর্ণিত হয়েছে। সম্প্রতি অধ্যাপক আলী আহম্মদ কর্তৃক আবিষ্কৃত ষোড়শ শতাব্দীর কবি দৌলত উজির বাহরাম খানের রচিত

‘জঙ্গনামা’র সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। পুথিখানির মাত্র কয়েক পাতা পাওয়া গিয়েছে। এটি শেখ ফয়জুল্লাহর সমসাময়িক বলে ধারণা করছেন ঐতিহাসিকগণ।

এরপরে চট্টগ্রামের লোকপ্রিয় কবি মুহাম্মদ খান ‘মাকতাল হোসেন’ কাব্য রচনা করেন **১৬৪৫** সনে, যা অত্যন্ত জনপ্রিয় কাব্য। মুহম্মাদ খানের এ কাব্য বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে পঠিত হতো। রংপুরের কবি হায়াৎ মামুদের ‘জঙ্গনামা’ **১৭২৩** সালে রচিত হয় এবং পূর্ববঙ্গের সিলেটের কবি হামিদের ‘সংগ্রাম হুসন’ কাব্যের অনুলিপি হয় **১৭৪১** সালে। হয়তো কবি মূল কাব্য এর অনেক পূর্বেই রচনা করেছিলেন। হায়াত মামুদ উত্তরবঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ কবি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় যে ধারার সূত্রপাত হয় তাতে বহু কবি মার্সিয়া কাব্য রচনায় যত্নবান হয়েছিলেন। এ ধারার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কবি গরীবুল্লাহ। তিনি ‘জঙ্গনামা’ কাব্য প্রণয়ন করেন। ফকির গরীবুল্লাহ ফার্সি- উর্দু- হিন্দি শব্দ মিশ্রিত বাংলা ভাষার এক নতুন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা করেন। তৎপর রাঢ়ের হিন্দু কবি রাধাচরণ গোপের ‘ওফাৎনামা’ এবং ইমাম গণের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাব্য দু’খানি পশ্চিমবঙ্গের ‘এমাম এনের কেচ্ছা’ বোলপুর নিকেতনের লোহাগুড়ি গ্রাম হতে আবিস্কৃত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের ভূরশুই কানপুর পরগনা হতে মুন্সী জোনাব আলীর ‘শহীদে কারবালা’ প্রকাশিত হয়। সাদ আলী ও আব্দুল ওহাব ‘শহীদে কারবালা’র কাব্যধারা সংযোজন করেন। মুসলমানী বাঙলায় রচিত পুথির আদি কবি ফকীর হাবিবুল্লাহ ফার্সি- উর্দু- হিন্দী মিশ্রিত বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার যে রীতি চালু করেছিলেন তা বর্তমান সময়েও হয়ে আসছে। অতি আধুনিককালের কবিদের মধ্যে রংপুরের মুহাম্মদ ইসহাক দাস্তান ‘শহীদ কারবালা’ এবং চট্টগ্রামের কাজী আমিনুল হকের ‘জঙ্গে কারবালার’ নাম উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সিলেটের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে এক প্রকার নাগরীলিপিতে বাঙলা সাহিত্য চর্চা হতো। দেবনাগরী ভাষা হতে এটি ভিন্ন প্রকৃতির। এটি প্রধানত সিলেটের মুসলমানদের মধ্যে চালু ছিল বলে এর নাম ‘সিলেটি নাগরী’। এ লিপিতে বাংলা কাব্য

রচনার রীতি শুধু সিলেট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্থানীয় মুসলমানরাই ছিলেন এ কাব্যের পৃষ্ঠপোষক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে এ লিপিতে কাব্যাদি রচনা যথারীতি চালু হয়। নানা বিষয়ক কাব্যের মধ্যে মার্সিয়া ধারার কাব্য অন্যতম। সিলেটি নাগরী লিপিতে বাংলা ভাষায় একখানি জঙ্গনামা কাব্য লেখেন ওয়াহিদ আলী নামক এক কবি। ওয়াহিদ আলীর বাড়ি ছিল সুনামগঞ্জ জেলার ষোলঘর মৌজায়। তার রচিত জঙ্গনামা পাঁচশ' পৃষ্ঠার এক সুবৃহৎ কাব্য।

আধুনিক কালের কবি-সাহিত্যিকগণ বহু কবিতা ও কাব্য রচনা করে বাংলা মার্সিয়া সাহিত্য ভাণ্ডারকে বিকশিত করে গেছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি নজরুল ইসলাম মুহররম ও কারবালা কাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের ওপর ভিত্তি করে অনেক কবিতা ও ইসলামী গান রচনা করেছেন। বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলসমূহে বহু লোককবি কারবালার কাহিনীর বিষাদ অংশ অবলম্বনে অসংখ্য পল্লীগান রচনা করেছেন যা এ দেশের বিস্তৃত জনপদে আপামর জনসাধারণের অন্তরে বেদনার করুণ ভাব সৃষ্টি করেছে। কারবালা কাহিনীর বিশেষ বিশেষ অংশ অবলম্বনে রচিত পল্লীগানগুলোর অধিকাংশ জারী হিসাবে রচিত ও পঠিত হয়েছে। জারীগান ছাড়াও বাংলা মার্সিয়া বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। মার্সিয়ার তাল ও সুর বিষাদে পরিপূর্ণ। বাংলা মার্সিয়া সাহিত্য এবং সংগীত মুসলমানদের ধর্মীয় পটভূমিকে উপলক্ষ করেই গড়ে ওঠে এবং ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।

***প্রবন্ধটি ভারতের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখকের এম ফিল গবেষণায় থিসিস অবলম্বনে রচিত।**

'পবিত্র আহলে বাইতের মুহাব্বাত ঈমানের অংশবিশেষ। আর তাদের প্রতি কৃত পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী ভুলে যাওয়ার মতো নয়। হযরত হোসাইন (রা.) এবং তার সাথীদের ওপর নিপীড়নমূলক ঘটনা এবং হৃদয়বিদারক শাহাদাত যার অন্তরে শোক এবং বেদনা সৃষ্টি করে না, সে মুসলমান তো নয়ই, মানুষ নামেরও অযোগ্য।'

মুফতী শফী (রহ.)

সূচীপত্র: